প্রাগৈতিহাসিক ভারতবর্ষ

ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

চক্রবর্তী এণ্ড সন্
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৩০/১বি, কলেজ রো (দ্বিতল), কলিকাতা-৭০০ ০০৯

বারীন্দ্রকুমার চক্রবর্তী কর্তৃক চক্রবর্তী এণ্ড সন্‌
৩০/১বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০ ০০৯ হইতে প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ :
শুভ মহালয়া ১৩৯১

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ :
বাদল দে

কৃষ্ণ বোস কর্তৃক অক্ষর ৪৪/বি, সূর্য সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত

সূচীপত্র

ভূমিকা

প্রাগৈতিহাসিক ও প্রায়-ঐতিহাসিক যুগের ভারতবর্ষের উপর সম্পূর্ণ-ভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদাননির্ভর কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়নি। এদেশে প্রাগৈতিহাসিক-প্রত্নতত্ত্ব চর্চার বয়স একশোরও অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও, ইতিহাসের পাঠক্রমে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির যথাযোগ্য স্থান হয়নি। তাই ইংরাজী-বাংলা সাধারণ ইতিহাসগ্রন্থে প্রাগৈতিহাসিক ও প্রায়-ঐতিহাসিক যুগ সম্পর্কে কোন বিশদ আলোচনা থাকে না বললেই চলে, এবং যেটুকু থাকে সে বিবরণ বহুলাংশে এলোমেলো ও মনগড়া। তাছাড়া এই বিষয়ের উপর যে সকল বই ও রিপোর্ট প্রকাশিত হয় সেগুলি এত বেশি জটিল বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় ভরপুর এবং এত দুরূহ-শৈলীতে লেখা যে তা থেকে মর্মোদ্ধার করা কঠিন। প্রাগৈতিহাসিক ও প্রায়-ঐতিহাসিক যুগ সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে প্রাচীন যুগের ইতিহাস পাঠ বহুলাংশেই অর্থহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, এই বিষয়ের উপর বাংলা ভাষায় একটি তথ্যনিষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের অভাব শোচনীয়ভাবে বরাবরই রয়ে গেছে।

অবশ্য বর্তমান গ্রন্থের দ্বারা এই অভাব পুরোপুরি মিটবে এমন দাবি করা মোটেই সঙ্গত হবে না, কেননা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। পেশাদার প্রত্নতত্ত্ববিদরা যদি বাংলাভাষায় ইতিপূর্বে কিছু পরিকল্পিতভাবে লিখতেন, তাহলে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বেরও নিজস্ব ভাষা ও রচনাশৈলীর ঐতিহ্য গড়ে উঠত, যা অবলম্বনে পরবর্তী লেখকেরা বিভিন্ন সময়ে ক্রমপ্রসারমান এই বিষয়টিকে নিত্যনূতন আবিষ্কারের পরিপ্রেক্ষিতে সার্থকভাবে উপস্থাপিত করতে পারতেন। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থের অধিকাংশই বিষয়টিকে পরিচিত ও বোধগম্য করতেই ব্যয়িত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নক্ষেত্রগুলির বিভিন্ন সংস্তরগুলির বিস্তৃততর পরিচয় দিতে পারলে খুবই ভাল হত, কিন্তু সেজন্য যত চিত্র, আলোকচিত্র, মানচিত্র ও নক্সার প্রয়োজন, এবং সে ব্যবস্থা করতে যে অর্থব্যয়ের প্রশ্ন আছে, যে-কোন বাংলা বই-এর প্রকাশকের পক্ষে ততদূরে যাওয়া এক কথায় অসম্ভব। এই সকল অসুবিধা মনে রেখেই উচ্চাশাকে সংযত করতে হয়েছে। মোটামুটি-ভাবে এই গ্রন্থে প্রাগৈতিহাসিক ও প্রায়-ঐতিহাসিক যুগের ভারতবর্ষের একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। কোন তথ্যকেই বাদ দেওয়া হয়নি, এবং সমগ্র বিষয়টিকে সহজবোধ্য করে তোলার জন্য

সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এতে কতদূর সাফল্যলাভ করা গেছে তা বিচার করার দায়িত্ব অবশ্যই পাঠকবর্গের।

পরিভাষা নিয়ে কোন সমস্যা হয়নি, কেননা প্রাগৈতিহাসিক ও প্রায়-ঐতিহাসিক যুগের মানুষেরা যে সকল হাতিয়ার ব্যবহার করত, আজকের দিনের কারিগরেরাও সেই একই ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করে, তফাৎ শুধু এইটুকু যে আধুনিক হাতিয়ারসমূহ লৌহনির্মিত। মৃৎশিল্প সংক্রান্ত পরিভাষা পেতেও অসুবিধা হয়নি, কেননা প্রাগৈতিহাসিক কুমোরের চাকা এখনও রীতিমত সচল। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়েরও কিছু স্বীকৃত পরিভাষা বর্তমান। তবে স্থান-নামের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা হয়েছে। প্রত্নক্ষেত্রগুলি যেহেতু সুপরিচিত বা বিখ্যাত স্থানে অবস্থিত নয়, সেইহেতু স্থান-নামগুলির সঠিক উচ্চারণ হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে দেওয়া সম্ভব হয়নি। ইংরাজী বানান অনুযায়ী যে স্থানটির নাম অহর বা রূপর স্থানীয়ভাবে তা আহাড় বা রোপার নামে পরিচিত। এই ধরনের কিছু উচ্চারণ বৈসাদৃশ্য বিশেষ করে ট-বর্গ ও ত-বর্গের ক্ষেত্রে এবং অকার ও আকারের ক্ষেত্রে রোধ করা যায়নি।

গ্রন্থটি রচনা করতে অনেকেই আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন এবং সেজন্য তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। প্রথমেই প্রকাশক বারীন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর কথা বলতে হয়, যিনি আমার বিশিষ্ট বন্ধু। বস্তুত, এই বিষয়ের উপর একটি বই করার পরিকল্পনা তাঁরই মাথা থেকে বেরোয় এবং তাঁরই ইচ্ছানুযায়ী আমি বইটি লিখতে বাধ্য হই। আমার ছাত্র ও বর্তমানে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীঅরুণ নাগ পাণ্ডুলিপিটি পড়ে কিছু কিছু ত্রুটি সংশোধন করে দিয়েছেন। এই বই-এর শেষে যে নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া আছে, সেক্ষেত্রেও গ্রন্থ নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন। আমার অপর ছাত্র বিশ্বভারতীর শ্রীগৌতম সেনগুপ্ত এবং বন্ধু ডঃ প্রণবানন্দ যশ আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ববিভাগর ডঃ অনিল পাল ও ডঃ অমিতা রায় এবং নৃতত্ত্ববিভাগের ডঃ অশোক ঘোষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে লাভবান হয়েছি। সকলকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৫১/২, হাজরা রোড, কলিকাতা-৭০০ ০১৯

প্রত্নতাত্ত্বিক যুগবিভাগ

প্রত্নতত্ত্বে 'প্রাগৈতিহাসিক' (প্রি-হিস্টোরিক) এবং 'প্রায়-ঐতিহাসিক' (প্রোটো-হিস্টোরিক) শব্দদ্বয় একটি বিশেষ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমটি প্রাক্-লিপি সংস্কৃতিসমূহের পরিচায়ক, যে পর্যায়ে মানুষ লিপি বা অক্ষরের ব্যবহার শেখেনি। দ্বিতীয়টি সেই সকল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় যেখানে লিপির ব্যবহার প্রচলিত ছিল, যেমন হরপ্পা সংস্কৃতি। কিন্তু বিভাগের এই সাদামাটা পদ্ধতিটি সর্বজনস্বীকৃত নয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের একাংশের মতে যেহেতু হরপ্পা সংস্কৃতির লিপিসমূহের পাঠোদ্ধার আজও সম্ভবপর হয়নি সেই কারণে এই সকল সংস্কৃতি প্রাগৈতিহাসিক হিসাবে গণ্য হবার যোগ্য। আবার অনেকে মনে করেন যে 'প্রাগৈতিহাসিক' ও 'প্রায়-ঐতিহাসিক' পর্যায়ভেদের ক্ষেত্রে লিপিজ্ঞানের প্রসঙ্গ অনাবশ্যক। বিপুল ও বিস্তৃত বৈদিক সাহিত্য যাঁরা রচনা করেছিলেন তাঁদের নিশ্চয়ই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ বলা যায় না, অথচ তাঁরা লিপির ধার ধারেন নি। এই সকল কারণে অনেকে মনে করেন যে, বিশেষ করে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে, 'প্রায়-ঐতিহাসিক' শব্দটি ধাতুর ব্যবহারের সূত্রপাত থেকে লৌহযুগের সূচনা ও তৎপরবর্তীকালের কিয়দংশকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হতে পারে যখন লিপি ব্যবহারের বা কোন বিকল্প ব্যবস্থার পরিস্থিতি বা পূর্বশর্ত গড়ে উঠেছিল এমন অনুমান অসঙ্গত নয়।

বস্তুত প্রত্নতাত্ত্বিক যুগবিভাগের ব্যাপারে নানা সমস্যা আজও বর্তমান, যেগুলিকে বোঝার জন্য বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার প্রয়োজন। কিন্তু তারও আগে দরকার পূর্বোল্লিখিত 'সংস্কৃতি' নামক শব্দটিকে ব্যাখ্যা করার। প্রত্নতত্ত্বে 'কালচার' বা 'সংস্কৃতি' শব্দটিরও একটি নিজস্ব পারিভাষিক তাৎপর্য আছে, যদিও অনেকে মাঝে মাঝে কিছুটা এলোমেলো ও অনির্দিষ্টভাবেও শব্দটির প্রয়োগ করে থাকেন। 'কালচার' বা 'সংস্কৃতি' শব্দটির দ্বারা কোন বিশেষ সময়ের কোন বিশেষ এলাকার মানুষের বাস্তব জীবনোপকরণসমূহকে বোঝায়, যেমন—হাতিয়ার, আবাস, মৃৎশিল্প, সমাধি ইত্যাদি।[১] দুই বা ততোধিক স্থানের প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি যদি একই ধরনের হয় তাহলে ওই সকল স্থানকে একই সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে গণ্য করা হয়।

১। এই বিশেষ অর্থে 'সংস্কৃতি' শব্দটির প্রয়োগ ঐতরেয়ব্রাহ্মণ নামক বৈদিক যুগে রচিত গ্রন্থে পাওয়া যায়ঃ ওঁ শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পানি। এতেষাং বৈ দেবশিল্পানাম্ অনুকৃতীহ শিল্পম্ অধিগম্যতে—হস্তী, কংসো, বাসো, হিরণ্যম্, অশ্বতরীরথঃ শিল্পম্।...আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে।

কখনও কখনও সর্বপ্রথম যে স্থানটিতে অনুসন্ধান বা খননকার্য হয়েছে তারই নামানুসারে ওই সংস্কৃতির নামকরণ হয়। অনেক সময় আদর্শ প্রত্নস্থলটির ভিত্তিতে নামকরণ হয় যেখানে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি একটি সম্পূর্ণতা বা সমগ্রতা সূচিত করে, অথবা যে জায়গায় ওই সংস্কৃতির সব স্তরগুলিই পাওয়া যায়। আবার বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহের সমজাতীয়তা ও সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহের ভিত্তিতে ব্যাপকতর অর্থেও সংস্কৃতি শব্দটির প্রয়োগ ঘটানো হয়, যেমন 'পুরাতন প্রস্তর' বা 'প্রত্নাশ্মীয়' সংস্কৃতি। এখানে সংস্কৃতি শব্দটি এমন একটি জীবনধারার দ্যোতক যার প্রধান বৈশিষ্ট্য অমসৃণ পাথরের দ্বারা নির্মিত হাতিয়ারের ব্যবহার।

প্রত্নতাত্ত্বিক যুগবিভাগের প্রয়োজনীয়তা প্রথম উপলব্ধি করেন ডেনমার্কের কিছু পণ্ডিত। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ফেডেল সিমোনসেন তিনটি প্রত্নতাত্ত্বিক যুগের কথা কল্পনা করেন এবং তারই সূত্র ধরে খ্রীষ্টিয়ান ইউরগেনসেন টোমসেন ডেনমার্কের জাতীয় সংগ্রহশালায় আহৃত প্রত্নসামগ্রীসমূহকে প্রস্তর, ব্রোঞ্জ ও লোহ এই তিনভাগে বিভক্ত করে এগুলিকে তিনটি পরম্পরানুসারী যুগের সামগ্রী বলে ঘোষণা করেন। টোমসেন এবং তাঁর অনুগামীরা অবশ্য এই তিন যুগের মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টা করেননি এবং একথাও বলেননি যে ওই সকল সামগ্রীর দ্বারা প্রতিফলিত তিনটি যুগ অনিবার্যভাবেই একটি থেকে অপরটিতে রূপান্তরিত হয়েছে। পরবর্তীকালে এই তিন যুগের ধারণার ব্যাপ্তি ঘটিয়ে চার যুগের ধারণার প্রবর্তন করা হয় এবং সেগুলির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। এই চারটি যুগ যথাক্রমে পুরাতন-প্রস্তরযুগ, নূতন-প্রস্তরযুগ, তাম্রযুগ ও লৌহযুগ নামে পরিচিত। এই চার যুগের ধারণা জনপ্রিয় করেন লর্ড আভেবুরি (সার জন লুবক) এবং অনেকেই তাঁকে অনুসরণ করেন। ক্রমবর্ধমান প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারসমূহের ফলে চার যুগের নানা উপবিভাগের ধারণা গড়ে ওঠে যেগুলিকে একটি সুনির্দিষ্ট কালানুক্রমের ভিত্তিতে উপস্থাপিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। দ্য মোর্তিলে একটি অভিনব কালানুক্রম উপস্থাপিত করেন—যথা টাইম, এজ, পিরিয়ড এবং ইপোক।[১] 'টাইম' বলতে তিনি অবশ্য মহাকালকে বোঝাননি, একটি সসীম-কালকেই বুঝিয়েছেন, যা তাঁর মতে তিনটি ভূতাত্ত্বিক যুগ ও তৎসহ প্রাগৈতিহাসিক, প্রায়-ঐতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক যুগ নিয়ে গঠিত। 'এজ' বলতে তিনি বুঝিয়েছেন যুগ, যা সময়ের অংশ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক প্রস্তর, ব্রোঞ্জ ও লোহ এই তিন বিভাগ নিয়ে রচিত। 'পিরিয়ড' হচ্ছে যুগাংশ বা

১। এগুলির বঙ্গানুবাদ করা কঠিন, যদিও পুরাণে কাল, মন্বন্তর, যুগ ও কল্পের ধারণা আছে। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে পৌরাণিক পরিভাষার ব্যবহার বোধ হয় সঙ্গত হবে না।

পর্যায় যা পূর্বোক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক যুগসমূহের উপবিভাগগুলি নিয়ে সৃষ্ট। 'ইপোক' বলতে তিনি আরও ক্ষুদ্রতর বিভাগ বুঝিয়েছেন, যথা একটি বিশেষ সংস্কৃতির কালসীমা।

বলাই বাহুল্য যে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রথম পর্যায়ে যে যুগবিভাগ কল্পিত হয়েছিল তা কখনোই চিরন্তন বলে গণ্য হতে পারেনা। তবে একথা ঠিক যে হাতিয়ার বা উপকরণের অন্তর্নিহিত উপাদানের (যেমন প্রস্তর অথবা তাম্র অথবা লৌহ) ভিত্তিতে যে যুগবিভাগের ধারণা আদিতে গড়ে উঠেছিল তা থেকে সরে আসার বিশেষ কোন কারণ ঘটেনি, কেননা প্রস্তরযুগ থেকে ধাতব যুগে উত্তরণ খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু পরবর্তীকালে বিষয়টিকে আরও একটু ব্যাপক ও তৎসহ অর্থনৈতিক দৃষ্টি-কোণে বিচার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। উনবিংশ শতকেই স্বেন নিলসন জীবনযাপন পদ্ধতির নিরিখে মানব-অগ্রগতির চারটি পর্যায়ভেদ করেন, যথা আরণ্যক, শিকারজীবী বা যাযাবর, কৃষিজীবী ও সভ্য। তাঁর মতে সভ্য পর্যায়টির ভিত্তি মুদ্রাব্যবস্থা, লিখনপদ্ধতি ও শ্রমবিভাগ। নিলসন অবশ্য এই পর্যায়গুলির সঙ্গে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহকে সম্পর্কিত করার কোন চেষ্টা করেননি। পরবর্তীকালে লর্ড আভেবুরির বক্তব্যকে অনুসরণ করে এলিয়ট স্মিথ মানব-ইতিহাসকে দুইটি পর্যায়ে ভাগ করেন—খাদ্য-সংগ্রহের পর্যায় এবং খাদ্য-উৎপাদনের পর্যায়। এই প্রাথমিক বিভাজনটি নানা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও নৃতত্ত্ববিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বলা হয় যে খাদ্য-সংগ্রাহকের স্তর থেকে খাদ্য-উৎপাদকের স্তরে উত্তরণ মানব-ইতিহাসের প্রথম বিপ্লব, এবং নাগরিকতায় উত্তরণ, যার মূলে ধাতুর ব্যবহার ও তজ্জনিত উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন ক্রিয়াশীল, দ্বিতীয় বিপ্লব। গর্ডন চাইল্ডের মতে পুরাশ্মীয়, নবাশ্মীয়, তাম্রাশ্মীয় প্রভৃতি অবস্থা কোন নির্দিষ্ট কালানুক্রম অনুসরণ করেনা, এগুলি প্রয়োগকৌশলগত পরিবর্তনের পরিচায়ক। একই ধরনের দুটি সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ একই সময়ে নাও হতে পারে। একই দেশের এক অংশের মানুষ যখন হয়ত পুরাতন পাথরের অস্ত্র ব্যবহারের পর্যায়ে রয়েছে, অন্যদেশের বা সেই দেশের অপর এক অংশের মানুষ তখন লোহার হাতিয়ার বা উপকরণের ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছে এমন নজীরের সংখ্যা অনেক। এই কারণেই প্রয়োগকৌশলগত (টেকনোলজিকাল) পর্যায়ভেদের প্রয়োজন, যেখানে এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে উত্তরণের মাপকাঠি সময়ের পরিবর্তন নয়, হাতিয়ার ও অন্যান্য জীবনোপকরণের ক্ষেত্রে কলাকৌশলগত পরিবর্তন। সব দেশে এই সকল পরিবর্তন একই ভাবে বা একই সময়ে আসেনা, এমনকি একই দেশের বিভিন্ন অংশে এই পরিবর্তনের স্থান, কাল ও

পর্বের ভেদ লক্ষ্য করার মত। ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে এটা আরও বেশি চোখে পড়ে, কেননা এখানে এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের ভৌগোলিক ও নৃতাত্ত্বিক ব্যবধান অত্যন্ত স্পষ্ট।

প্রত্নতাত্ত্বিক যুগবিভাগের নিরিখে মানবসভ্যতার সর্বপ্রাচীন পর্যায়টি পুরাতন প্রস্তর বা প্রত্নাশ্মীয় (প্যালিওলিথিক) সংস্কৃতিসমূহের পরিচায়ক। এই পর্যায়ের মানুষের ব্যবহৃত যে সকল হাতিয়ারের নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলি হচ্ছে অমসৃণ পাথরের পাত বা ফালি (ফ্লেক) অথবা অণ্টি বা মুল (কোর) থেকে তৈরি হাতকুড়াল, ছেদক বা ছেনি, ফলা, কোপানি, বাটালি, খোদক প্রভৃতি। এই প্রত্নাশ্মীয় পর্যায়টি আবার হাতিয়ারের ধরন, গঠন, বৈশিষ্ট্য ও বিবর্তনের ভিত্তিতে তিনটি পর্বে বিভক্ত—নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে ফ্লেক বা পাত শিল্পের নিদর্শন সহ নিম্ন-প্রত্নাশ্মীয় সংস্কৃতির সর্বপ্রাচীন পরিচয় পাওয়া যায় পাঞ্জাবে ও কাশ্মীরে। এছাড়া সিন্ধু ও কেরালা ব্যতিরেকে নিম্নপ্রত্নাশ্মীয় কোপানি (চপার-চপিং) এবং হাতকুড়াল (হ্যাণ্ড-এক্স) শিল্পের বিকাশ দেখা যায় ভারতের সর্বত্র। স্ক্রেপার বা বাটালি এবং বোরার অর্থাৎ ভোমর বা তুরপুন শিল্পের নিদর্শন সহ মধ্য-প্রত্নাশ্মীয় সংস্কৃতিরও ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায় ভারতের সর্বত্র, ব্যতিক্রম শুধু কেরালা। ব্লেড বা ফলা এবং বুরিন বা খোদক শিল্পের নিদর্শন সহ উচ্চ-প্রত্নাশ্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ দেখা যায় অন্ধ্র, কর্ণাটক, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাত, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশে। প্রস্তর সংস্কৃতির আরও একটি চতুর্থ পর্ব আছে যা প্রত্নাশ্মীয় ও নবাশ্মীয় পর্যায়ের মধ্যবর্তী। এই পর্বটিকে বলা হয় মেসোলিথিক অর্থাৎ মধ্যাশ্মীয় বা মধ্য-প্রস্তর। এই পর্বের হাতিয়ারগুলির লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এগুলি আকারে অতি ক্ষুদ্র যেজন্য এগুলিকে বলা হয় মাইক্রোলিথ বা ক্ষুদ্রাশ্ম। এই ক্ষুদ্রাশ্মীয় সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া যায় উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, কর্ণাটক, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু ও গুজরাতে।

অনেকে আবার মনে করেন যে উপরি-উক্ত তিন পর্বের প্রত্নাশ্মীয় ও তৎসহ মধ্যাশ্মীয় সংস্কৃতির যে বিকাশ অন্যত্র দেখা যায় ভারতীয় পরিস্থিতি ঠিক তেমন নয়। ফলা (ব্লেড) ও খোদক (বুরিন) শিল্পের ঐতিহ্যবাহী উচ্চ-প্রত্নাশ্মীয় সংস্কৃতি, যার পরিচয় ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ায় পাওয়া যায়, ভারতবর্ষে তা অনুপস্থিত। এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে ফলা ও খোদক শিল্পের কোন অস্তিত্বই এখানে নেই। আমরা পূর্বেই ভারতের কয়েকটি রাজ্যের উল্লেখ করেছি যেখানে এই বিশেষ শিল্পধারার নিদর্শন বর্তমান। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে যা আছে তা একটি সুনির্দিষ্ট উচ্চ-প্রত্নাশ্মীয় সংস্কৃতিকে

সূচিত করার পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নয়। তাঁদের মতে এই উপমহাদেশে প্রস্তর শিল্পের তিনটি বিশেষ ধারা লক্ষ্য করা যায়, যেগুলি অবলম্বনে তিনটি পরম্পরানুসারী প্রস্তর যুগের ধারণা করা যায়, যথা আদি, মধ্য ও শেষ। প্রথম ধারাটি প্রাচীনতম যা আদি-প্রস্তর যুগের পরিচায়ক। এই ধারাটির বৈশিষ্ট্য প্রধানত হাতকুড়াল ও ছেদক শিল্প। এছাড়া কোর বা অশ্টিনির্মিত চক্রাকার ও উপবৃত্তাকার এবং ফ্লেক বা পাতনির্মিত নানা উদ্দেশ্যসাধক হাতিয়ারের নিদর্শনও পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ধারাটি মধ্য-প্রস্তর যুগের পরিচায়ক। এই পর্যায়ের হাতিয়ারসমূহ প্রধানত ফ্লেক বা পাত থেকে তৈরি, যেগুলির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের স্ক্রেপার বা চাঁছনি-বাটালি জাতীয় অস্ত্রের আধিক্য দেখা যায়, এবং যেগুলির ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বিভিন্নতা বর্তমান। ভারতীয় মধ্য-প্রস্তর যুগের পাত-শিল্পের সঙ্গে ইউরোপীয় ও পশ্চিম-এশীয় লেভালোয়া-মুসতেরীয় শিল্পধারার[১] সাদৃশ্য আছে। তৃতীয় ধারাটি শেষ-প্রস্তর যুগের পরিচায়ক যার প্রধান বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্রাশ্ম বা মাইক্রোলিথ-নির্মিত হাতিয়ার ও উপকরণ যেগুলির সঙ্গে ইউরোপীয় ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত অনুরূপ সামগ্রীর মিল আছে। কালসীমার বিচারে আদি-প্রস্তর যুগের সূত্রপাত ভূতাত্ত্বিক মধ্য প্লাইস্টোসীন যুগ থেকে, অর্থাৎ বর্তমানকাল থেকে প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর পূর্ব থেকে। মধ্য-প্রস্তর যুগের বিকাশকাল ভূতাত্ত্বিক শেষ-প্লাইস্টোসীন যুগে, বর্তমানের ৫০,০০০ থেকে ২০,০০০ বছর পূর্বে। শেষ-প্রস্তর যুগের বিকাশ আরও অনেক পরে। ফলা ও খোদক শিল্পের কাল (যে শিল্পধারাকে উচ্চ-প্রত্নাশ্মীয় না বলে মধ্য-প্রস্তর-যুগের শিল্পধারার একটি বিশেষ ধরনের বিকাশ বলে আজকাল অভিহিত করা হয়) ভূতাত্ত্বিক শেষ-প্লাইস্টোসীন যুগের শেষের দিকে নির্দিষ্ট হয়েছে, বর্তমানের ২০,০০০ থেকে ১০,০০০ বছর পূর্বে, পক্ষান্তরে ক্ষুদ্রাশ্ম-শিল্প বা মাইক্রোলিথের বিকাশ ভূতাত্ত্বিক হলোসীন যুগে, ৮০০০ থেকে ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে।[২]

১। প্যারিসের নিকটবর্তী লেভালোয়া-পেরে নামক স্থানে প্রাপ্ত প্রত্নাশ্মের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে সেখানে পাত খসানোর আগে একটি প্রাথমিক পরিকল্পনা মত পাথরটিকে ঠিকমত ভেঙে হাতিয়ার তৈরির উপযোগী করে নেওয়া হত। মুসতেরীয় শব্দটির প্রয়োগ ফ্রান্সের অন্তর্গত লে-মুস্তিয়েরের নামক মধ্য-প্রত্নাশ্মীয় সংস্কৃতিকেন্দ্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তুলনা হিসাবে করা হয়ে থাকে।

২। ভূতত্ত্ববিদরা অতি-প্রাচীন পৃথিবীকে চারটি ভূতাত্ত্বিক যুগে বিভক্ত করেন—যথা প্রোটেরোজোয়িক, প্যালিওজোয়িক, মেসোজোয়িক এবং সিনোজোয়িক। সিনোজোয়িক যুগে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব ঘটে। এই যুগটি ইয়োসীন, অলিগোসীন, মায়োসীন, প্লায়োসীন ও প্লাইস্টোসীন এই কয়টি অংশে বিভক্ত। আধা-মানুষ আধা-বানর জাতীয় জীবের সৃষ্টি মায়োসীন যুগে হয়েছিল। প্লায়োসীন যুগে ওই জীবটির আরও একটু উন্নতি হয়েছিল,

প্রস্তর যুগের পরবর্তী বিকাশের অধ্যায়টি নিওলিথিক বা নবাশ্মীয় (নূতন প্রস্তর) হিসাবে পরিচিত। প্রত্নাশ্মীয় সংস্কৃতির সঙ্গে নবাশ্মীয় সংস্কৃতির মৌলিক পার্থক্য এই যে শেষোক্ত ক্ষেত্রে হাতিয়ারে বিশেষ কৌশলে ধার দেবার রীতি প্রবর্তিত হয়, যার ফলে অস্ত্রগুলির কার্যকারিতা অনেক বেড়ে যাওয়ায় মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি গুণগত পরিবর্তনের সূচনা হয়। নবাশ্মীয় আয়ুধসমূহের অধিকাংশই ভূমিতে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নির্মিত হত। নবাশ্মীয় মানুষ তার ব্যবহারোপযোগী মৃৎপাত্র গড়তে শুরু করেছিল। বয়নশিল্পেরও সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। ধাতুর ব্যবহারও নবাশ্মীয় সংস্কৃতির একটি বিশেষ পর্যায় থেকে শুরু হয়েছিল। ব্যাপকতর অর্থে নবাশ্মীয় শব্দটি একটি সংস্কৃতিগত বা অর্থনৈতিক পর্যায়কে সূচিত করে যার বৈশিষ্ট্য খাদ্য-সংগ্রহ থেকে খাদ্য-উৎপাদনের ব্যবস্থায় উত্তরণ, যখন মানুষ শুধু তার অস্ত্রকেই ধার দিতে শেখেনি, নিজের খাদ্যও উৎপাদন করতে শিখেছে, এছাড়া পশুপালন, মৃৎশিল্প ও স্থায়ী আবাসে অভ্যস্ত হয়েছে, এবং পূর্ববর্তী তিন প্রস্তর যুগের যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করেছে। এই কারণেই গর্ডন চাইল্ড 'নবাশ্মীয় বিপ্লব' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর মতে নবাশ্মীয় অর্থনীতির স্ববিরোধ থেকেই নাগরিকতার উদ্ভব হয়েছে। নবাশ্মীয় কৃষিজীবীরা নিজেদের প্রয়োজনাতিরিক্ত যে উদ্বৃত্ত উৎপাদন করত বা করতে বাধ্য হত, সেই উদ্বৃত্ত এমন সব সামাজিক শ্রেণীর ভরণপোষণের জন্য ব্যবহৃত হত যারা প্রত্যক্ষভাবে খাদ্য-উৎপাদক ছিলনা। এই সকল সামাজিক শ্রেণী নানা ধরনের কারিগর ও পেশাদারদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল যারা নাগরিক সভ্যতার অগ্রদূত ছিল।

কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে নবাশ্মীয় অধ্যায়টির অবস্থা বড়ই এলোমেলো এবং তা কালসীমার নিরিখে বড়ই অর্বাচীন। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ভি. ডি. কৃষ্ণস্বামী প্রাপ্ত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে ভারতের নবাশ্মীয় সংস্কৃতির যে সমীক্ষা প্রকাশ করেন, তাতে উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমের কয়েকটি কেন্দ্র ছাড়া অবিমিশ্র উপাদান পাওয়া সম্ভব হয়নি, অথবা সুস্পষ্টভাবে নবাশ্মীয় ও তাম্রাশ্মীয় পর্যায়ের ভেদ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী আবিষ্কারসমূহের ফলেও পরিস্থিতির তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অবিমিশ্র নবাশ্মীয় সংস্কৃতির সংখ্যা এখানে বেশি নয়, যেগুলি কাশ্মীর, বালুচিস্তান, বিহার, আসাম, মেঘালয় প্রভৃতি অঞ্চলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং যেগুলির কালসীমা ৪০০০ থেকে ২০০০

কিন্তু মোটামুটি মানুষ বলতে যে ধরনের জীব বোঝায় তার উদ্ভব হয় প্লাইস্টোসীন যুগে, যার সূত্রপাত আজ থেকে দশ লক্ষ বছর আগে। প্লাইস্টোসীন যুগ শেষ হয় মাত্র দশ হাজার বছর আগে এবং তখন থেকে যে যুগের সূত্রপাত হয় তার নাম হলোসীন।

খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে। অপরাপর অঞ্চলে নবাশ্মীয় ও তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতিসমূহের এত ব্যাপক সংমিশ্রণ ঘটেছে যে উভয়েরই আদ্যন্ত খুঁজে পাওয়া কঠিন। পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে নবাশ্মীয় ভূমিকুঠার শিল্পের ব্যাপক বিকাশ দেখা যায়, কিন্তু বিন্ধ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমে এই শিল্পের বিকাশ স্বল্পতর, মধ্য ও উত্তর ভারতে স্বল্পতম। আবার দু'দিকে ধারযুক্ত সমান্তরাল ফলা-শিল্প পূর্বাঞ্চলে অনুপস্থিত বললেই হয়, কিন্তু অন্যত্র তা পর্যাপ্ত। পূর্বাঞ্চলে পাথরের হাতিয়ারের সঙ্গে তাম্র ও ব্রোঞ্জ নির্মিত হাতিয়ারের সহাবস্থান বড় চোখে পড়েনা যেখানে মধ্য ও পশ্চিম অঞ্চলে এই সহাবস্থান অত্যন্ত ব্যাপক। উত্তর গোদাবরী-প্রবরা অববাহিকায় এবং তাপ্তী উপত্যকায় তাম্রাশ্মীয় উপাদানেরই প্রাধান্য যেখানে লম্বা ধরনের পাথরের ফলা কৃষ্ণ-রঞ্জিত লোহিতাভ মৃৎপাত্র এবং ব্রোঞ্জ ও তামার সামগ্রীর আধিক্য দেখা যায়। এই সংস্কৃতিগুলির কালসীমা ২০০০ থেকে ৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে। পক্ষান্তরে কৃষ্ণা ও কাবেরী উপত্যকার মিশ্র সংস্কৃতিগুলির ক্ষেত্রে নবাশ্মীয় উপাদানের প্রাধান্য, যেখানে পালিশ করা পাথরের কুঠার, অস্থিনির্মিত আয়ুধ এবং ধূসর মৃৎপাত্রের অধিকতর প্রচলন দেখা যায়। এই সংস্কৃতিগুলির কালসীমা ২০০০ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে।

তাম্রাশ্মীয় বা কালকোলিথিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যসমূহ নবাশ্মীয় সংস্কৃতিরই অনুরূপ, তবে এক্ষেত্রে পাথরের পাশাপাশি ধাতুর, বিশেষ করে তাম্রের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। এই পর্যায়ে চিত্রিত মৃৎপাত্রের বিকাশও লক্ষ্য করা যায়। আমরা আগেই দেখেছি যে ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থলেই নবাশ্মীয় ও তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটেছে এবং এই মিশ্র সংস্কৃতিগুলি হরপ্পা সভ্যতার সমকালীন এবং বহুক্ষেত্রেই হরপ্পা-পরবর্তী। হরপ্পা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্রোঞ্জ নির্মিত সামগ্রীসমূহের বহুল প্রচলন লক্ষ্য করার মত। হরপ্পা সংস্কৃতির নানা কেন্দ্র সিন্ধু, পাঞ্জাব, বালুচিস্তান, পশ্চিম-উত্তরপ্রদেশ, উত্তর-রাজস্থান ও গুজরাতে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সংস্কৃতির বিকাশকাল ২৩৫০ থেকে ১৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। এই সংস্কৃতির ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক হওয়ার জন্য এবং বিস্তীর্ণ এলাকার নিদর্শনসমূহের মধ্যে চাঞ্চল্যকর সমজাতীয়তার জন্য একে সভ্যতা আখ্যাও দেওয়া হয়। ১৯২১ ও ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে পাঞ্জাবের মন্টোগোমারি জেলায় হরপ্পা এবং সিন্ধুপ্রদেশের লারকানায় মহেঞ্জোদরো নগরদ্বয়ের চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারের পর প্রত্নতত্ত্ববিদরা এর নানা অতীত পর্যায় অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন, যার ফলে বালুচিস্তান, সিন্ধুপ্রদেশ ও উত্তর-রাজস্থানে অনেকগুলি প্রাক্-হরপ্পীয় সংস্কৃতির নিদর্শন উদ্ঘাটিত হয়। হরপ্পার সমকালীন ও হরপ্পা-পরবর্তী

তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির নানা কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে সিন্ধুপ্রদেশ, পাঞ্জাব, গুজরাত, মালব অঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ ও গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে। বহুক্ষেত্রেই এই সংস্কৃতিগুলি পূর্বতন নবাশ্মীয় অধ্যায়ের কোন বিশেষ পর্যায়ে হাতিয়ার ও উপকরণের ক্ষেত্রে ধাতুর ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছিল।

অধ্যাপক সাংকালিয়া ভারতবর্ষের নবাশ্মীয় ও তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতিগুলির নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ করেছেন। (১) নবাশ্মীয়—আসাম, বঙ্গদেশ, বিহার, কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের কয়েকটি কেন্দ্র যেগুলির বৈশিষ্ট্য প্রস্তর ও অস্থি-নির্মিত ভূমিতে ব্যবহারের উপযোগী হাতিয়ার, হস্তনির্মিত মৃৎপাত্র ও বিবরনিবাস (কাশ্মীরে)। (২) নবাশ্মীয়-তাম্রাশ্মীয়—পশ্চিম অন্ধ্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, বালুচিস্তান ও পূর্ব রাজস্থানের কয়েকটি কেন্দ্র, যেখানে পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও ফলাশিল্প, ক্ষুদ্রাশ্ম, তাম্র নির্মিত হাতিয়ার ও কাঠের খুঁটিওয়ালা চালাঘর বর্তমান। (৩) তাম্রাশ্মীয়—অন্ধ্র, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র ও মধ্য প্রদেশের কয়েকটি কেন্দ্র, যেগুলির বৈশিষ্ট্য পাথরের ফলাশিল্প, চক্রনির্মিত মৃৎপাত্র, কাঠের খুঁটিওয়ালা চালাঘর, তাম্রের উপকরণ, খাদ্য হিসাবে গম, চাল, যব, কলাই, তৈলবীজ প্রভৃতির নিদর্শন। (৪) তাম্রাশ্মীয় ও ব্রোঞ্জ—সিন্ধু, পাঞ্জাব, কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র ও উত্তর রাজস্থানের কয়েকটি কেন্দ্র (সম্মিলিতভাবে হরপ্পা সভ্যতা) যেখানে উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও ব্রোঞ্জের হাতিয়ার ও পাকা ইটের বাড়ির নিদর্শন বর্তমান। (৫) তাম্র-ব্রোঞ্জ—গঙ্গা-যমুনা দোয়াব ও দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থানের কয়েকটি কেন্দ্র যেগুলির বৈশিষ্ট্য চক্রনির্মিত মৃৎপাত্র, তাম্র ও ব্রোঞ্জনির্মিত হাতিয়ার এবং পাথরের ভিত্তির উপর মাটির দেওয়ালযুক্ত আবাস।

হাতিয়ার ও উপকরণের ক্ষেত্রে লৌহের ব্যবহার শুরু হবার পর মানব-জাতির অগ্রগতির ইতিহাসে আরও একটি গুণগত পরিবর্তন আসে। বস্তুত অনেকেই মনে করেন যে লৌহযুগ থেকেই ঐতিহাসিক যুগের সূত্রপাত। ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময় থেকে ভারতবর্ষে লোহার প্রচলন শুরু হয়, যদিও এই বিরাট দেশে সর্বত্র তা একই সময়ে হয়নি। ১১০০ থেকে ৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে গড়ে ওঠা বালুচিস্তানের কয়েকটি সমাধি-ক্ষেত্রে একটি সমজাতীয় সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, যার স্রষ্টারা লৌহের ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। উত্তর ভারতের লৌহব্যবহারকারীদের সংস্কৃতির সঙ্গে একটি বিশেষ মৃৎশিল্পের ধারা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যার নামকরণ করা হয়েছে চিত্রিত-ধূসর-মৃৎপাত্র সংস্কৃতি এবং যার কালসীমা ১১০০ থেকে ৪৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে। গাঙ্গেয় পূর্বোত্তরাংশে লৌহযুগের বসতিগুলির

সঙ্গে আর একটি নূতন ধরনের মৃৎশিল্পের সংযোগ ঘটেছিল যার নামকরণ করা হয়েছে উত্তরের কৃষ্ণমসৃণ-মৃৎপাত্র সংস্কৃতি, যার বিকাশকাল ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পর থেকে। দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের মহাশ্মীয় (মেগালিথিক) সমাধিক্ষেত্রগুলিতে লোহযুগের অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। যে সকল লোহার হাতিয়ার ও উপকরণ এই জাতীয় সমাধি থেকে পাওয়া গেছে সেগুলির ধরন ও গঠনের মধ্যে বিস্ময়কর ঐক্য পরিলক্ষিত হয়, যা থেকে অনুমান করা যায় যে ঐগুলির বিশেষ উৎপাদন কেন্দ্র ছিল। লোহযুগের বিকাশ ও ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক ও প্রায়-ঐতিহাসিক যুগের অবসান-পর্ব সূচিত হয়।

প্রাগৈতিহাসিক অনুসন্ধানের সূচনাপর্ব

ঊনবিংশ শতকের শুরুতেই বহিরাগত পর্যবেক্ষকরা উপদ্বীপীয় ভারতে মেগালিথিক বা মহাশ্মীয় সমাধিসমূহের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে কানপুরের নিকটবর্তী বিঠুরে ৩১·৫ সে. মি. দীর্ঘ এবং ৫৩৯ গ্রাম ওজন বিশিষ্ট একটি তাম্রনির্মিত বর্শাফলক আবিষ্কৃত হয়। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক ডঃ প্রিমরোজ রায়চুর জেলায় তাঁর গৃহসংলগ্ন উদ্যান পরিষ্কারকালে কিছু প্রস্তরনির্মিত ছুরিকা ও তীরের ফলক আবিষ্কার করেন এবং সেগুলির বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে জন ইভান্স জবলপুরের নিকটবর্তী নর্মদার তীরে প্রাপ্ত কিছু ফ্লিন্ট বা অরণিপ্রস্তরের (চকমকি) উপর একটি রচনা প্রকাশ করেন। ঊনবিংশ শতকের পঞ্চম দশকে কর্ণেল মীডোজ টেলর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় হায়দ্রাবাদ অঞ্চলের কয়েকটি মহাশ্মীয় সমাধিতে খননকার্য চালান। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে এইচ. পি. লে-মেসুরিয়ে উত্তরপ্রদেশের দক্ষিণাঞ্চল থেকে কিছু নবাশ্মীয় আয়ুধের সন্ধান পান এবং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জবলপুরে প্রাপ্ত বারোটি আয়ুধের উপর একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ডব্লিউ থিওবাল্ড বান্দা জেলা থেকে প্রচুর নবাশ্মীয় আয়ুধ সংগ্রহ করেন। প্রথম প্রত্নাশ্মীয় আয়ুধ আবিষ্কার করেন রবার্ট ব্রুস ফুট মাদ্রাজের নিকটবর্তী পল্লাবরম নামক স্থান থেকে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মে তারিখে।[১]

প্রস্তর যুগ সম্পর্কে অনুসন্ধান : সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে এই ধারণা ছিল যে প্রস্তর যুগের প্রধান বিকাশ বিন্ধ্যের দক্ষিণে উপদ্বীপীয় ভারতে ঘটেছিল, যদিও উত্তরভারতে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু প্রস্তরযুগের

১। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ১৯৩০ পর্যন্ত প্রাগৈতিহাসিক অনুসন্ধানের পুরো ব্যাপারটি পুরোপুরি ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর নির্ভরশীল ছিল। সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ থাকলেও, এবং সেই বিভাগ কানিংহাম (১৮৬১-৬৫, ১৮৭০-৮৫), বার্জেস (১৮৮৫-৮৮), মার্শাল (১৯০২-২৮) প্রভৃতি যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বের প্রতি তাঁদের আগ্রহ না থাকার দরুন, এই ক্ষেত্রে কোন সরকারী উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ঐতিহাসিক যুগের প্রত্নকীর্তি সমূহের প্রতি তাঁদের আকর্ষণ ছিল। ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে হরপ্পা সভ্যতা নাটকীয় আবিষ্কারের ফলে প্রায়-ঐতিহাসিক যুগ সম্পর্কে অধিকতর তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কিছু চেষ্টা করেছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগ সম্পর্কে চেষ্টা তখনও গুরুত্বহীন ছিল। ১৯৩২-এ প্রত্ন-আইনের কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে বাইরের প্রতিষ্ঠানসমূহকে কাজ করার অধিকার দিলে ১৯৩৫-এ ইয়েল ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ভারতে একটি ভূতত্ত্ব-প্রাগৈতিহাসমূলক অভিযান প্রেরণ করেন, যার ফলে এই অবহেলিত ক্ষেত্রটিতে কিছু কাজ কর্মের সূত্রপাত হয়। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে হুইলার প্রত্ন-অধিকর্তা হবার পর প্রকৃত অর্থে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছিল। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রুস ফুট ও তাঁর সহকারী ডব্লিউ কিং যুগ্মভাবে তামিলনাড়ুর চিঙ্গলেপুট জেলায় কোর্তালায়ার নদীতে প্রবহমান একটি নালার নিকটবর্তী অত্তিরামপক্কমে প্রস্তরযুগের নিদর্শনবাহী একটি প্রত্নক্ষেত্র আবিষ্কার করেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ফুট পালার নদী পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা সম্পন্ন করেন যে সময় তিনি শিলাস্ফটিক নির্মিত অসংখ্য আয়ুধের সন্ধান পান। ওই বছরেই তিনি মাদ্রাজ ও উত্তর আর্কট জেলাদ্বয়ে ল্যাটেরাইট ভূসংস্থানের মধ্যে প্রাপ্ত প্রস্তরনির্মিত আয়ুধসমূহের উপর একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলি জেলায় যে ক্ষুদ্রাশ্ম শিল্পের বিশেষ বিকাশ দেখা যায় তা ব্রুস ফুটের দৃষ্টি এড়ায়নি।[১]

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সি. এ. ই ওলডহ্যাম এবং এম. ম্যাকলিয়ড অন্ধ্রপ্রদেশের কুড্ডাপা জেলার নানা স্থান থেকে বহু প্রস্তরনির্মিত সামগ্রী সংগ্রহ করেন। এগুলি ভূপৃষ্ঠের উপর থেকে এলোমেলোভাবে সংগৃহীত হয়। ওই বছরেই ফুট অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুলে কয়েকটি গুহায় প্রস্তর ও অস্থিনির্মিত আয়ুধ ও তৎসহ জীবাশ্মের পরিচয় পান। ফুট ও কিং ১৮৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কুর্নুল ও কুড্ডাপা জেলার মধ্যবর্তী কেন্দ্রীয় উপত্যকার পূর্বদিকে ভূপৃষ্ঠে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রস্তরনির্মিত অসংখ্য আয়ুধের সন্ধান পান, যেগুলির পৃষ্ঠদেশ কিছুটা ডিম্বাকার এবং একদিকের কোণ অপরদিকের কোণের তুলনায় তীক্ষ্ণ। এছাড়া কুঠারধর্মী কিছু আয়ুধেরও পরিচয় তাঁরা পান যেগুলির কথা ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কিং প্রকাশ করেন। এছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশের নানাস্থান থেকে ফুট বহু ক্ষুদ্রাশ্ম আবিষ্কার করেন। গোদাবরী জেলার ভদ্রাচলমের চল্লিশ মাইল পশ্চিমে পালোনেহা নামক গ্রামের নিকট ডব্লিউ. টি. ব্লানফোর্ড ৫০ গজ পরিমিত একটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্রে ৩৫টি আয়ুধ আবিষ্কার করেন যেগুলির অধিকাংশই শিলাস্ফটিক নির্মিত। এছাড়া তিনি মালেদি সিরপুর তালুকের কয়েকটি স্থান এবং পেনগঙ্গা উপত্যকা থেকেও কিছু আয়ুধ সংগ্রহ করেন, এবং এগুলির বিবরণ যথাক্রমে ১৮৬৭ ও ১৮৭১-এ প্রকাশ করেন। ওই সময়েই টি. ডব্লিউ. হিউজেস চন্দা এবং চিনুর থেকেও কিছু প্রত্নাশ্ম পান। উপকূলবর্তী গুণ্টুর ও নেলোর জেলায় ফুট ও কিং

১। ব্রুস ফুটকে ভারতের প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বের জনক আখ্যা দেওয়া হয়। তিনিই প্রথম যথার্থ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণে প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে ভূতাত্ত্বিক মাত্রা সংযোজন করেন। তাঁর ভূতাত্ত্বিক কাজকর্মের পাশাপাশি তিনি যে অসংখ্য প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন সংগ্রহ করেছিলেন তাই নয়, উপদ্বীপীয় ভারতে তিনি ৪৫৯টির মত প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নক্ষেত্র আবিষ্কার করেন। তাঁর বিশাল প্রত্নসংগ্রহ মাদ্রাজ গভর্নমেন্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

সমীক্ষা করেন এবং পোটেলুর ও গুডলুরের মধ্যবর্তী রামপটন এলাকার ল্যাটেরাইটপুঞ্জের মধ্যে উপল ও শিলাস্ফটিক নির্মিত আয়ুধের সন্ধান পান।

কর্ণাটকের বিজাপুর ও ধারওয়ার জেলায় ব্রুস ফুট অনুসন্ধান শুরু করেন ১৮৬৮ থেকে। অনুসন্ধানের ক্ষেত্র হিসাবে তিনি মলপ্রভা ও তার উপনদী বেন্নিনালার সংযোগস্থলকে বেছে নিয়েছিলেন যেখানে বৃহদায়তন স্ফটিকনির্মিত সামগ্রীর অভাব ছিলনা। আয়ুধগুলি ছিল কুঠার, বর্শাফলক এবং হরেক রকমের বর্শাজাতীয় হাতিয়ার। মলপ্রভার বামতটে বাদামি জেলার পাঁচ মাইল দূরবর্তী কাইরা নামক স্থানে এবং উপনদীর সংযোগস্থলে চিকমুলিঙ্গির কংকরময় ক্ষেত্র থেকে তিনি উপলনির্মিত অজস্র আয়ুধের সন্ধান পান। ফুট শিমোগা জেলার কুদুর, ন্যামতি, নিদখট্টা এবং লিঙ্গদহল্লিতে প্রস্তর যুগের কয়েকটি প্রত্নক্ষেত্র আবিষ্কার করেন। বিজাপুর ও ধারওয়ার থেকে প্রাপ্ত নানা সামগ্রী তিনি ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে প্রেরণ করেন। কর্ণাটকের বিখ্যাত প্রত্নক্ষেত্র সঙ্গনকল্লুর উপর ফুট একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করেন যেখান থেকে তিনি অজস্র ক্ষুদ্রাশ্মের সন্ধান পেয়েছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চিতলদুর্গ এবং বেলারি জেলাদ্বয় থেকে অনেকগুলি ক্ষুদ্রাশ্মক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এ. বি. ওয়াইন্নে আহমদনগর থেকে জালনা যাওয়ার পথে পৈঠানের নিকটবর্তী মুঙ্গি নামক গ্রাম থেকে আগেট পাথরের ফ্লেক থেকে নির্মিত একটি ছুরি আবিষ্কার করেন। এটি উত্তর-গোদাবরী নদী-উপত্যকায় পশুর অস্থি সমাকীর্ণ একটি ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। এটি যে পরিকল্পিত-ভাবে মানুষের হাতে তৈরি এবং সুনির্দিষ্ট কাজে এটি যে ব্যবহৃত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং সেই হিসাবে আবিষ্কারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ডব্লিউ. এল. উইলসন মধ্যভারতের সোগর, দামোহ ও বুন্দেলখণ্ড থেকে অনেকগুলি প্রত্নাশ্মীয় উপকরণ সংগ্রহ করেন। আরও কিছু পাওয়া যায় দেওরি ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে, সুকচর নালার উত্তর দিকে, সোগর এবং দেওরির মধ্যবর্তী দুহার নালায় এবং জবলপুর ও দামোহের মধ্যবর্তী সিংরামপুর উপত্যকায়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সি. হ্যাকেট মধ্যভারতে নর্মদার তীরে ভুতরা নামক স্থানে কংকরময় নদীক্ষেত্রে শিলাস্ফটিক নির্মিত একটি বিশেষ ধরনের হাতকুড়াল আবিষ্কার করেন। এটির পৃষ্ঠদেশ ডিম্বাকার এবং সম্মুখভাগ তীক্ষ্ন। এটিও যে সুপরিকল্পিত ভাবে মানুষের হাতে তৈরি তাতে কোন সন্দেহ নেই। হ্যাকেট রাজস্থানের জয়পুর, বুন্দি ও ইন্দরগড় থেকে কয়েকটি প্রত্নাশ্মীয় আয়ুধ সংগ্রহ করেন, অধিকাংশই শিলাস্ফটিক নির্মিত, কিছু বেলেপাথরে তৈরি। গুজরাতের কয়েকটি ক্ষেত্র

থেকে ব্রুস ফুট প্রস্তর নির্মিত আয়ুধ ও ক্ষুদ্রাশ্ম আবিষ্কার করেন এবং সাবরমতী উপত্যকার একটি প্রত্ন-ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা করেন। এই মর্মে তাঁর একটি রচনা প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিনসেন্ট বল বঙ্গদেশের বাঁকুড়ায় অবস্থিত গোবিন্দপুরের অনতিদূরে কুনকুনে নামক গ্রাম থেকে একটি স্ফটিকনির্মিত চওড়া, গোলপৃষ্ঠ অথচ ধারালো আয়ুধ আবিষ্কার করেন। অনুরূপ আরও দুটি আয়ুধ তিনি ও হিউজেস যথাক্রমে ঝরিয়া ও বোকারো কয়লাখনি অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত হন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উড়িষ্যার ঢেনকানল, আঙ্গুল (কলাইকোটা গ্রামের নিকটবর্তী নদীখাত), তালচের (হরিচাঁদপুর গ্রাম) এবং সম্বলপুর (বুরসাপালি গ্রাম) থেকে কিছু প্রস্তরযুগের নিদর্শন আবিষ্কার করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন বীচিং সিংভূম জেলার চাইবাসা ও চক্রধরপুর থেকে কিছু মাইক্রোলিথ বা ক্ষুদ্রাশ্ম আবিষ্কার করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ডব্লিউ. এফ. পি. ড্রাইভার রাঁচির নিকটবর্তী অঞ্চলে এবং ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন পি. ও. বোডিং সাঁওতাল পরগণায় প্রচুর ক্ষুদ্রাশ্মের সন্ধান পান। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ককবার্ন উত্তরপ্রদেশের সিঙ্গরাউলি অববাহিকায় প্রস্তরযুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র আবিষ্কার করেন। উত্তরপ্রদেশের কাইমুর পর্বতশ্রেণীর সন্নিহিত অঞ্চলে ১৮৮০ থেকে ১৮৯০-এর মধ্যে কার্লাইল, ককবার্ন ও রিভেট-কার্নক বহু ক্ষুদ্রাশ্মের সন্ধান পান।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে প্রস্তরযুগ সংক্রান্ত যে সকল অনুসন্ধান হয়েছিল মোটামুটিভাবে তার পরিচয় দেওয়া হল। অনুসন্ধান ভূপৃষ্ঠের উপরেই করা হয়েছিল, বলাই বাহুল্য কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ব্যতিরেকে, কেননা স্তরবিন্যাস অনুযায়ী খননকার্য সে আমলে অকল্পনীয় না হলেও, ভারতবর্ষে তার কোন সুযোগ ছিল না। প্রস্তর যুগের ব্যাপকতর নিদর্শন বিশেষভাবে বিন্ধ্যের দক্ষিণাঞ্চলেই পাওয়া গিয়েছিল, উত্তরভারতে যৎসামান্য ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। প্রাপ্ত সামগ্রীসমূহকেও সে আমলে বর্ণনা করা হত কিছুটা অনির্দিষ্টভাবে, যেমন 'বুশে', 'সেল্ট', 'চিপ্ড স্টোন' 'প্যালিওলিথ', 'গিলোটিন-টাইপ', 'মাদ্রাজ-টাইপ' প্রভৃতি। শেষোক্ত নামটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে, কেননা দক্ষিণাঞ্চলের হাতিয়ারের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে এগুলি দ্বিমুখী, শিলাখণ্ড বা উপলের দুদিক থেকেই ফ্লেক বা পাত খসিয়ে নির্মিত। মাদ্রাজে প্রথম এই জাতীয় হাতিয়ার পাওয়া যায় বলে (বর্তমান অন্ধ্র প্রদেশ, হায়দ্রাবাদ অঞ্চল ব্যতিরেকে, এবং বর্তমান কর্ণাটকের অনেকটা অংশ তখন মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত ছিল) দক্ষিণী শিল্পধারার নামই দেওয়া হয়েছে মাদ্রাজ শিল্প। প্রাগৈতিহাসিক অনুসন্ধানের

সূচনাপর্বে আদি ও মধ্য প্রস্তর যুগের ভেদ করা সম্ভব হয়নি। ইউরোপের মত হাতকুড়াল শিল্পের প্রাধান্যযুক্ত আদি প্রস্তর যুগের লক্ষণ যে ভারতবর্ষে বর্তমান, এবং ফ্লেক বা পাতশিল্পের প্রাধান্যযুক্ত মধ্য প্রস্তর যুগের লক্ষণও যে এখানে অনুপস্থিত নয় তা প্রতিপাদন করেন কামিয়াড ও বার্কিট, টড, এবং ডে-টেরা ও প্যাটারসন যথাক্রমে দক্ষিণপূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর ভারতে, বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকে। ক্ষুদ্রাশ্ম শিল্পের ব্যাপক অস্তিত্ব সে আমলেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল, কিন্তু এগুলিকে নবাশ্মীয় অধ্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত করার প্রবণতাই ছিল বেশি। এখন যেমন ক্ষুদ্রাশ্মশিল্পকে শেষ প্রস্তর যুগের বৈশিষ্ট্য বলা হয় অথবা পুরাশ্মীয় ও নবাশ্মীয় অধ্যায়ের মধ্যবর্তী মেসোলিথিক বা মধ্যাশ্মীয়-পর্বে স্থান দেওয়া হয়, (অবশ্য নবাশ্মীয় ও তাম্রাশ্মীয় পর্যায়েও ক্ষুদ্রাশ্ম শিল্পের বিশেষ ভুমিকা আছে) তখন তা সম্ভব হয়নি, কেননা খনন কার্য না থাকায় বিশেষ স্তরের মধ্যে সেগুলির অস্তিত্বের মাপকাঠিতে কাল-নির্ণয় করা অসম্ভব ছিল।

নবাশ্মীয় অধ্যায় সম্পর্কে অনুসন্ধান ঃ প্রাগৈতিহাসিক অনুসন্ধানের প্রথম যুগে প্রস্তর যুগের নিদর্শন সমূহের অধিকাংশই আবিষ্কৃত হয়েছিল দক্ষিণ ভারতে, কিন্তু নবাশ্মীয় সামগ্রীসমূহের সবচেয়ে বড় অংশ আবিষ্কৃত হয় উত্তর ভারতে। উত্তর প্রদেশের বান্দা জেলা এবং মধ্যপ্রদেশের জবলপুর জেলাকে কেন্দ্র করেই নবাশ্মীয় অনুসন্ধানের সূচনা হয়েছিল।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এইচ. পি. লে-মেসুরিয়ে সর্বপ্রথম টোনস নদীর উপত্যকায় কয়েকটি নবাশ্মীয় মসৃণ কুঠার আবিষ্কার করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ডাব্লউ. থিওবাল্ড উত্তর প্রদেশের বান্দা জেলায় কুঠারসহ বহু নবাশ্মীয় আয়ুধ সংগ্রহ করেন। এরপর বান্দা জেলায় সার্থকভাবে নবাশ্মীয় অনুসন্ধান করেছিলেন ককবার্ন (১৮৭৯) কানিংহাম (১৮৮৫) এবং সেটন-কার (১৯০৪)। আর. ই. রস (১৮৮২) মেনপুরী জেলা থেকে, জে. এইচ. রিভেট-কার্ণক (১৮৮৩) মির্জাপুর জেলা থেকে, আলেকজাণ্ডার কানিংহাম (১৮৮৫) পরতাবগঞ্জ জেলা থেকে এবং জন মার্শাল এলাহাবাদের নিকটবর্তী ভিটা থেকে বহু নবাশ্মীয় উপকরণ, বিশেষ করে পালিশ করা কুঠার, আবিষ্কার করেন।

মধ্যপ্রদেশের জবলপুর থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি নবাশ্মীয় আয়ুধের উপর ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে লে মেসুরিয়ে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। জবলপুর থেকে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আর. ই. সুইনি অনেকগুলি নবাশ্মীয় মূল ও পাত শিল্পের নিদর্শন আবিষ্কার করেন। ওই অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত আগেট পাথর নির্মিত নানা সামগ্রীর একটি প্রদর্শনী করেন ব্লানফোর্ড, কলকাতার এশিয়াটিক

সোসাইটিতে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। প্রদর্শিত সামগ্রীসমূহকে তিনি দু'ভাগে ভাগ করেন, যেগুলি ইউরোপে প্রাপ্ত নবাশ্মীয় সামগ্রীর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত এবং যেগুলি ভিন্ন ধরনের। পরবর্তীকালে জবলপুর ও সন্নিহিত অঞ্চলে নবাশ্মীয় অনুসন্ধান করেন ডব্লিউ. জি. ওলফার্টস, কর্নেল গেটস ও মেজর অ্যাবট।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের পরেশনাথ পাহাড়ের নিম্নাঞ্চল থেকে পালিশ করা কৃষ্ণবর্ণ শ্লেটের তৈরি অর্ধচন্দ্রাকার প্রান্তযুক্ত একটি বড় ধরনের কুঠার পাওয়া যায়। জে. দেবেরিয়া সাহেবগঞ্জের গঙ্গার তীর থেকে এবং মানভুম থেকে দুইটি আকর্ষণীয় চুনাপাথরের কুঠার আবিষ্কার করেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ভিনসেন্ট বল ছোটনাগপুরের বুরাদিহ থেকে কিছু পালিশ করা ফ্লেকের সন্ধান পান। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ডব্লিউ. এইচ. পি. ড্রাইভার রাঁচির সন্নিকটে একটি নবাশ্মীয় বসতি আবিষ্কার করেন। তাঁর সংগৃহীত সামগ্রী-সমূহের একটি বর্ণনামূলক তালিকা প্রকাশ করেন জে. উড-মেসন। এগুলির মধ্যে অধিকাংশই ছিল কুঠার, বলয়াকার সামগ্রী ও বর্শাফলক। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে হীরালাল ছোটনাগপুরের কাকেয়া-যশপুর থেকে বেলেপাথরে তৈরি একটি কুঠার প্রাপ্ত হন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে পি. ও. বোডিং সাঁওতাল পরগণা থেকে কিছু আয়ুধ সংগ্রহ করেন এবং সেগুলির বর্ণনা প্রকাশ করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে হাজারিবাগের ইঞ্জিনিয়ার নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী কয়েকটি পালিশ করা কুঠার আবিষ্কার করেন।

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পাহাড়ে একটি প্রস্তরীভূত অপূর্ব পালিশযুক্ত কুঠারের হাতল আবিষ্কৃত হয়। আসামে মিঃ পেনী তেজপুর থেকে প্রচুর সংখ্যক নবাশ্মীয় কুঠার আবিষ্কার করেন। অনুরূপ সামগ্রী ডিব্রুগড়, কাছাড় ও শিবসাগর জেলা থেকেও সংগৃহীত হয়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত আসাম থেকে প্রাপ্ত আয়ুধসমূহের বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে কগিন ব্রাউন আসামে প্রাপ্ত হাতুড়িজাতীয় আয়ুধের সঙ্গে পূর্ব-এশিয়ায় অন্যত্র প্রাপ্ত অনুরূপ আয়ুধের তুলনামূলক বিচার করেন।

সিন্ধুপ্রদেশের সুক্কুর এবং রোহুরি অঞ্চলে চুনাপাথরে তৈরি পালিশ করা মুল ও পাত্রশিল্পের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে স্যার জন ইভান্স সুক্কুরের নিকটবর্তী নদীতরে কিছু পালিশ করা মুল ও পাত্র আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে ওই অঞ্চল থেকে অনুরূপ সামগ্রী বহুল পরিমাণে আবিষ্কার করেন ব্লানফোর্ড, যেগুলির বিবরণ প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পি. ফেডেন নিম্নসিন্ধু অঞ্চলের সিরাক নামক স্থান থেকে পালিশ করা পাথরের একটি বাটালি আবিষ্কার করেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে থিওবাল্ডে আটক থেকে ২১ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সিন্ধুর বিপরীত

তীরে সাদিপুর নামক স্থান থেকে মধ্যমাকার চুনাপাথরে নির্মিত তীক্ষ্ন অথচ অর্ধগোলাকার প্রান্তযুক্ত একটি পালিশ করা কুঠার আবিষ্কার করেন। বালুচিস্তানের কোয়েটার নিকটবর্তী মিরি থেকেও কিছু সামগ্রী আহৃত হয়।

দক্ষিণ ভারতের বেলারি জেলায় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম ফ্রেসার কিছু নবাশ্মীয় কুঠার এবং কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পাথরের হাতিয়ার আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে (১৮৮৪-৯০) ব্রুস ফুট এবং সি. ই. কারডিউ বেলারি ও অনন্তপুর জেলা থেকে অনেকগুলি নবাশ্মীয় বসতি আবিষ্কার করেন। উত্তর আর্কট জেলার ভেলোর তালুক, সালেম জেলার তিরাপতুর তালুক এবং কুর্গ থেকেও বহু নবাশ্মীয় কুঠার আবিষ্কৃত হয়। ব্রুস ফুট তিরুনেলভেলি জেলায় ক্ষুদ্রাশ্ম শিল্পের ব্যাপক বিকাশ লক্ষ্য করেন। তিরুনেলভেলি, পেরাম্বাইর এবং আদিত্যনাল্লুর থেকে প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক সামগ্রীসমূহের যে সকল তালিকা আলেকজাণ্ডার রী প্রকাশ করেন যথাক্রমে ১৯০৩, ১৯০৮ এবং ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে সেগুলিতে ওই সকল অঞ্চলে প্রাপ্ত নবাশ্মীয় কিছু সামগ্রীর পরিচয় বর্তমান।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে প্রাগৈতিহাসিক অনুসন্ধানের সূচনাপর্বে মৃৎশিল্প সম্পর্কেও সন্ধানকারীরা আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন এবং এদেশে মৃৎপাত্রের উদ্ভব যে নবাশ্মীয় অধ্যায় থেকে শুরু হয়েছিল এ-বিষয়েও তাঁরা নিঃসন্দেহ ছিলেন। অনন্তপুর, কুর্নুল, কুড্ডাপা, তিরুনেলভেলি, সালেম, বেলারি, হায়দ্রাবাদ, বরোদা, কাথিয়াবাড়, বালুচিস্তান এবং অপরাপর অঞ্চল থেকে তাঁরা বহু মৃৎপাত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এম. জে. ওয়ালহাউস প্রাগৈতিহাসিক মৃৎশিল্পের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা প্রকাশ করেন। রী ১৯০৩-০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিরুনেলভেলি থেকে প্রাপ্ত মৃৎসামগ্রীসমূহের উপর আলোকপাত করেন। তবে এই সকল আলোচনা নিছকই তালিকা ও বর্ণনামূলক। মৃৎশিল্পের বিভিন্ন ধারা আবিষ্কার, কাল নির্ণয়, প্রভাবের ক্ষেত্র এবং পারম্পর্য প্রতিষ্ঠা করা তাঁদের পক্ষে সঙ্গতভাবেই সম্ভব হয়নি। প্রসঙ্গত এটাও উল্লেখযোগ্য যে কতিপয় মহাশ্মীয় সমাধিকেও সে আমলের অনুসন্ধানকারীরা নবাশ্মীয় অধ্যায়ে স্থান দিয়েছিলেন।

ধাতব যুগ সম্পর্কে অনুসন্ধান : সে আমলের প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান-কারীদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ভারতে কোন ব্রোঞ্জ যুগের অস্তিত্ব কদাপি ছিল না, এমন কি দক্ষিণভারতেও কোন তাম্রযুগ আসেনি, নবাশ্মীয় অধ্যায় থেকেই লৌহযুগে উত্তরণ ঘটেছিল, যদিও উত্তরভারতে একটি ক্ষণস্থায়ী তাম্রযুগের অস্তিত্ব তাঁরা স্বীকার করতেন। এই ধারণাটিকে বিশেষভাবে

চালু করেন ভিনসেণ্ট স্মিথ ১৯০৫-০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি রচনায়। তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে এটুকু বলা যায় যে সত্যই সে আমলে দক্ষিণাঞ্চল থেকে কোন তাম্রনির্মিত সামগ্রী আবিষ্কৃত হয়নি। ভারতের নানাস্থান থেকে ব্রোঞ্জনির্মিত মোট সাতটি সামগ্রী পাওয়া গিয়েছিল যেগুলির বর্ণনা প্রকাশ করেছিলেন ওয়ালহাউস ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু এই সাতটি সামগ্রীর উপর নির্ভর করে ব্রোঞ্জযুগের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা অসম্ভব ছিল। যদিও ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরোর আবিষ্কার প্রাচীন ধারণাকে বদলে দিয়েছে, কিন্তু সে কথা স্বতন্ত্র।

এ দেশে প্রথম তাম্রনির্মিত সামগ্রী পাওয়া যায় ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে যার কথা পূর্বে বলা হয়েছে। এর কিছুকাল পরেই উত্তরপ্রদেশের ফারুখাবাদ জেলার ফতেগড় থেকে ১৩টি তাম্রনির্মিত কুঠার আবিষ্কৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে উত্তরপ্রদেশ, বিশেষ করে গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চল তাম্রনির্মিত সামগ্রীর একটি বড় ক্ষেত্র। ১৮৬৮-তে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী মৈনপুরী থেকে দুইটি তাম্রনির্মিত কুঠার ও একটি বর্শাফলক পাওয়া যায়। এটওয়া জেলার নিওরাই থেকেও কিছু তাম্রনির্মিত আয়ুধ পাওয়া যায়। কানিংহাম মথুরা অঞ্চল থেকে কিছু তাম্রসামগ্রী সংগ্রহ করেন। উত্তরপ্রদেশের বিজনোর জেলার অন্তর্গত রাজপুর থেকে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৬টি তাম্রনির্মিত সামগ্রী পাওয়া যায়, দশটি কুঠার এবং ছয়টি বর্শাফলক।

কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাম্রনির্মিত সামগ্রীর সংগ্রহ আবিষ্কৃত হয় মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার অন্তর্গত গুঙ্গেরিয়া থেকে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে। এই সংগ্রহের মধ্যে ৪২৪ টি তাম্রনির্মিত সামগ্রী ও ১০২টি রৌপ্যনির্মিত সামগ্রী বর্তমান ছিল। গুঙ্গেরিয়ার তাম্রসংগ্রহের উপর অনেকগুলি রচনা প্রকাশিত হয়। সর্বপ্রথম প্রকাশিত রচনাটির লেখক এ. ব্লুমফিল্ড, প্রকাশকাল ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ।

বালুচিস্তানের অন্তর্গত কোহিস্তান, করাচির নিকটবর্তী ভাগোতরো, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কুররমের নিকট সালোঝান প্রভৃতি স্থানেও তাম্রের হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়। পূর্বদিকে হাজারিবাগ জেলার পণ্ডাম্বা, পালামৌ জেলার সগুনা, মেদিনীপুর জেলার ঝাটিবানি প্রভৃতি স্থান থেকেও তাম্র-নির্মিত সামগ্রীর সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে কগিন ব্রাউন পালামৌ জেলা এবং কুররম এজেন্সি থেকে প্রাপ্ত তাম্রনির্মিত কুঠার সম্পর্কে আলোচনা করেন।

মধ্য ও দক্ষিণভারতের মেগালিথিক বা মহাশ্মীয় সমাধিসমূহ অনুসন্ধান-কারীদের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের পঞ্চম দশকেই যে

মীডোজ টেলর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কয়েকটি মহাশ্মীয় সমাধি উৎখনন করেন সে কথা আগেই বলা হয়েছে। এখনকার প্রত্নতত্ত্ববিদরাও স্বীকার করেন যে তাঁর খননপদ্ধতি তুলনামূলকভাবে আধুনিক ছিল। ১৮৬২ থেকে ১৮৬৫-র মধ্যে মীডোজ টেলর শোরাপুর জেলার মহাশ্মীয় সমাধিসমূহের উপর কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ডব্লিউ স্মিথ ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে নরউইচে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রাগৈতিহাসিক সম্মেলনে দক্ষিণভারতের সমাধিসমূহের উপর একটি গবেষণাপত্র পাঠ করেন। দক্ষিণে মহাশ্মীয় সমাধির সংখ্যা প্রচুর। কেবলমাত্র বেলারি জেলা থেকেই দু'হাজারের মত সমাধির অস্তিত্ব নথিভুক্ত হয়। তিরুনেলভেলি জেলার আদিত্যনাল্লুরের বিখ্যাত সমাধিক্ষেত্র সে-আমলেই দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। এছাড়া কাশ্মীরেও মহাশ্মীয় সমাধি পরিলক্ষিত হয়েছিল। সঙ্গতভাবেই এই মহাশ্মীয় সমাধি-গুলিকে লৌহযুগের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছিল, যদিও এগুলির মধ্যে কয়েকটি নবাশ্মীয় অধ্যায়ের হতে পারে এইরকম অনুমানও করা হয়েছিল। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে গার্স্টিন ও ওয়ালহাউস করোমণ্ডল উপকূলের সমাধিসমূহের উপর রচনা প্রকাশ করেন। ই. মোক্‌লের লেখেন বালুচিস্তানের বসতি ও সমাধিক্ষেত্রের উপর। ১৮৭৭-এ আর. কলড্‌ওয়েল দক্ষিণ ভারতের পাত্র-সমাধির উপর আলোকপাত করেন এবং হায়দ্রাবাদের নিকটবর্তী মুঙ্গাপেটের সমাধিক্ষেত্রের উপর বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশ করেন ডব্লিউ. কিং। ১৮৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দে বি. বি. আর. ব্রানফিল উত্তর আর্কট ও মধ্য কর্ণাটকের মহাশ্মীয় সমাধিসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮৮৭-তে সার্জেন জেনারেল বিডিক পল্লাবরমের মহাশ্মীয় সমাধিসমূহের উপর আলোচনা করেন এবং ১৮৮৮-তে এ. এস. রী সাধারণভাবে সমগ্র দক্ষিণভারতের সমাধিক্ষেত্রগুলির সমীক্ষা করেন। আর. সিউএল সাধারণভাবে দক্ষিণ ভারতের এবং বিশেষ-ভাবে বেলারি জেলার সমাধিক্ষেত্রসমূহের সমীক্ষা করেন এবং তার ফলাফল প্রকাশ করেন ১৮৯৯ থেকে ১৯০২-এর মধ্যে।

উত্তর ভারতের কাইমুর গিরিশ্রেণীর গুহাচিত্রসমূহের উপর বিশেষ আলোকপাত করেন জে. ককবার্ন এবং ভি. এ. স্মিথ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। বান্দা জেলার গিরিচিত্র নিয়ে আলোচনা করেন সি. এ. সিলবেরাড ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে।

উপসংহার ঃ প্রাগৈতিহাসিক অনুসন্ধানের সূচনাপর্ব সম্পর্কে আরও দু' একটি খবর দিয়ে বক্ষ্যমান প্রসঙ্গের ইতি করা ভাল। মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট মিউজিয়ামে ব্রুস ফুট সংগ্রহের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রুস ফুট নিজেই সেখানে সংগৃহীত প্রাগৈতিহাসিক সামগ্রীসমূহের একটি তালিকা

প্রকাশ করেন ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে। পরবর্তীকালে ব্রুস ফুট সংগ্রহের উপর একটি বিশদ তালিকা প্রকাশিত হয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু ১৮৬৪ থেকে ১৯০২ পর্যন্ত সংগৃহীত প্রত্নসামগ্রীর সর্বাধিক অংশ কলকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। এগুলির একটি তালিকা প্রণয়ন করেন কগিন ব্রাউন যা ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে স্যার জন মার্শাল কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রস্তর সামগ্রীর উপর প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন এ. সি. লোগান যা প্রকাশিত হয় ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে। প্রাগৈতিহাসিক ভারতবর্ষের উপর দ্বিতীয় গ্রন্থ রচনা করেন পঞ্চানন মিত্র যা কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃক ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মিত্রজ মহাশয়ের গ্রন্থটি জনপ্রিয় হয়েছিল এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটির সংশোধিত এবং পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রত্নস্থল ও প্রাপ্ত সামগ্রীসমূহের উপর বিভিন্ন সংগ্রাহক ও লেখক রচিত বহু নিবন্ধ নানা পত্রপত্রিকায় ব্রুস ফুটের আমল থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল, যেগুলির একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণী প্রকাশ করেন হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে।

আধুনিক অনুসন্ধান ও গবেষণার সূত্রপাত

হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কার ঃ ১৯২১ সালে পাঞ্জাবের মন্টোগোমারি জেলার অন্তঃপাতী হরপ্পায় একটি পরীক্ষামূলক খননকার্য শুরু করা হয় যার ফলে তাম্রাশ্মীয় ও ব্রোঞ্জ যুগের একটি সভ্যতার অস্তিত্বের উৎসমুখ খুলে যায়। হরপ্পার প্রত্নক্ষেত্রটি সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন চার্লস ম্যাসন ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে। আলেকজান্ডার কানিংহাম ১৮৫৩ ও ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এই অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন এবং কিছু হরপ্পীয় সামগ্রী সংগ্রহ করেন যেগুলির মধ্যে কতিপয় সীল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জন ফেথফুল ফ্লীট ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে হরপ্পীয় সীলে উৎকীর্ণ লিপির চরিত্র নিয়ে আলোচনা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে দুর্ভাগ্যক্রমে হরপ্পার বিশাল প্রত্নক্ষেত্র আধুনিক যুগের বর্বরতার শিকার হয়। দুই ভাই, জন ও উইলিয়ম ব্রান্টন, রেলপথের জন্য ইট সরবরাহের ঠিকা নিয়ে হরপ্পার প্রভুত ক্ষতিসাধন করেন। শেষ পর্যন্ত প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের টনক নড়ে এবং হরপ্পায় পরীক্ষামূলক খননকার্য চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলার অন্তর্গত মহেঞ্জোদরোতে একটি বৌদ্ধ স্তূপ উৎখননকালে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আকস্মিকভাবে এখানে তাম্রাশ্মীয় ও ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনসমূহ আবিষ্কার করেন। হরপ্পার সঙ্গে মহেঞ্জোদরোর গঠনগত সৌসাদৃশ্য খুব সহজেই ধরা পড়ে, এবং মহেঞ্জোদরোর প্রত্নক্ষেত্রটি হরপ্পার মত ক্ষতিগ্রস্ত না থাকায় পরবর্তী অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা হয়। মহেঞ্জোদরো থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহের বিবরণ যখন সংক্ষিপ্তভাবে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইলাস্ট্রেটেড লণ্ডন নিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তখনই ইউরোপীয় পণ্ডিতরা উপলব্ধি করেন যে এখানকার অনুরূপ সীল ইরাকের কয়েকটি প্রত্নক্ষেত্রে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রকের স্তরে বর্তমান, এবং সেই হিসাবে এই সভ্যতার সূত্রপাত খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে। এই সভ্যতা ব্রোঞ্জযুগের নিদর্শক। সিন্ধু নদীর তীরে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরো শহর দুটির অবস্থান ছিল বলে সে-আমলে এই সভ্যতার নামকরণ হয়েছিল সিন্ধুসভ্যতা। পরবর্তীকালে এই সভ্যতার ব্যাপক বিস্তৃতি প্রতিপাদিত হওয়ায় প্রথম আবিষ্কৃত কেন্দ্রটির নামানুসারে এই সভ্যতাকে হরপ্পা সভ্যতা আখ্যা দেওয়া হয়। মহেঞ্জোদরো উৎখননের বিরাট রিপোর্ট প্রকাশ করেন তৎকালীন প্রত্ন-অধিকর্তা স্যার জন মার্শাল। এটি প্রকাশিত হয় তাঁর অবসর গ্রহণের তিন বছর পর, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে, তিন খণ্ডে। হরপ্পার উৎখননের রিপোর্ট প্রকাশ করেন পণ্ডিত মাধো স্বরূপ ভাট্স (বৎস) ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে।

এতবড় গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার অনুসরণ না করে থাকা যায় না, কাজেই খননকার্য চলেছিল ১৯৩১ সাল পর্যন্ত, যার ফলে জানা গিয়েছিল যে মহেঞ্জোদরোতে ক্রমান্বয়ে সাতবার ও হরপ্পায় আটবার অধিবসতি হয়েছিল। দুটি নগরের ধ্বংসাবশেষ থেকে জানা যায় যে এই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য পোড়া-মাটির ইটের বাড়ি, সুবিন্যস্ত নগর পরিকল্পনা, উন্নতধরনের পয়ঃপ্রণালী ও বহুতর ভোগ্যদ্রব্যের সমাবেশ। উভয় নগর থেকেই চুনাপাথরের সীল, জীবজন্তুর প্রতিকৃতি (উৎকীর্ণ লিপিসহ), নানা আকারের চক্রনির্মিত এবং কখনো কখনো কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত মৃৎপাত্র, চার্টপাথরের নির্মিত লম্বা ফলা, ব্রোঞ্জের নানাবিধ দ্রব্য, আধাদামি পাথরের মালা এবং একক পুঁতি, স্বর্ণ দ্রব্যাদি এবং দেব-দেবী-মানুষ-জীবজন্তুর পোড়ামাটির মূর্তিকা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদরোতে পরবর্তী উৎখননের বিবরণ প্রকাশ করেন আর্নস্ট ম্যাকে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মর্টিমার হুইলার হরপ্পায় পুনরুৎখনন করে একটি প্রতিরক্ষা প্রাকার আবিষ্কার করেন। এছাড়া তিনি হরপ্পার দুটি সমাধিক্ষেত্রে (সিমেট্রি আর—৩৭, এবং সিমেট্রি এইচ) উৎখনন করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে প্রথমোক্ত সমাধিক্ষেত্রটি প্রথম উৎখনন করেন কে. এন. শাস্ত্রী ১৯৩৭ থেকে ১৯৪১-এর মধ্যে এবং শেষোক্ত সমাধিক্ষেত্রটি প্রথম উদ্ঘাটন করেন এম. এস. ভাটস ১৯২৮ থেকে ১৯৩৪-এর মধ্যে। শেষোক্তটির অবস্থান হরপ্পাতে হলেও তা হরপ্পীয় সংস্কৃতির পরিচায়ক নয়, একটি আগন্তুক সংস্কৃতির পরিচায়ক। হুইলার কর্তৃক হরপ্পার পুনরুৎখননের বিবরণ প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। প্রসঙ্গত আরও উল্লেখযোগ্য যে ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষে অন্যূন ৩৭টি হরপ্পা সভ্যতার কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়।

হরপ্পা সভ্যতার উৎস ও বিস্তৃতি সম্পর্কিত অনুসন্ধান ঃ হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই একথা বোঝা গিয়েছিল যে এই সভ্যতা আকাশ থেকে পড়েনি। এর নানা অতীত পর্যায় থাকা উচিত, এবং আবিষ্কৃত কেন্দ্রগুলি ছাড়াও আরও কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া দরকার। কাজেই হরপ্পা সভ্যতার উৎস এবং অনুবর্তন অন্বেষণের জন্য সিন্ধুপ্রদেশ ও বালুচিস্তানে বিস্তৃত সন্ধানকার্য চলে এবং উভয় স্থানেই প্রাক্-হরপ্পীয় এবং হরপ্পা-উত্তর সংস্কৃতিসমূহের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে এইচ. হারগ্রীভস বালুচিস্তানে খননকার্য চালান বিশেষ করে সোহর, রামপুর, মাস্তুঙ্গ এবং নাল-এ, এবং এই কাজের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯২৯-এ। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ববিভাগে একটি এক্সপ্লোরেসন ব্রাঞ্চ বা অনুসন্ধান শাখা খোলা হয়। মার্ক অরেল স্টাইন বালুচিস্তানের উত্তরে এবং পশ্চিমে

ব্যাপক অনুসন্ধান করেন এবং তাঁর অনুসন্ধানের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৩১, ১৯৩৭, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। যে সকল স্থানে স্টাইন পরীক্ষামূলক খননকার্য চালিয়েছিলেন সেগুলি হল পেরিয়ানো-ঘুণ্ডাই, মুঘল-ঘুণ্ডাই, ডাবর-কোট, কুল্লী, মেহী, শাহীটুম্প, সুতকাগেনদোর প্রভৃতি। এই সকল খননকার্যের অধিকাংশ ১৯২৭-২৯ এর মধ্যে সম্পন্ন হয়। সিন্ধুপ্রদেশে অনুসন্ধান ও পরীক্ষামূলক খননকার্য চালান ননীগোপাল মজুমদার এবং তিনি অম্রী নামক বিখ্যাত প্রাক্-হরপ্পীয় প্রত্নক্ষেত্রটি আবিষ্কার করেন। সিন্ধুপ্রদেশে অনুসন্ধানের ফল তিনি প্রকাশ করেন ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। দুঃখের বিষয় মজুমদার কর্তব্যরত অবস্থায় উপজাতীয়দের দ্বারা নিহত হন। ১৯৩২-এর প্রত্ন আইন পরিবর্তনের সুযোগে আমেরিকার স্কুল অব ইণ্ডিক অ্যাণ্ড ইরানীয়ান স্টাডিজ এবং বোস্টন মিউজিয়াম অব ফাইন আর্টসের যৌথ উদ্যোগে আর্নস্ট ম্যাকের নেতৃত্বে ১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুপ্রদেশের নবাব-শাহ্ জেলায় ছানহুদরোতে উৎখনন হয়। এই উৎখননের রিপোর্ট ম্যাকে কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১৯৩৮-এ।

প্রাগৈতিহাসিক অনুসন্ধান: ১৯২৪ ও ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে এল. এ. কামিয়াড যথাক্রমে নিম্ন গোদাবরী অঞ্চলের ক্ষুদ্রায়তন হাতিয়ার এবং কুর্নুল গুহাবলীর প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির উপর মূল্যবান বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার সূত্রপাত করেন। কুর্নুল থেকে কামিয়াড বহু প্রাগৈতিহাসিক আয়ুধ সংগ্রহ করেন যেগুলিকে অধ্যাপক এম. সি. বার্কিট স্তর ও ধরনের ভিত্তিতে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন যথা—হাতকুড়াল ও ছেদক, নানাপ্রকার ফ্লেক বা পাতনির্মিত অস্ত্র, ফলা এবং খোদক ও ক্ষুদ্রাশ্মীয় হাতিয়ার। দক্ষিণ পূর্ব ভারতের প্রস্তরযুগের উপর এবং প্রস্তরযুগে ওই অঞ্চলে আবহাওয়ার পরিবর্তনের উপর ১৯৩০ ও ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে যে দুটি মূল্যবান আলোচনা প্রকাশিত হয় সেগুলির লেখক ছিলেন কামিয়াড, বার্কিট এবং এফ. জে. রিচার্ডস। তাঁদের প্রচেষ্টায় দক্ষিণ-পূর্ব অর্থাৎ অন্ধ্র-তামিলনাড়ু অঞ্চলে আদি ও মধ্য-প্রস্তরযুগের একটি প্রাথমিক বিভাজন সম্ভবপর হয়।

১৯৩২-এ কে. আর. ইউ. টড. পশ্চিম উপকূলে কাম্বিভিলিতে কয়েকটি স্তরবিশিষ্ট এমন একটি প্রত্নক্ষেত্র আবিষ্কার করেন যেখানে প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। সর্বনিম্ন স্তরে প্রাপ্ত হাতিয়ারগুলি কোপানি (চপার) ও চাঁছনি-বাটালি (স্ক্রেপার) জাতীয়, বেশির ভাগই অমসৃণ মূল বা অশ্মি (কোর) থেকে নির্মিত এবং কয়েকটি ফ্লেক বা পাত থেকে। এখানে এমন কিছু হাতিয়ার পাওয়া গেছে যেগুলির সঙ্গে উত্তর ফ্রান্সের আবেভিল এবং দক্ষিণ-পূর্ব

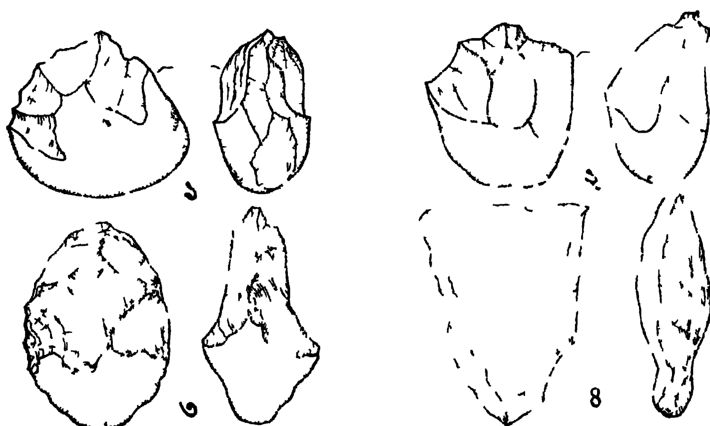
ইংল্যান্ডের ক্লাকটোন নামক স্থানদ্বয়ে প্রাপ্ত হাতিয়ারের সাদৃশ্য আছে। এছাড়া কিছু হাতকুড়াল ও ছেদক (ক্লিভার) উত্তর ফ্রান্সের আমিয়েন্সের নিকটবর্তী আসেউল নামক স্থানে প্রাপ্ত সামগ্রীর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত।[১] কান্দিভিলির মধ্যস্তরে কাদার মধ্যে ফ্লেক নির্মিত ছোট হাতকুড়াল ও ফলাশিল্পের বিশেষ বিকাশ দেখা যায় যার সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের অউরিগনাক থেকে প্রাপ্ত ফলার মিল আছে। সবচেয়ে উপরের ভূ-পৃষ্ঠ থেকে পাওয়া গেছে অজস্র মাইক্রোলিথ বা ক্ষুদ্রাশ্ম।

১৯৩৫-এ ইয়েল-কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেরিত প্রত্ন-ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষক দল ডে টেরা, প্যাটারসন এবং চার্ডিনের (সার্দ্যাঁ) নেতৃত্বে কাশ্মীর, জম্মু, উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, নর্মদা উপত্যকা ও তামিলনাড়ুতে তুষারযুগ ও তৎসম্পর্কিত মানবসংস্কৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান চালান। পাঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডির নিকট সোয়ান নদীর উপকূলে চারটি তটচত্বরে অনুসন্ধান চালিয়ে তাঁরা প্রচুর প্রত্নাশ্মের সন্ধান পান। প্রাপ্ত হাতিয়ারগুলিকে প্যাটারসন আদি-সোয়ান ও পরবর্তী-সোয়ান এই দুই পর্যায়ে ভাগ করেন। আদি-সোয়ানের পরিচয় পাওয়া যায় প্রথম চত্বরে, পরবর্তী-সোয়ানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় চত্বরে। চতুর্থ চত্বরে ব্লেড বা ফলা শিল্পের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই ধারার নাম দেওয়া হয়েছে বিবর্তিত-সোয়ান। এছাড়া একটি প্রাক্-সোয়ান সমাবেশের পরিচয় পাওয়া যায় উত্তর-শিবালিক অঞ্চলে যার বৈশিষ্ট্য অমসৃণ বৃহদায়তন পাতশিল্প। ভূতাত্ত্বিক কালানুক্রমের হিসাবে সোয়ান শিল্পধারার বিভিন্ন পর্যায়গুলি মধ্য ও উচ্চ প্লাইস্টোসীন যুগের।

আদি-সোয়ান শিল্পধারার বৈশিষ্ট্য উপল ও পাতনির্মিত হাতিয়ার এবং আবেভিলীয়-আসেউলীয় ধরনের হাতকুড়াল। পরবর্তী-সোয়ান শিল্পধারার নিদর্শন হিসাবে পলকাটা পাত ও মূল (কোর) নির্মিত হাতিয়ার, উপল

১। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ভারতীয় প্রত্নাশ্মের ধরন বিচারে প্রত্নতত্ত্ববিদরা আবেভিলীয় আসেউলীয় শিল্পধারার সাদৃশ্য প্রায়ই টেনে থাকেন, বিশেষ করে হাতকুড়ালের ক্ষেত্রে, যেগুলির নিদর্শন পাওয়া গেছে আদি-সোয়ান শিল্পধারায়, নিম্ননর্মদা অঞ্চলে, দক্ষিণ ভারতের অত্তিরামপক্কমে, সাবরমতী অববাহিকায় এবং আরও নানা স্থানে। আবেভিলীয় সংস্কৃতিতে হাতকুড়ালই একমাত্র আয়ুধ। এগুলি আয়তনে বড়, কারিগরি কিছুটা অমার্জিত, প্রধানত ফ্লেক বা পাত থেকে তৈরি, অগ্রভাগ তীক্ষ্ম, সামগ্রিক আকার পেয়ারার মত। বর্তমানে আবেভিলীয় পরিভাষাটির বদলে চেলীয় (চেলিয়ান, সেলিয়ান) বা প্রাক্-আসেউলীয় বলা হয়। আসেউলীয় সংস্কৃতিতেও হাতকুড়ালের প্রাধান্য, তবে আবেভিলীয় হাতকুড়ালের তুলনায় আসেউলীয় হাতকুড়াল ছোট, হাল্কা এবং মার্জিত। আয়ুধ তৈরির ক্ষেত্রে সিলিন্ডার হ্যামার কারিগরির প্রয়োগ দেখা যায়। এই কারিগরির বৈশিষ্ট্য আয়ুধ তৈরির পাথরটিকে অন্য বস্তু দিয়ে আঘাত করে তা থেকে পাত খসিয়ে নেওয়া। যে বস্তু দিয়ে আঘাত করা হয় তার আকার, দৈর্ঘ্য এবং ভর নির্দিষ্ট মাপের পাত ছাড়ানোর পক্ষে অনুকূল হয়। আসেউলীয় ধরনের হাতকুড়াল এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশেই পাওয়া যায়।

নির্মিত হাল্কা হাতিয়ার, ফলা ও দীর্ঘায়ত পাতের হাতিয়ারের উল্লেখ করা চলতে পারে। পাত ও মূল শিল্পেব ক্ষেত্রে লেভালোয়া-কারিগরিব আভাস মেলে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে পূর্ব পাঞ্জাবের শিবসা উপত্যকায়, কাংরা জেলার বিপাশা ও বাণগঙ্গা উপত্যকায় এবং দক্ষিণে অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল ও কুড্ডাপা জেলায় সোয়ানের অনুরূপ উপল ও শিলাস্ফটিক নির্মিত হাতিয়ার পাওয়া গেছে। সোয়ান থেকে প্রাপ্ত হাতিয়ারসমূহেব একটা বড় অংশ কেম্ব্রিজ ও ইয়েলে রক্ষিত আছে। কিছু আছে কলকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে। ১৯৩৬-৩৭-এ ধরনী সেন ওই অঞ্চল থেকে কিছু সামগ্রী সংগ্রহ করেন যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিভাগে রক্ষিত আছে।



আদি প্রস্তর যুগেব আয়ুধ : সোয়ান উপত্যকা।
১-২. কোপানি, ৩. হাতকুড়াল, ৪ ছেদক

ইয়েল কেম্ব্রিজ দল নর্মদা উপত্যকায় জবলপুর ও হোসঙ্গাবাদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে সমীক্ষা চালিয়ে ভূতাত্ত্বিক মধ্য প্লাইস্টোসীন যুগেব জীবাশ্ম ও হাতিয়ারের সন্ধান পান। নিম্ন-নর্মদা অঞ্চলে পশুর জীবাশ্মের সঙ্গে বৃহৎ পাতনির্মিত হাতিয়ার এবং আবেভিলীয়-আসেউলীয় ধবনের হাতকুড়াল পাওয়া যায়। উচ্চ-নর্মদা অঞ্চলেও পাত ও মূল শিল্পের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, ডে-টেরার মতে যা ধরনের দিক থেকে উত্তর-পশ্চিমের পরবর্তী-সোয়ান শিল্পধারার পরিধির মধ্যে পড়ে।

অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর জেলা থেকে এফ. পি. ম্যানলে বহু প্রস্তরযুগের হাতিয়ার আবিষ্কার করেন যেগুলি মাদ্রাজ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। এই সংগ্রহের উপর ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে এ. আয়প্পন একটি বিশেষ রচনা প্রকাশ করেন যাতে ওই হাতিয়ারগুলির প্রাপ্তিস্থান, ধরন ও গঠনের ভিত্তিতে কাল ও

পারম্পর্য নিরূপণের চেষ্টা করা হয়। ১৯৩৮-৩৯-এ প্যাটারসন ও কৃষ্ণস্বামী পালার অববাহিকায় প্রাপ্ত অজস্র প্রত্নাশ্মের বিবরণ প্রকাশ করেন, ধরনের দিক থেকে যেগুলি ভূতাত্ত্বিক মধ্য প্লাইস্টোসীন যুগের নর্মদা ও পাঞ্জাব অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত আয়ুধসমূহের কাছাকাছি। এই বিষয়ে কৃষ্ণস্বামী আরও নূতন আলোকপাত করেন ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে। প্যাটারসন মাদ্রাজের নিকটবর্তী ভাডামাদুরাই (অনেক বড়মাদুরাই লিখে থাকেন, যা ঠিক নয়) থেকে প্রাপ্ত আয়ুধসমূহকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। প্রাচীনতর ভূসংস্থান থেকে প্রাপ্ত হাতকুড়ালসমূহ আবিভেলীয় ধরনের, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হাতকুড়ালের ক্ষেত্রে আসেউলীয় প্রভাব লক্ষ্যণীয়। অত্তিরামপক্কমের সমৃদ্ধ প্রত্নক্ষেত্রে ভূসংস্থানের ভিত্তিতে কয়েকটি চত্বর নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয় চত্বরে কাঁকরমাটির মধ্যে আসেউলীয় ধরনের হাতকুড়াল ও ছেদক এবং তৎসহ পাত ও অশ্চি শিল্পের একটি বিশেষ ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ধারাটির উল্লেখ আগেই করা হয়েছে মাদ্রাজ-শিল্প নামে, যার বৈশিষ্ট্য দ্বিমুখী হাতিয়ার। এই মাদ্রাজ শিল্পের সঙ্গে নর্মদা ও সোয়ান শিল্পধারার সম্পর্ক টানা হয়, যদিও তা কতদূর সঙ্গত বলা যায় না। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে একমুখী বা সোয়ান-ধর্মী হাতিয়ার হিমালয়ের পাদদেশস্থ অঞ্চলে সাধারণত সীমাবদ্ধ, অন্যত্র মাদ্রাজ-ধর্মী বা দ্বিমুখী হাতিয়ারের প্রাধান্য, যদিও স্থানে স্থানে দু'এরই কিছু সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। অত্তিরামপক্কম থেকে প্রাপ্ত সামগ্রীসমূহের একটা বড় অংশ কেম্ব্রিজে রাখা আছে।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে অনুসন্ধান ও খননকার্যের ভবিষ্যৎ নীতি ও কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য বিশিষ্ট বৃটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার লেনার্ড উলীকে ভারতে আনা হয়। উলী প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কাজকর্মের অত্যন্ত বিরূপ সমালোচনা করেন। তাঁর বক্তব্য, ইউরোপ ও আমেরিকায় অনুসৃত খননপদ্ধতির সঙ্গে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদরা পরিচিত নন, তাঁদের অনুসৃত প্রণালী বড়ই সেকেলে, গভীর খননকার্যের দ্বারা সংস্কৃতিসমূহের পারম্পর্য প্রতিষ্ঠার কোন চেষ্টাই তাঁরা করেননি, এবং সর্বোপরি খননক্ষেত্র নির্বাচনের ব্যাপারেও তাঁরা কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেননি। উলীর সুপারিশে রাও বাহাদুর কে. এন. দীক্ষিতের নির্দেশে ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত বেরিলী জেলার অহিচ্ছত্রা নামক স্থানে ব্যাপক খননকার্যের দ্বারা খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে আরম্ভ করে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক পর্যন্ত বিরাট কালসীমার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর গাঙ্গেয় অববাহিকায় সংস্কৃতিসমূহের অনুক্রম ও পারম্পর্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

দীক্ষিতের অনুপ্রেরণায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দিনাজপুর জেলার বাণগড়ে খননকার্য চালায় ১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। কোন

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে খননকার্যে অগ্রণী হওয়া ভারতে এই প্রথম। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিভাগের তরফ থেকে নির্মলকুমার বসু ও ধরনী সেনের নেতৃত্বে ময়ূরভঞ্জ জেলায় প্রস্তরযুগের সংস্কৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো হয়। বুরহাবালঙ ও তার উপনদীসমূহের তটে বহু আয়ুধ আবিষ্কৃত হয় যেগুলির মধ্যে নানা ধরনের কোপানি, হাতকুড়াল, ছেদক এবং বাটালি বর্তমান। আবেভিলীয়-আসেউলীয় ধরনের সঙ্গে এই সব হাতিয়ারেব ধবনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বারিপোদা থেকে বাঙ্গীরপোসি পর্যন্ত কুড়ি মাইল দূরত্বের মধ্যে ল্যাটেরাইট ভূসংস্থানের থাকে থাকে এই সকল আয়ুধ পাওয়া যায়। একস্থানে নদীকূলে বোল্ডার-পুঞ্জের মধ্যে কিছু রুক্ষ গোলাকার উপলনির্মিত আয়ুধ, মূল থেকে নির্মিত আয়ুধ এবং বৃহদায়তন পাত পাওয়া যায়, যেগুলি মাদ্রাজের নিকটবর্তী ভাডামাদুরাই থেকে প্রাপ্ত সামগ্রীর অনুরূপ।

গুজরাতে সাবরমতী উপত্যকায় অনুসন্ধানের জন্য দীক্ষিত একটি 'প্রাগৈতিহাসিক-দল' গঠন করেন। ১৯৪১-৪২-এ এই দল ল্যাটেরাইটগঠিত মৃত্তিকাগর্ভ থেকে হাতকুড়াল এবং উপলনির্মিত কোপানি-জাতীয় বহু আয়ুধ আবিষ্কার করেন। এই আয়ুধগুলির ভিত্তিতে কৃষ্ণস্বামী এই মত ব্যক্ত করেন যে গুজরাতে সোয়ান ও মাদ্রাজ শিল্পধারার সমন্বয় হয়েছে। অংশত সাংকালিয়াও এই মত স্বীকার করেন, কেননা তাঁর মতে দক্ষিণের সঙ্গে গুজরাতের সাংস্কৃতিক সংযোগের কিছু সূত্র বর্তমান। পুনার ডেকান কলেজের তরফ থেকে সাংকালিয়া ও তাঁর সহকর্মিগণ গুজরাতের আদিম মানুষ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য কয়েকটি ক্ষুদ্রাশ্মীয় কেন্দ্রে অনুসন্ধান চালান, এবং তার ফলাফল তিনি ও ইরাবতী কার্ভে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে সাংকালিয়া সাবরমতী উপত্যকা ও উত্তর গুজরাতের আবেভিলীয়-আসেউলীয় শিল্পধারার সঙ্গে ক্ষুদ্রাশ্ম শিল্পধারার ভূতাত্ত্বিক ও কালগত সম্পর্কের উপর আলোকপাত করেন। সাবরমতী ও মহী উপত্যকায় কংকরময় ভূপৃষ্ঠ এবং পলিমাটির মধ্যে উপল-নির্মিত আয়ুধ, দ্বিমুখী হাতিয়ার এবং পাতশিল্পের মিশ্রিত নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় যেগুলির পরিচয় বি. সুব্বারাও ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। জিউনার (ৎসয়নের) সাবরমতী শিল্পধারাকে পরবর্তী-সোয়ান শিল্পধারার সঙ্গে সম্পর্কিত করে ওই শিল্পধারাকে ভূতাত্ত্বিক প্লাইস্টোসীন যুগে স্থান দেওয়ার প্রয়াস পান ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে।

১৯৪৯-এর এপ্রিলে উত্তরপ্রদেশের সিঙ্গরাউলি অববাহিকায় প্রাপ্ত হাতিয়ারসমূহের মধ্যে দ্বিমুখী আয়ুধের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণস্বামীর

মতে সিঙ্গরাউলিতে প্রস্তর শিল্পের সোয়ান-ধারা এবং মাদ্রাজ ধারার সংযোগ ঘটেছিল, তবে মাদ্রাজী আবেভিলীয়-আসেউলীয় উপাদানেরই প্রাবল্য বেশি। অনুরূপ দ্বিমুখী আয়ুধ রাজস্থানের চিতোরগড়ে ও ভানগড়ে এবং কর্ণাটকের মলপ্রভা উপত্যকায় পাওয়া গেছে। পঞ্চম দশকে আরও যে কয়টি গুরুত্ব-পূর্ণ প্রত্নাশ্মক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় সেগুলির মধ্যে মধ্যপ্রদেশের নিমার জেলার, নাসিকের নিকবর্তী গোদাবরীতটের এবং আহমদনগরের অন্তর্গত নেভাসার ক্ষেত্রগুলি উল্লেখযোগ্য। নেভাসায় হাতকুড়াল ও ছেদক শিল্পের, পাতনির্মিত ফলা ও বাটালি শিল্পের এবং ক্ষুদ্রাশ্মশিল্পের পর্যায়ক্রমিক বিকাশ তখনই লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পঞ্চম দশকেই শতদ্রু-শিরসা উপত্যকায়, পূর্ব-পাঞ্জাবের নালাগড়ে এবং বিপাশা ও বাণগঙ্গা উপত্যকায় সোয়ান সংস্কৃতির বিস্তৃতি আবিষ্কৃত হয়েছিল।

১৯৪২-এ বিজ্ঞান কংগ্রেসের নৃতত্ত্বশাখার সভাপতির ভাষণে এম. এইচ. কৃষ্ণ কর্ণাটকের ক্ষুদ্রাশ্ম শিল্প সম্পর্কে নানা তথ্য পরিবেশন করেন। ওই বছরেই ডি. এইচ. গর্ডন হায়দ্রাবাদের নিকটবর্তী মাস্কি থেকে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাশ্ম শিল্পের কালনির্ণয় করেন খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের মধ্যে। সুব্বারাও (১৯৪৮) বেলারি জেলার সঙ্গনকল্লু থেকে নবাশ্মীয় পালিশ করা কুঠারের সঙ্গে ক্ষুদ্রাশ্ম আবিষ্কার করেন। এখানে অবশ্য পূর্ববর্তী প্রস্তরযুগের পাতশিল্পের সঙ্গেও কিছু ক্ষুদ্রাশ্ম পাওয়া গেছে। গুজরাতের লাংঘনাজে একটি সমৃদ্ধ ক্ষুদ্রাশ্ম শিল্পের কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে। উপরের স্তরগুলিতে হস্তনির্মিত মৃৎপাত্রের সঙ্গে ক্ষুদ্রাশ্ম পাওয়া গেছে, কিন্তু নিচের স্তরগুলিতে ক্ষুদ্রাশ্মের সঙ্গে কোন মৃৎপাত্র নেই, যদিও সেখানে কিছু পশুর অস্থি বিদ্যমান। ব্রহ্মগিরিতে খননকার্যের কালে হুইলার ১০২টি ক্ষুদ্রাশ্মের সন্ধান পান যেগুলির মধ্যে ৮৯টি এমন একটি স্তর থেকে এসেছে যেখানে নবাশ্মীয়-তাম্রাশ্মীয় পালিশ করা কুঠারের সংস্কৃতির প্রভাব স্পষ্ট। ১৯৪৮-এ প্রকাশিত বিবরণে তিনি এগুলিকে খ্রীস্টপূর্ব প্রথম সহস্রক থেকে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। আয়প্পন ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে তিরুনেলভেলি জেলার 'তেরি' বা বালিয়াড়ি এলাকার ক্ষুদ্রাশ্ম শিল্পের বিবরণ প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে জিউনার ও অলচিন 'তেরি' অঞ্চলের ক্ষুদ্রাশ্মের উপর বিশেষ আলোকপাত করেন।

নবাশ্মীয় অনুসন্ধান: ইয়েল-কেম্ব্রিজ প্রত্ন-ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষক দলের ডে-টেরা কাশ্মীরে শ্রীনগরের নিকটবর্তী বুর্জাহোম নামক মহাশ্মীয় (মেগা-লিথিক) ক্ষেত্রে একটি পরীক্ষামূলক খননকার্য চালান। এখানে অবসৃত

হিমবাহ পরিত্যক্ত পলিতে কিছু পালিশ করা কুঠার, অস্থিনির্মিত ভোমর বা তুরপুন এবং মৃৎপাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। উপরের স্তরে পালিশ করা কৃষ্ণবর্ণ রঞ্জিত মৃৎপাত্রের পরিচয় পাওয়া যায় যেগুলির সঙ্গে সিন্ধু অঞ্চলের ঝঙ্গরে প্রাপ্ত অনুরূপ সামগ্রীর সাদৃশ্য আছে। প্যাটারসন কাশ্মীরের নুনার নামক স্থান থেকে একই ধরনের সামগ্রী পান। এম. এইচ. কৃষ্ণ কর্ণাটকের চন্দ্রাবল্লীতে লৌহযুগের নিদর্শনবাহী একটি স্তরের নিচে পালিশ করা আয়ুধের পরিচয় পান যার সঙ্গে ব্রহ্মগিরিতে হুইলার (১৯৭৮) কর্তৃক উৎখনিত নবাশ্মীয়-তাম্রাশ্মীয় কেন্দ্রের পর্বভেদের পর্যায়ক্রমিক মিল দেখা যায়। ব্রহ্মগিরিতে পালিশ করা কুঠার, কিছুটা রুক্ষ ক্ষুদ্রাশ্ম শিল্প, হস্তনির্মিত মৃৎপাত্র ও অত্যল্পসংখ্যক তাম্রসামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলির ঊর্ধ্ব কালসীমা খ্রীষ্টপূর্ব এক সহস্রকের পূর্বে নয় এবং নিম্ন কালসীমা খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের পরে নয়। বেলারির সঙ্গনকল্লুতে সুব্বারাও কৃত নবাশ্মীয় অনুসন্ধানের বিবরণ (১৯৭৮) থেকে জানা যায় যে সেখানে নবাশ্মীয় পালিশ করা কুঠার, কর্কশ বাদামী, কৃষ্ণ ও ধূসর বর্ণের মৃৎপাত্র ও কিছু ক্ষুদ্রাশ্ম একটি মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থিত। ওই প্রত্নক্ষেত্র উচ্চ এবং নিম্ন স্তরে ভিন্ন সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল কেন্দ্রের স্তর ও কালপর্বভেদ অন্যত্র আলোচিত হবে।

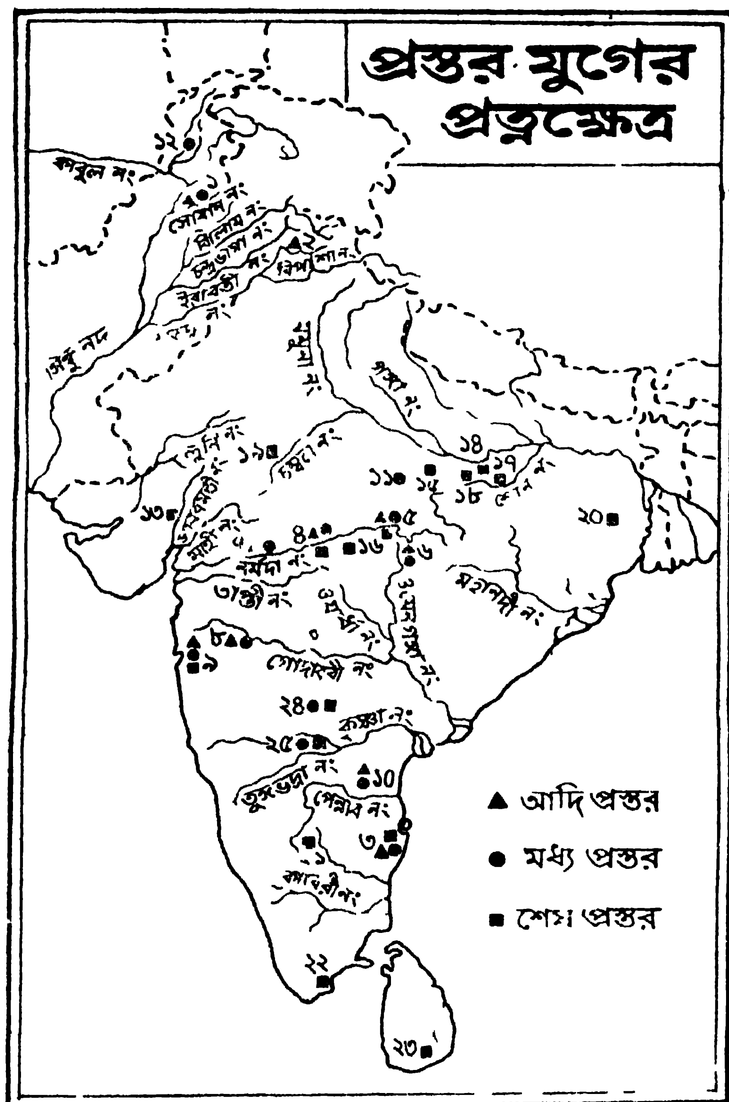
১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইউজিন সি. ওরমান (ছোট) ভারতের প্রাগৈতিহাসিক চর্চার ক্ষেত্রে নবাশ্মীয় অধ্যায়ের সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে এখানে 'নবাশ্মীয় ধরনের' হাতিয়ারসমূহকে ৩৫০০-২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পূর্বে স্থান দেওয়া যায় না। এছাড়া এখানে বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন যুগে প্রবর্তিত হয়েছিল যে কারণে ধরনগত ও কালগত সামঞ্জস্য বিধান করা কঠিন। তাঁর মতে ভারতীয় নবাশ্মীয় কুঠারশিল্পের উপর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রভাব আছে। পালিশ করা কুঠারের বন্টন আসাম, বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা, বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং মধ্য ও দক্ষিণভারতের কিছু এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আরও স্পষ্ট করে তিনি বলেছেন যে লক্ষ্ণৌ থেকে গোয়া, এই দুটি এলাকাকে বিন্দু হিসাবে গ্রহণ করে যদি একটি সরলরেখা টানা যায় তাহলে দেখা যায় যে নবাশ্মীয় অধ্যায়ের বিকাশ ওই রেখার ডান দিকে ঘটেছে এবং ওই রেখাটি দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকে আগত প্রবাহের প্রান্তসীমা। পরবর্তী আবিষ্কারসমূহের দ্বারা এবক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয়নি।

প্রস্তর যুগ ঃ নব দিগন্তের উন্মোচন

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট এরিক মর্টিমার হুইলার প্রত্নতত্ত্ববিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকেই ভারতীয় প্রাগৈতিহাসিক ও প্রায়-ঐতিহাসিক চর্চার ক্ষেত্রে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়। হুইলার প্রণালীবদ্ধ ও স্তর-বিন্যাসাবলম্বী খননকার্যের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেন, এবং এ-বিষয়ে যাতে আন্তর্জাতিক মান বজায় থাকে সেজন্য সচেষ্ট হন। খননকার্য বিষয়ক শিক্ষাদানের জন্য তিনি বিশেষ ক্যাম্প চালু করেন যার ফলে অনেক কাজ-জানা-লোক তৈরি হয়। তিনি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করেন। রাওয়ালপিণ্ডি জেলার অন্তর্গত তক্ষশিলা, মন্টোগোমারি জেলায় অন্তর্গত হরপ্পা, পন্ডিচেরীর নিকটবর্তী আরিকামেডু এবং কর্ণাটকের অন্তর্গত ব্রহ্মগিরিতে তাঁর নেতৃত্বে খননকার্য সম্পাদিত হয়, এবং এই সকল কাজের মাধ্যমেই তিনি বিভাগীয় ও বহিরাগত কর্মীদের আধুনিক খনন-পদ্ধতিতে শিক্ষিত করে তোলেন।

১৯৪৭-এ স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ভারত সরকার অনুসন্ধান ও খননকার্য বিষয়ে সক্রিয় মনোভাব গ্রহণ করেন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে পুরাতন প্রত্ন-আইনের পরিবর্তন ঘটানো হয়, এবং কেন্দ্রীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের দপ্তরের অধীন হয়। গোটা দেশকে নয়টি (পরে দশটি) প্রত্নতাত্ত্বিক সার্কেল বা এলাকায় ভাগ করা হয়। বিভিন্ন বিষয়ের জন্য বিভিন্ন শাখা নানা স্থানে স্থাপিত হয়। রাজ্য সরকারগুলিও নিজস্ব প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ খোলে। বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিও প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও খননকার্যে অগ্রসর হয়। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রত্নতাত্ত্বিক কাজকর্ম এত বিপুলভাবে বেড়ে যায় যে সামগ্রিকভাবে তার হিসাব নিকাশ দেওয়ার পরিবর্তে প্রত্নতাত্ত্বিক যুগ বা পর্যায়ের বিচারে বিভিন্ন এলাকা নিয়ে আলোচনা করাই সঙ্গত। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রস্তরযুগের বিকাশ সম্পর্কে যে সকল তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলি পরিবেশন করার চেষ্টা করব।

পাঞ্জাব ঃ পাঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডির নিকটবর্তী সোয়ান উপত্যকায় ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইয়েল-কেম্ব্রিজ দল কর্তৃক ভূতাত্ত্বিক তথা প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। প্রথম অন্তর্হিমবাহ যুগের শেষের দিকে মানব বসতির কিছু চিহ্ন পাওয়া গেছে পাঁচ জায়গায়, ঝিলম ও তার শাখানদীগুলির উপত্যকায় কল্লার, চৌমুখ ও মলকপুরে, জম্মুর নিকট



১। সোয়ান উপত্যকা। ২। বিপাশা উপত্যকা। ৩। অত্তিরামপক্কম, গুডিয়াম। ৪। আদমগড়। ৫। জবলপুর। ৬। ওয়েনগঙ্গা অঞ্চল। ৭। মহেশ্বর। ৮। নেভাসা ৯। কান্দীভালি অঞ্চল। ১০। গুন্ডিরা রমেশ্বরম। ১১। পান্ডব ফলস ১২। সাংঘাও ১৩। লাংঘনাজ। ১৪। বারকাচ্ছা। ১৫। সিধপুর। ১৬। মধ্যভারত পর্বতছত্রাঞ্চল। ১৭। লেখহিয়া। ১৮। মোরহানা পাহাড়। ১৯। মোদি পর্বতছত্র। ২০। বীরভানপুর ২১। জলহল্লি। ২২। টেরি এলাকা। ২৩। বান্দা রাওয়ালা। ২৪। কোন্ডাপুর। ২৫। কৃষ্ণা সংযোগ।

চেনাব নদীর শাখা তবই-এর তটভূমিতে এবং সোয়ান নদীতটে খুগের নামক স্থানের নিকটে। দ্বিতীয় অন্তর্হিমবাহ যুগে আদি-সোয়ান হাতিয়ার সমূহ পাওয়া গেছে কুশলগর, মকহদ এবং ইঞ্জারাতে এবং হারো নদীর উপত্যকার গরিয়াল নামক স্থানে। শ্রেণী ও ধরনের দিক থেকে পরবর্তী-সোয়ান শিল্পধারাকে যে দুভাগে ভাগ করা হয় সেকথা আগে বলা হয়েছে। আয়ুধসমূহের অধিকাংশই তৈরি হয়েছে হয় উপল থেকে না হয় পাথরের মূল অথবা পাত থেকে। সোয়ান নদীতটে চৌন্ত্রা নামক স্থানে একটি বিশেষ ধরনের নুড়ি-পাথর থেকে তৈরি হাতিয়ার পাওয়া গেছে যা তৃতীয় অন্তর্হিমবাহ যুগের। ১৯৪৭-এ পশ্চিম পাঞ্জাব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পূর্ব পাঞ্জাবে অনুসন্ধান চালানো হয়। ১৯৫১ তে ওলাফ প্রুফের শতদ্রুর উপনদী শিরসা উপত্যকায় হাল্কা রঙের শিলাস্ফটিক ও উপলনির্মিত সোয়ানধর্মী পাত শিল্পের নিদর্শন পান। ওই একই উপত্যকায় অনুসন্ধান চালিয়ে ১৯৫৪-তে ওয়াই ডি. শর্মা ধের-মাঝরা, ধাঙ্গ, দধি এবং মেরহানওয়ালা ও সেই সঙ্গে হোসিয়ারপুর জেলার দৌলতপুরের নিকটবর্তী একটি ছোট নদীর তটচত্বর থেকে শিলাস্ফটিক নির্মিত কোপানি, বাটালি ও পাত-নির্মিত নানা সোয়ানধর্মী আয়ুধ আবিষ্কার করেন। শিরসা উপত্যকায় ধরনী সেনও কিছু অনুসন্ধান করেন এবং সে বিষয়ে একটি রিপোর্ট তিনি প্রকাশ করেন ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে।

বিপাশা এবং বাণগঙ্গা উপত্যকায় বি. বি. লাল ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সোয়ানধর্মী আয়ুধ আবিষ্কার করেন। ১৯৫৭-তে এইচ. ডি. সাংকলিয়া এবং বি. সুব্বারাও এই অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন এবং আয়ুধসমূহকে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে কিছু ভেজাল থাকলেও সেগুলি আদি সোয়ান ধরনের। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে আর. ভি. যোশী ডেরা গোপীপুর, হরিপুর, জ্বালামুখী এবং নন্দাউমের মধ্যবর্তী কোট্টা, নখুরখাদ উপত্যকা, থোরখাদ উপত্যকায় বোনগতি এবং জামাল প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত প্রত্নাশ্মীয় আয়ুধের কথা প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে নন্দবুল, কোটলা, ধবল, ধানা এবং পেনসরা থেকে হাতকুড়াল ও ছেদক শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। এস. জেড. রোজিকি, জি. সি. মহাপাত্র এবং আর. কে. পন্ত ষষ্ঠ দশকে বিপাশা ও বাণগঙ্গা উপত্যকায় অনুসন্ধান করেন।

মধ্যপ্রস্তর যুগের পাতশিল্পের কিছু নিদর্শন, যেগুলির সঙ্গে পরবর্তী সোয়ান শিল্পধারার সাদৃশ্য আছে, পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবে বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া গেলেও, এই পর্যায়ের একটি উৎকৃষ্ট কেন্দ্র এ. এইচ. দানি কর্তৃক পেশোয়ারের নিকটবর্তী সাংঘাও গুহায় আবিষ্কৃত হয়। এখানকার খননকার্যের

যে বিবরণ দানি ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন তা থেকে জানা যায় যে এখানে সুনির্দিষ্ট স্তরীভূত-পর্যায়ে শিলাস্ফটিক নির্মিত মূল ও পাত শিল্পের অজস্র নিদর্শন পাওয়া গেছে অর্ধদগ্ধ অস্থি সমাবেশে। দানি সাংঘাও পাত-শিল্পকে লেভালোয়া-মুসতেরীয় ধরনের বলে অভিহিত করেন, এবং তাঁর মতে এই শিল্পধারা পশ্চিম-এশিয়া থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার প্রস্তরযুগের শিল্পধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

শেষ প্রস্তর যুগের সংস্কৃতির কোন নিদর্শন পাঞ্জাব অঞ্চল থেকে পাওয়া যায়নি। একথা বালুচিস্তানের ক্ষেত্রেও সত্য। দক্ষিণে যেমন মধ্যপ্রস্তর যুগ থেকে শেষ প্রস্তর যুগে উত্তরণের, পাত শিল্প থেকে ক্ষুদ্রাশ্ম শিল্পের অভিমুখে উপনীত হবার ক্ষেত্রে একটি ধারাবাহিক মন্থর বিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায়, পাঞ্জাব অঞ্চলে তেমন কিছু লক্ষ্য করা যায় না। তবে সিন্ধুপ্রদেশে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও সংলগ্ন উপজাতীয় এলাকায় শেষ প্রস্তর যুগের অস্তিত্বের আভাস মেলে, যদিও চিত্রটি পরিষ্কার নয়।

কাশ্মীর : ইয়েল-কেম্ব্রিজ দলের ডে-টেরা ও প্যাটারসন মূলে কাশ্মীর উপত্যকায় কোন প্রস্তর নির্মিত আয়ুধ খুঁজে পাননি। তবে ঝিলম ও তার শাখাসমূহের উপত্যকায় এবং জম্মুর নিকট চেনাব নদীর শাখা তবই-এর তটভূমিতে যে অন্তর্হিমবাহ যুগের মানব বসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে সে কথা পাঞ্জাব নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সাংকালিয়া ও তাঁর সহকর্মীরা লিডার-উপত্যকার পহেলগাম থেকে সুবিন্যস্ত স্তরের মধ্যে একটি বৃহদায়তন ফ্লেক বা পাত এবং একটি রুক্ষ আবেভিলীয় ধরনের ভারি হাতকুড়াল আবিষ্কার করেন। এগুলি যথাক্রমে দ্বিতীয় হিমবাহ ও তৃতীয় অন্তর্হিমবাহ যুগের। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে পহেলগাম অঞ্চলে পুনরায় অনুসন্ধানের ফলে নয়টি আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়, যেগুলিকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিমবাহ যুগে স্থান দেওয়া হয়। প্রথম দফায় আবিষ্কৃত পাত ও হাতকুড়াল একই স্থানে অথচ দুটি পৃথক স্তরে পাওয়া গেছে, যে দুটি স্তরের মধ্যে আট ফুট বোলডার-সমাবেশের ব্যবধান। সেই হিসাবে আয়ুধদ্বয় একই সংস্কৃতির না দুইটি ভিন্ন সংস্কৃতির সে বিষয়ে সংশয় আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ডে-টেরা এবং প্যাটারসন পাঞ্জাবে দ্বিতীয় অন্তর্হিমবাহ যুগের সামগ্রীসমূহের মধ্যেই দুটি সংস্কৃতির অস্তিত্ব প্রতিপাদন করতে চেয়েছিলেন, সোয়ান শিল্পধারা এবং দ্বিমুখী হাতিয়ার শিল্পধারা, কারণ তাঁরা কখনও কোথাও এই দুটি শিল্পধারার একত্র অস্তিত্ব দেখেন নি। দ্বিতীয় দফায় আবিষ্কৃত হাতিয়ারসমূহ মূলত কোপানি, হাতকুড়াল, বাটালি ও ভোমর জাতীয় আয়ুধ। এগুলির মধ্যে একটি ভোমর বা বোরার পাওয়া গেছে লিডারের বামতীরে গণেশপুর বাস-স্টপের

বিপরীতে যেটি ধরনের দিক থেকে উপদ্বীপীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত মধ্য প্রস্তর যুগের অনুরূপ আয়ুধের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। পূর্বকথিত নয়টি আয়ুধ ছাড়া আরও একটি ভোমর পহ্লগামের নিকটস্থ পশ্চিম-লিডারের দক্ষিণ তীরে পাওয়া গিয়েছিল ১৯৬৯-এ। এটিও গণেশপুরে প্রাপ্ত ভোমরের অনুরূপ।

রাজস্থান : চম্বলের উপনদী বানাস উপত্যকায় প্রথম প্রত্নাশ্ম আবিষ্কৃত হয় ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নাথদ্বার নামক স্থানে। অতঃপর ভি. এন. মিশ্র বানাস ও তার উপনদী বিধৌত অঞ্চলে ব্যাপক অনুসন্ধান করেন এবং তাঁর অনুসন্ধানের ফলাফল ব্যক্ত করেন ১৯৬১ ও ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৬১-৬২-তে সাংকালিয়া বেরাচের উপনদী গম্ভিরীর তটে চিতোরে কিছু অনুসন্ধান করেন। বানাসের উপনদী বেরাচের তিনটি উপনদী গম্ভিরী, কাদামালি ও ওয়াগানের উপত্যকায় অনুসন্ধানের ফলে বহু আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া আলোয়ার জেলাব ভানগড়ে, চম্বলের অপর উপনদী সানওয়ানের তীরে উপরে ও মধ্যে জমাট পলি দ্বারা বিচ্ছিন্ন দুইটি সুনির্দিষ্ট কংকরময় স্তরে উপলনির্মিত-আয়ুধ, হাতকুড়াল এবং লেভালোয়া-ফ্লেক আবিষ্কৃত হয়েছে। হামিরগড় এবং টংকের মধ্যবর্তী এলাকায় বানাসের কুলে অন্যূন দশটি প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নক্ষেত্র পাওয়া গেছে। রাজস্থান থেকে প্রাপ্ত আয়ুধসমূহকে মোটামুটিভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—মাদ্রাজ ধরনের হাতকুড়াল ও ছেদক এবং সোয়ান ধরনের পাত ও উপলনির্মিত কোপানি ও বাটালি। চিতোর জেলায় খননকার্য স্তরবিন্যস্তভাবে এই উভয় ধারার সহাবস্থান প্রতিপাদন করে। হাতকুড়ালের ক্ষেত্রে আবেভিলীয় এবং আসেউলীয় উভয় ধরনই লক্ষ্য করা যায়। ফ্লেক বা পাত শিল্পের ক্ষেত্রে ক্লাকটোনীয় ধরন লক্ষ্যণীয়, যদিও কিছু কিছু লেভালোয়া-ফ্লেকও বর্তমান।

মধ্যপ্রস্তর যুগের নানা নিদর্শনও উপরিউক্ত নদী উপত্যকাসমূহে আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে লুনি উপত্যকায় এই সব নিদর্শনের প্রাচুর্য সর্বাধিক যেগুলির বিবরণ ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। আয়ুধসমূহ সংগৃহীত হয়েছে কয়েকটি কেন্দ্র থেকে যেগুলি হল সমদরি, দুন্দরা-লুনি, শ্রীকৃষ্ণপুর, গোলিও, কুন্ডুগাঁও, ভাউই এবং পিচালে। আয়ুধসমূহের মধ্যে হাতকুড়াল, ছেদক, ভোমর, বিভিন্ন ধরনের বাটালি এবং পাতনির্মিত নানা ধরনের হাতিয়ার উল্লেখযোগ্য। এই সকল আয়ুধের একটা বড় অংশ অরণি-প্রস্তর, চার্ট এবং জ্যাসপার নির্মিত।

রাজস্থানে ফলা ও খোদক শিল্পের বিকাশ না ঘটলেও উদয়পুর, চিতোর, ভিলওয়ারা, আজমীড়, টংক, জয়পুর, কোটা এবং ঝালরপাটন জেলা থেকে প্রচুর ক্ষুদ্রাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতের সকল ক্ষুদ্রাশ্ম এলাকার মধ্যে

পূর্ব-রাজস্থানের বানাস নদীর উপনদী কোঠারির তীরবর্তী বাগোর সবচেয়ে সমৃদ্ধ। এখানে অন্যূন চল্লিশ রকমের ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ পাওয়া গেছে যেগুলিতে উচ্চমানের কারিগরির পরিচয় মেলে। এই ক্ষেত্রটির কালনিরূপণ করা হয়েছে ৪৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। বাগোর ছাড়া চিতোরগড়ের ২৮ কি.মি. দক্ষিণে গম্ভিরীর উপনদী কাদামালির তীরবর্তী নিমবহেরা এবং ভিলওয়ারার দক্ষিণে বানাস নদীর তীরে মান্দাপিয়ায় ক্ষুদ্রাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে নদীর পলিবাহিত চত্বরে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বালিয়াড়ির মধ্যে। এছাড়া লুনি ও তার উপনদীসমূহ বিধৌত এলাকায় তিলওয়ারা সোজাত এবং ধানেরিতেও প্রচুর ক্ষুদ্রাশ্ম পাওয়া গেছে। এগুলির বিবরণ প্রকাশ করেন ভি. এন. মিশ্র ১৯৬৭ ও ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে। বাগোরে পশুর অস্থি ও আদিম সমাধির নিদর্শন পাওয়া গেছে। বাগোরের বিবরণ মিশ্র প্রকাশ করেন ১৯৭৩-এ।

গুজরাত ঃ গুজরাতে সাংকালিয়া, সাবরমতী, ওরসাঙ্গ, মহী, কর্জন, ভাদর, ভাজোহি প্রভৃতি নদী-উপত্যকায় যে প্রাগৈতিহাসিক অনুসন্ধান করেন তার বিবরণ প্রকাশিত হয় ১৯৪৬-এ। তৎপূর্বে এবং তৎপরবর্তীকালেও তিনি তাঁর অনুসন্ধানের ফলাফল নিয়মিত প্রকাশ করেছেন। এই সকল ক্ষেত্রে হাতকুড়াল শিল্পের প্রাধান্য। কৃষ্ণস্বামীর বক্তব্য আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে যেহেতু মাদ্রাজ ধরনের হাতকুড়াল শিল্প এবং সোয়ান ধরনের উপলীয় শিল্প উভয় ধারারই অস্তিত্ব এখানে দেখা যায় সেই হেতু গুজরাতেই উভয় ধারার সংযোগ ঘটেছে। ১৯৪৯-এ জিউনার সাবরমতী, ওরসাঙ্গ, মহী প্রভৃতি নদীর স্তরবিন্যাসের উপর ভিত্তি করে আবহাওয়া ও তজ্জনিত ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন এবং তদনুযায়ী প্রস্তরশিল্পের বিকাশের উপর আলোকপাত করেন। সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে সাংকালিয়া ও তাঁর সহকর্মীরা অনুসন্ধান চালিয়ে হাতকুড়াল, ছেদক, কোপানি ও বাটালি শিল্পের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন বর্তমান শতকের ষষ্ঠ দশকে। এগুলির কিছু কিছু চার্ট পাথরের তৈরি। উল্লেখযোগ্য প্রত্নক্ষেত্রগুলি হল ভাদর নদীর তীরবর্তী রোজদি, হালভেদের নিকটবর্তী ডোকামার্দো-নালার তীরভূমি, জুনাগড় জেলার শেরদি নদীর তীরবর্তী অঞ্চল, প্রভাস-পাটনের নিকটবর্তী নদী অঞ্চল প্রভৃতি। কচ্ছে ভুজের নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রাপ্ত আয়ুধসমূহ প্রধানত মধ্য-প্রস্তর পর্যায়ের, তবে ওই অঞ্চলেরই আঙ্গিয়া নামক গ্রাম থেকে আদিপ্রস্তর যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

মধ্যপ্রস্তর যুগের নিদর্শন ভাদর নদীর তীরবর্তী রোজদি ও জেটপুরে পাওয়া গেছে বিক্ষিপ্ত ভাবে। তবে বুলশর জেলার বালধা, অম্বা এবং

তুকওয়াড়া, উনাই-এর নিকটবর্তী পদম এবং ধাঙ্গ অঞ্চলের কয়েকটি স্থানে মধ্যপ্রস্তর প্রত্নক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। দক্ষিণ কচ্ছের কয়েকটি মধ্যপ্রস্তর প্রত্নক্ষেত্রের খবর দিয়েছেন আনসারী এবং পাপ্পু ১৯৭০-৭২-এ। এতদঞ্চলে প্রধানত ফ্লেকনির্মিত সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। মধ্য গুজরাতের পাওয়াগড় পাহাড়ে বিশাদি নামক স্থানে বেশ পুরু ধরনের পাত ও মূল নির্মিত সামগ্রী পাওয়া গেছে। এছাড়া কিছুটা উচ্চ-প্রত্নাশ্মীয় ধরনের শিলাস্ফটিক নির্মিত খোদক এবং দুদিকে ধার বিশিষ্ট ফলা শিল্পের নিদর্শনও পাওয়া গেছে, ৫০০০০-১২০০০ বছর পূর্বের। পাওয়াগড়ে ক্ষুদ্রাশ্ম শিল্পেরও পরিচয় পাওয়া যায় যা গড়ে উঠেছিল বর্তমান কাল থেকে ৯০০০-৩০০০ বছর পূর্বে।

কিন্তু গুজরাতের ক্ষুদ্রাশ্ম শিল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র আমেদাবাদের ৬০ কি. মি. দূরে অবস্থিত লাংঘনাজ-এ। এখানে ১৯৪১ থেকে ১৯৫৪-র মধ্যে অনুসন্ধান ও খননকার্য চালান সাংকালিয়া, ১৯৫৪-য় সুব্বারাও এবং ১৯৬৩-তে কেনেডি। এখানে উপরের স্তরগুলিতে মৃৎপাত্র ও অপরাপর কিছু প্রস্তর সামগ্রীর সঙ্গে ক্ষুদ্রাশ্ম পাওয়া গেছে। নিচের স্তরগুলিতে ক্ষুদ্রাশ্মশিল্পের ব্যাপক অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় পশুর অস্থি ও নরকংকাল সমাকীর্ণ পরিবেশে। কংকালগুলি আদিম সমাধিপ্রথার ইঙ্গিত দেয় যে প্রসঙ্গ আমরা পরে আলোচনা করব। জিউনার ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে লাংঘনাজ থেকে প্রাপ্ত কিছু হাতিয়ারের পরিচয় দেন যেগুলির সাহায্যে ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ তৈরি করা হত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে লাংঘনাজ ধরনের কিছু ক্ষুদ্রাশ্ম রোজাদি ও রংপুরের হরপ্পীয় কেন্দ্রের সর্বনিম্ন স্তরে পাওয়া গেছে।

মধ্যপ্রদেশ ঃ মধ্যপ্রদেশে নর্মদা উপত্যকা ছাড়াও চম্বল, শিবনা, বেতোয়া, কালিসিন্ধ এবং শোন নদীর উপত্যকায় প্রচুর প্রত্নাশ্মীয় আয়ুধ পাওয়া গেছে, যেগুলির মধ্যে হাতকুড়াল শিল্পেরই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

নর্মদা উপত্যকায় ডে-টেরা ও প্যাটারসন কর্তৃক ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা এবং সেখান থেকে প্রাপ্ত আয়ুধসমূহের সঙ্গে সোয়ান শিল্পধারার সম্পর্কস্থাপনের প্রবণতার কথা পূর্বে বলা হয়েছে। অমরকণ্টক থেকে মহেশ্বর পর্যন্ত নর্মদার প্রবাহকে পাঁচটি এলাকায় ভাগ করা হয়—অমরকণ্টক থেকে পথরিসোন্ধা, পথরিসোন্ধা থেকে দিন্দোরি, জবলপুর-নরসিংহপুর থেকে হোসঙ্গাবাদ, হোসঙ্গাবাদ এবং মহেশ্বর। মহেশ্বরের কাছে নর্মদা উপকূলে ১৯৫৩-৫৯-এর মধ্যে সাংকালিয়া ও সুব্বারাও অনুসন্ধান করেন। পরে আরও একদফা অনুসন্ধান হয় সাংকালিয়া, যোশী এবং রাজগুরু কর্তৃক একত্রে। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে জি. জে. ওয়েনরাইট নিম্ন-নর্মদা অঞ্চলে প্লাইস্টোসীন আমলের

সঞ্চয়সমূহের প্রত্ন-ভূতাত্ত্বিক বিবরণ প্রকাশ করেন। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ধরনী সেন নরসিংহপুর ও হোসঙ্গাবাদের মধ্যবর্তী এলাকায়—যে এলাকাকে ধ্রুপদী এলাকা বলা হয় এবং যেখানে মধ্য-প্লাইস্টোসীন যুগের বহু জীবাশ্ম পাওয়া গেছে—অনুসন্ধান করেন এবং নানা আয়ুধও সংগ্রহ করেন। নর্মদা উপত্যকায় প্রত্ন-ভূতাত্ত্বিক স্তরসমূহের নির্ধারণ এবং সেগুলিতে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের জন্য আর্কিওলজিকাল সার্ভের উদ্যোগে একটি দলগঠন করা হয়—এইচ. ডি. সাংকালিয়া, আর. ভি. যোশী, এ. পি. খাত্রি, জেড. ডি. আনসারি, এস. এন. রাজগুরু, ভি. এন. মিশ্র এবং শ্রীমতী কর্ভিনিয়াস কার্ভেকে নিয়ে, এবং এই দল ১৯৬৩-৬৩ একটি প্রাথমিক সমীক্ষা করেন। কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টি. ডি. ম্যাককাউন এবং তাঁর সহকারী জর্জ স্কুর্কিন একই সময়ে এই অঞ্চলে সমীক্ষা করেন। ম্যাককাউন পীরনালা এবং অপর কয়েকটি স্থান থেকে কিছু আয়ুধ সংগ্রহ করেন। মহাদেও-পিপারিয়ায় এম. জি. সুপেকর ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে যে দ্বিতীয় উৎখনন করেন তাতে ৮৬০টি আয়ুধ পাওয়া যায়। খাত্রি ১৯৬৬-তে তৎকর্তৃক সংগৃহীত কিছু আয়ুধের বিবরণ প্রকাশ করেন। মহেশ্বর অঞ্চলের দুরকাড়ি নালায় জর্জ আর্মণ্ড ৭০০টির মত আয়ুধ সংগ্রহ করেন।

১৯৫৪-৫৫-য় ভি. এস. ওয়াকাংকর শিবনার তীরবর্তী মান্দসুর থেকে হাতকুড়াল আবিষ্কার করেন। তাঁর আবিষ্কারেরর সূত্র ধরে এ. পি. খাত্রি চম্বল, শিবনা, গম্ভিরী, বেরাচ, ক্ষিপ্রা, কালিসিন্ধ, কাদামালি ও রেতম নদী-উপত্যকায় সন্ধান করেন (১৯৫৫-৫৮)। এই এলাকার (অর্থাৎ মালব অঞ্চলে) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রত্নক্ষেত্র মান্দসুরের নিকটবর্তী রাম-ঘাট ও শামশন-ঘাট এবং শিবনার তীরে নাহারগড়। প্রাপ্ত সামগ্রীসমূহের মধ্যে আবেভিলীয় -আসেউলীয় ধরনের হাতকুড়ালের প্রাধান্য। বেতোয়া উপত্যকায় খাত্রি এবং পরে রামেশ্বর সিং ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৫-এর মধ্যে বিস্তৃত অনুসন্ধান করেন। এখানকার (অর্থাৎ উত্তর-বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলের) প্রধান প্রত্নক্ষেত্র ললিতপুর যেখানে কয়েকটি আয়ুধ-উৎপাদনকেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সোনার, কোপরা এবং বেয়ার্মা নদী অঞ্চলে অনুসন্ধান করেন আর. ভি. যোশী ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে। সোনারের তটে চারটি ক্ষেত্র উল্লেখযোগ্য যেগুলি হল ঘ্রেগ্রাস্তা, নরসিংগড়, হারাত এবং মারিয়াড়া। এতদঞ্চল থেকে ১১৪টি আয়ুধ প্রস্তর পযা৻হয়েছে, অধিকাংশই হয় উপলনির্মিত না হয় পাতনির্মিত যুগের নিদর্শননিসার আহমদ ১৯৬৬-র পূর্বে শোন অববাহিকায় বিলাসপুর,

মধ্যপ্রস্তর যুগে জবলপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ৩৪টি ক্ষেত্রে ১৬৭টি আয়ুধ পাওয়া গেছে যাঁ এগুলির অর্ধেক শিলাস্ফটিক নির্মিত, বেশ কিছু চার্ট

পাথরের, অবশিষ্ট বেলেপাথরের। আয়ুধসমূহের মধ্যে হাতকুড়াল, ছেদক, বাটালি, কোপানি সবই আছে।

নর্মদা উপত্যকার মধ্যপ্রস্তর যুগের উৎপাদন-কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে দোঙ্গেরগাঁও এবং চোলি নামক স্থানে। খাত্রি শিবনা উপত্যকার মান্দসুর এবং নাহারগড় থেকে প্রাপ্ত মধ্যপ্রস্তব যুগের আয়ুধেব বিবরণ প্রকাশ করেন ১৯৫৯-৬০-এ। অমরকণ্টক এবং মান্দলার মধ্যে বারোটি প্রত্নক্ষেত্রের বিবরণ প্রকাশ কবেন সুপেকর (১৯৬০-৬১) যেগুলির মধ্যে পাঁচটি উৎপাদন-কেন্দ্র। ইন্দোরের নিকটবর্তী রাউ নামক স্থান থেকে মধ্যপ্রস্তর যুগের কিছু উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া গেছে। নরসিংহপুর, হোসঙ্গাবাদ, মহেশ্বর এবং ধসনের তীরবর্তী শিহোরা থেকেও প্রচুর আয়ুধ পাওয়া গেছে। রামেশ্বর সিং মুঙ্গওয়াল রেলস্টেসনের নিকট বেতোয়ার তীরবর্তী গোণ্ডি থেকে ২৩০টি আয়ুধ আবিষ্কার করেন। শিহোরা এবং গোণ্ডিব আয়ুধসমূহ একই ধরনের এবং এগুলি হাতকুড়াল-ছেদক শিল্প থেকে ফ্লেকনির্মিত বাটালি-ভোমর শিল্পে ক্রমিক উত্তরণের পরিচয়বাহী। দামোহ জেলায় সোনার এবং বেয়ার্মা নদী উপত্যকায যোশী ১২টি প্রত্নক্ষেত্রে মধ্যপ্রস্তব যুগের আয়ুধ আবিষ্কার করেন (১৯৬১)। উচ্চ শোন অববাহিকায় নিসার আহমদ ৪৫টি প্রত্নক্ষেত্রে ৪৮৫টি আয়ুধের সন্ধান পান। বি. অলচিন চারটি মধ্যপ্রস্তর প্রত্নক্ষেত্রের উল্লেখ করেছেন যেগুলি হল পাণ্ডব প্রপাত, বাঘাইন নদীখাত, কানহারি এবং রেহুনটিয়া। উচ্চ শোন উপত্যকার অরণ্যসংকুল অঞ্চলে, সিধি এবং শাহডোল জেলায়, নিসার আহমদ কিছু ফলা শিল্পের নিদর্শন পান। বিক্ষিপ্তভাবে ফলা এবং খোদক শিল্পের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় নর্মদার উপনদী বানজেরের তীরবর্তী মান্দলার নিকটস্থ বামনি নামক স্থানে। রাইসেন জেলার ভীমবেতকার গুহা এবং পর্বতছত্রসমূহে খননকার্যের ফলেও ফলা ও খোদক শিল্পের বিশেষ স্তরবিন্যস্ত অবস্থিতি প্রতিপাদিত হয়েছে।

নর্মদা এবং চম্বলের উপনদীসমূহের উপত্যকায় কিছু ক্ষুদ্রাশ্ম শিল্পের ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের ক্ষুদ্রাশ্মের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সেগুলি সাদাটে রঙের অর্ধস্বচ্ছ কালসেদনি অথবা কার্নেলিয়ান দ্বারা নির্মিত, এবং সেগুলি কোন স্তরবিন্যস্ত পর্যায়ে আবিষ্কৃত হয়নি বা সেগুলির সঙ্গে কোন মৃৎশিল্পের সংযোগ নেই। সাতনা জেলার মাইহারে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ক্ষুদ্রাশ্মের অবস্থিতি চোখে পড়ে। মধ্যপ্রদেশের নানা পর্বতগুহা ও পর্বত-ছত্র থেকে ক্ষুদ্রাশ্ম পাওয়া গেছে, যেগুলির মধ্যে পাচমারহি, কোবরা পাহাড়, ভুপালের নিকটবর্তী ধর্মপুরী, বাররখেরা বা ভীমবেতকা এবং আদমগড় উল্লেখযোগ্য। ভীমবেতকায় ছশোর মত পর্বতছত্র বর্তমান। এগুলির

কয়েকটিতে যে পরীক্ষামূলক খননকার্য চালানো হয়েছে তাতে প্রস্তরযুগের ধারাবাহিকতা আয়ুধের পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্য করা যায়, যেমন প্রথম পর্বে প্রত্নাশ্ম, দ্বিতীয় পর্বে পাতশিল্প, তৃতীয় পর্বে বিভিন্ন আকারের ক্ষুদ্রাশ্ম। আদমগড় পাহাড় হোসঙ্গাবাদের ৪ কি. মি. দূরে অবস্থিত। এখানে গুহার অভ্যন্তরে উৎখননের ফলে (১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আর. ভি. যোশী কর্তৃক) সর্বনিম্ন স্তরে আদি প্রস্তরযুগের হাতকুড়াল, ছেদক ও কোপানি শিল্পের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। তার উপরের স্তরে মধ্য প্রস্তরযুগের ফ্লেক নির্মিত সামগ্রী, বিশেষ করে বাটালি ধরনের হাতিয়ার, এবং তার উপরের স্তরে ক্ষুদ্রাশ্ম। স্তরগুলির মধ্যবর্তী অঞ্চলে পাথরকুচি ও বাদামি রঙের ধূলির জমাট আস্তরণ, উপরেও তাই। প্রস্তরযুগের ধারাবাহিকতার নিরিখে আদমগড়ের মূল্য অপরিসীম। এখানকার গুহাচিত্রসমূহের কথা অন্যত্র বলা হবে।

উত্তরপ্রদেশ ঃ ১৯৪৯-এ জিউনার এবং কৃষ্ণস্বামী মীর্জাপুর জেলার সিঙ্গরাউলি অববাহিকায় কয়েকটি ক্ষুদ্র নদীর তটভূমিতে, খাতে অথবা গর্ভে, কোয়ার্টজাইট নির্মিত নানা আয়ুধ সংগ্রহ করেন, যেগুলির মধ্যে উপল অথবা পাত গঠিত হাতকুড়াল, ছেদক, কোপানি, মূল থেকে নির্মিত আয়ুধ, এবং লেভালোয়া-পাতের নিদর্শন দেখা যায়। বেলান উপত্যকা থেকেও বহু আয়ুধ পাওয়া গেছে। এছাড়া আদি প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে এলাহাবাদ জেলার কানহাইয়া পাহাড়ের নিকটবর্তী অঞ্চলে, রেওয়া জেলারলেখাহিয়া পাহাড়ে, এবং কোশামের ৩০ কি. মি. পূর্বে বান্দা জেলায় যমুনাতীরে বারিয়ারি নামক স্থানে। শেষোক্ত ক্ষেত্রটি পাঁচ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে অবস্থিত যেখানকার প্রথম চত্বরে অপরাপর প্রত্নাশ্মীয় আয়ুধের সঙ্গে মাদ্রাজ ধরনের দ্বিমুখী আয়ুধও বর্তমান। অপরাপর প্রত্নক্ষেত্রসমূহের মধ্যে দেরাদুন জেলার কালগির নিকটবর্তী অঞ্চল, বান্দা জেলার নারিণী শহরের নিকট রামচন্দ্র পাহাড় এবং হমীরপুর ও ঝাঁসি জেলার কয়েকটি ক্ষেত্র উল্লেখযোগ্য।

তিন প্রস্তরযুগের স্তরবিন্যস্ত সমাবেশ বান্দা জেলার টৌনস উপত্যকায় এবং এলাহাবাদ জেলার বেলান উপত্যকায় পাওয়া গেছে। বেলান উপত্যকায় লাল কাঁকরমাটির উপর অবস্থিত দ্বিতীয় জমাট চত্বরে মধ্যপ্রস্তর আয়ুধ পাওয়া গেছে। আরও উপরের স্তরে হলদে রঙের জমাট পলির ভিতর ও উপর থেকে ফলা এবং ক্ষুদ্রাশ্মশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। ক্ষুদ্রাশ্ম শিল্পের প্রধান কেন্দ্র লেখাহিয়া, সরাই-নহর-রাই, মোরহানা পাহাড়, বেলান উপত্যকা এবং সিঙ্গরাউলি অববাহিকা। সরাই-নহর-রাই প্রতাপগড়ের নিকটবর্তী হর্স-শু

লেকের তীরে অবস্থিত যেখানে উৎখননের দ্বারা প্রাগৈতিহাসিক সমাধি এবং আগুন জ্বালাবার স্থান ও তৎসহ দগ্ধ ও অর্ধদগ্ধ বহু পশুর অস্থি আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে যে ক্ষুদ্রাশ্ম পাওয়া গেছে তা প্রাক্-মৃৎশিল্প যুগের। রেডিও-কার্বন পদ্ধতিতে এই ক্ষেত্রটির তারিখ নির্ণীত হয়েছে ৮৩৯৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যার থেকে ১১০ বছর কম বা বেশি হতে পারে। মীর্জাপুরের ৬৯ কি.মি. পূর্বে লেখাহিয়ায় খননকার্যের দ্বারা চারটি পর্বভেদ করা হয়েছে। প্রথম দুটি পর্বে ক্ষুদ্রাশ্মের সঙ্গে মৃৎশিল্পের কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি, কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বে ক্ষুদ্রাশ্মের সঙ্গে মৃৎশিল্প বর্তমান। লেখাহিয়ার কাল ২৪০০-১৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। লেখাহিয়া থেকে ১৭টি সমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে।

বিহার : সিংভূম জেলায় এ. কে. ঘোষ এবং ধরনী সেন সুবর্ণরেখা, সনজাই এবং খরকাই উপত্যকায় অনেকগুলি আদি প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র এবং বহু ধরনের আয়ুধ আবিষ্কার করেন। চোরমারা নামক স্থানে হাত-কুড়াল শিল্পের একটি উৎপাদন কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়। চাইবাসা এলাকায়, চক্রধরপুরের নিকটে, রোরো নদীর পশ্চিমকূলে তিলিমদহ নামক স্থানের কাছাকাছি তিনটি পলিমাটির চত্বরে ৩৫টির মত প্রত্নাশ্মীয় আয়ুধ আবিষ্কৃত হয় যেগুলির মধ্যে আবেভিলীয়-আসেউলীয় ধরনের হাতকুড়াল ও ছেদক, এবং দ্বিমুখী কোপানি জাতীয় হাতিয়ার উল্লেখযোগ্য। একই ধরনের প্রায় সমসংখ্যক আয়ুধ মানভূমের দক্ষিণে নিমিধ নামক স্থান থেকে পাওয়া যায়। সিংভূম ছাড়াও হাজারিবাগের রাজারাপ্পা ও বান্দায়, ভাগলপুর জেলার মালিপাহাড় এলাকায়, এবং গয়া জেলার জেঠিয়ান উপত্যকায় আদিপ্রস্তর প্রত্নকেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে। দেওঘরের দক্ষিণে কর্ণফলা নামক ছোট নদীর গর্ভে থেকে কিছু হাতকুড়াল ও বাটালি জাতীয় হাতিয়ার পাওয়া গেছে। মুঙ্গের জেলার ভীমবন্ধে একটি স্থানীয় নদীর খাত থেকে আকর্ষণীয় বক্রাকার হাতকুড়াল ও চক্রাকার শিলাস্ফটিক নির্মিত আয়ুধ পাওয়া গেছে। এ সমস্তই আবিষ্কৃত হয়েছে বর্তমান শতকের ষষ্ঠ দশকে।

মধ্যপ্রস্তর যুগের বাটালি-জাতীয় আয়ুধ পাওয়া গেছে পাটনা, গয়া, ভাগলপুর, মুঙ্গের, সিংভূম এবং পালামৌ জেলা থেকে যেগুলিকে এ. কে. ঘোষ (১৯৭০) পরিষ্কার ফ্লেক শিল্প বলে অভিহিত করেন। সিংভূমে পাতানির্মিত ফলা শিল্পের বিকাশও দেখা যায় যেগুলি মধ্যপ্রস্তর যুগেরই অভিব্যক্তি, উচ্চ-প্রত্নাশ্মীয় ফলা ও খোদক শিল্পের পরিচায়ক নয়। পালামৌ জেলার মারওয়ানিয়া এবং প্রতাপপুর ক্ষুদ্রাশ্ম শিল্পের বড় ক্ষেত্র। এছাড়া রাঁচি, ভাগলপুর ও সাঁওতাল পরগণার নানা এলাকা থেকে প্রচুর ক্ষুদ্রাশ্মের নিদর্শন পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশ : ভি. ডি. কৃষ্ণস্বামী (১৯৫৮) বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলায় কংসাবতী অববাহিকায় অনুসন্ধান করে তিন প্রস্তরযুগের নিদর্শন আবিষ্কার করেন। ধরনী সেন বাঁকুড়া জেলায় ধলকিশোর, কংসাবতী ও কুমারী উপত্যকায় ল্যাটেরাইট সংস্থানের মধ্যে আদি প্রস্তর যুগের নানা আয়ুধ আবিষ্কার করেন এবং ধরনের দিক থেকে সেগুলিকে সিংভুম ও ময়ূরভঞ্জ থেকে প্রাপ্ত আয়ুধের সঙ্গে অভিন্ন বলে ঘোষণা করেন। (১৯৬১-৬২)। তাঁর তত্ত্বাবধানে এ. কে. ঘোষ মেদিনীপুরের অন্টজুরি, ভেদাকুই, বামনডিহি এবং নয়াগড় থেকে কিছু হাতকুড়াল, কোপানি, ছেদক, বাটালি ও তুরপুন আবিষ্কার করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ষষ্ঠ দশকের গোড়ায় দিকে বাঁকুড়া, বীরভুম ও বর্ধমান জেলায় কয়েকটি প্রত্নস্থল নির্বাচন করেন, যার ফলে হনুমতী, অমরুহাস, নবগাসাই প্রভৃতি নদী অঞ্চল থেকে কিছু আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়। আদি প্রস্তর যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রত্নস্থল অজয়ের তীরবর্তী শুশুনিয়া পর্বতাঞ্চল যেখান থেকে দু'হাজারের মত আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে (১৯৭২)। মধ্যপ্রস্তর যুগের কিছু বাটালি এবং ভোমর বাঁকুড়া, বীরভুম, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া থেকে (বিক্ষিপ্তভাবে দু'একটি চব্বিশ পরগণায়) পাওয়া গেছে। এই সকল অঞ্চলে ক্ষুদ্রাশ্মের নিদর্শনও বর্তমান, তবে সবচেয়ে বিখ্যাত ক্ষুদ্রাশ্ম ক্ষেত্র হচ্ছে বর্ধমান জেলায় দুর্গাপুর রেলস্টেশনের নিকট দামোদরের তীরবর্তী বীরভানপুর যা বি. বি. লাল কর্তৃক আবিষ্কৃত ও উৎখনিত হয় (১৯৫৪-৫৭)। নিকটস্থ দেজুরি, মালানদীঘি ও গোপালপুরেও ক্ষুদ্রাশ্ম পাওয়া গেছে।

আসাম ও সান্নিহিত রাজ্যসমূহ : ১৯৬৯-৭০-এ টি. সি. শর্মা মেঘালয়ের গারো পাহাড় থেকে কিছু প্রত্নাশ্ম সংগ্রহ করেন। গারো পাহাড় অঞ্চলে তিনটি ক্ষেত্র থেকে মোট ১৬টি আয়ুধ পাওয়া যায় ১৯৬৬ পর্যন্ত, যেগুলি হাতকুড়াল ধরনের। এগুলির মধ্যে তিনটি পাওয়া যায় রোংঘি-গিরিতে, একটি মোলমেগিরিতে এবং বারোটি রোনগ্রাম থেকে। এতদঞ্চল থেকে ওই সময়ের মধ্যে কোপানি এবং বাটালি জাতীয় আয়ুধ পাওয়া যায় ১১টি। ১৯৭০-৭১-এ রোনগ্রাম থেকে কিছু উপলনির্মিত আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে।

উড়িষ্যা : ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মলকুমার বসু ও ধরনী সেন কর্তৃক উড়িষ্যার বুড়হাবালঙ ও তার উপনদী অঞ্চলে অনুসন্ধানের কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এই এলাকার দুটি উল্লেখযোগ্য প্রত্নক্ষেত্র কামারপাল ও ফুলিয়ানা। জি. সি. মহাপাত্র ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৯-এর মধ্যে ব্রাহ্মণী, বৈতরণী, মহানদী, বুড়হাবালঙ এবং সুবর্ণরেখা নদী অঞ্চল থেকে অন্যান

২০টি আদিপ্রস্তর যুগের প্রত্নক্ষেত্র আবিষ্কার করেন। ১৯৭০-এ কে. সি. ত্রিপাঠি উড়িষ্যার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে অনুসন্ধান করেন, বিশেষ করে টেল ও তার প্রধান উপনদীসমূহ বিধৌত অঞ্চলে। এই এলাকায় উপল এবং পাত শিল্পের বিশেষ বিকাশ দেখা যায়। স্তরীভূত অবক্ষেপ বা জমে থাকা তলানির পরিচয় পাওয়া যায় ময়ূরভঞ্জ জেলার বাঙ্গতলা এবং খাম্দালিয়াতে (খড়কী নদী তীরে), কেওনঝর জেলাব রামলা এবং জগন্নাথ-পুরে (বৈতরণীর তীরে), কোয়েল নদীর তীরে ঝিরাপানিতে এবং সুন্দরগড় জেলার কুরহাদিতে, ওই নামেরই নদীর উপর। ঢেনকানল জেলার হরিচন্দনপুরে একটি মধ্যপ্রস্তর যুগের উৎপাদনকেন্দ্র পাওয়া গেছে। এতদঞ্চলে ফ্লেক শিল্পের পরিচয় বর্তমান। উড়িষ্যায় ক্ষুদ্রাশ্ম শিল্পক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে প্রধানত সুন্দরগড়, ঢেনকানল, পুরী, ময়ূরভঞ্জ ও কেওনঝর জেলা থেকে।

মহারাষ্ট্র : মহারাষ্ট্রের নাসিক, আহমদনগর, ধুলিয়া. জলগাঁও, চন্দা, ওয়ার্ধা প্রভৃতি জেলার নানা প্রত্নস্থল থেকে যে সকল আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলির মধ্যে উপলনির্মিত হাতিয়ার এবং উন্নত ধরনের তীক্ষ্নাগ্র হাতকুড়াল ও ছেদক (শেষ আসেউলীয় ধরনের) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাসিক, নেভাসা, ভাদনে এবং অন্যত্র আদি প্রস্তরযুগের উৎপাদনকেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যের মত মহারাষ্ট্রেও নদী উপত্যকাগুলি গুরুত্বপূর্ণ। মুলা, ভীমা, তাপ্তী, ওয়ার্ধা প্রভৃতি নদী-উপত্যকা থেকে বহু প্রত্নাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে। সাংকালিয়া কর্তৃক প্রবরা উপত্যকায় নেভাসার প্রত্নক্ষেত্র আবিষ্কারের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। নেভাসা থেকে মাত্র ৩ কি.মি. দূরে প্রবরার দক্ষিণ তীরে চিরকি নামক একটি ক্ষুদ্র নদীসঙ্গমের কাছে (যে-জন্য স্থানটিকে বলা হয় চিরকি-নেভাসা) অনুমান ২০৫০টি প্রত্নসামগ্রী পাওয়া গেছে। এগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়—যে সকল আয়ুধ উপল বা উপলাংশ নির্মিত এবং যেসকল আয়ুধ ফ্লেকনির্মিত। অধিকতর ভারি আয়ুধ, যেমন হাতকুড়াল, বেশির ভাগই উপলনির্মিত, পক্ষান্তরে লঘুতর আয়ুধ, যেমন বাটালি, ছেদক, ছুরি, কিছু হাতকুড়াল, ভোমর প্রভৃতি, ফ্লেক-নির্মিত। স্ফটিক অথবা আগ্নেয়শিলা নির্মিত বলের মত গোলাকার একধরনের আয়ুধ পাওয়া গেছে যেগুলি নোড়া বা হাতুড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হত। এই জাতীয় বল একমাত্র মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার বীনা নামক স্থান ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায়নি। কোংকন অঞ্চলে টড ওলি, কান্দিভিলি, বোরিভিলি, গোরেগাঁও প্রভৃতি স্থানে আদিপ্রস্তর যুগের নিদর্শন পূর্বেই আবিষ্কার করেছিলেন এবং কান্দিভিলিতে প্রস্তরযুগের পারম্পর্য

প্রতিপন্ন করেছিলেন। পরবর্তীকালে সাংকালিয়া ও বি. বি. লাল এবং আরও পরে ডি. বি. চিটলে ও এস. এ. সালি কোংকন অঞ্চল থেকে অজস্র আয়ুধ আবিষ্কার করেন, বিশেষ করে গোয়াস, বুলশরের চারদিকে।

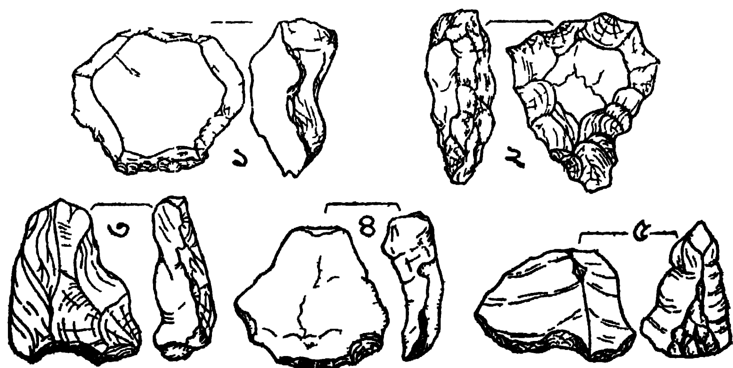
আহমদনগর জেলায় প্রবরার তীরে নেভাসা, গোদাবরী উপত্যকায় বেল-পান্ধারি, সুরেগাঁও, কালেগাঁও, নন্দুর এবং মধমেশ্বর, পুনা জেলায় কোরেগাঁও, ভেল নদী উপত্যকায় শিকারপুর, চান্দোলি প্রভৃতি স্থানে মধ্যপ্রস্তর যুগের প্রত্নক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া ধুলিয়া, জলগাঁও ও বিদর্ভ জেলায় বুলশর এলাকায়, বোম্বাই-এর নিকটবর্তী বোরিভিলি ও কান্দিভিলিতেও প্রধানত পাতনির্মিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চার্ট, জ্যাসপার ও হাল্কা কষ্টিপাথরের আয়ুধ পাওয়া গেছে। খান্দেশ অঞ্চলে তাপ্তী নদীর শাখা রাংকা-নালায় স্তরবিন্যস্ত ক্ষেত্রে মধ্যপ্রস্তর যুগের আয়ুধের সন্ধান মিলেছে। নেভাসায় মধ্যপ্রস্তর যুগের আয়ুধের সঙ্গে দীর্ঘ ফলা ও কালসেদনি নির্মিত খোদক আবিষ্কৃত হয়েছে। ধুলিয়া জেলার ভাদনের দ্বিতীয় কংকরময় স্তর থেকে জ্যাসপার ও কালসেদনি নির্মিত মুল, সমান্তবাল ধারযুক্ত ফলা, খোদক, বাটালি ও ফ্লেক আবিষ্কৃত হয়েছে। জলগাঁও জেলার চালিশগাঁও তালুকে পাটনে নামক গ্রামে স্তরবিন্যস্ত প্রত্নক্ষেত্রে খোদক ও ফলা শিল্পের অস্তিত্ব দেখা গেছে। এই সমস্ত আবিষ্কার মোটামুটিভাবে ১৯৬০ থেকে ১৯৭০-এর মধ্যে ঘটেছে।

পৈঠান, নাসিক ও আহমদনগর জেলায় গোদাবরী ও প্রবরার তটদেশের অবক্ষেপে কোয়ার্ৎস, কালসেদনি এবং আগেট নির্মিত ক্ষুদ্রাশ্ম পাওয়া গেছে। এগুলি পরবর্তীকালের তাম্রাশ্মীয় প্রত্নক্ষেত্রসমূহে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাশ্মের থেকে পৃথক। পুনার নিকট দিঘি, ইলোরা, এবং কার্লে গুহাসমূহে প্রচুর ক্ষুদ্রাশ্মের সন্ধান পাওয়া গেছে। কোংকন অঞ্চলেও ক্ষুদ্রাশ্ম শিল্পের বিকাশ দেখা যায়। কান্দিভিলি এবং সমুদ্রের তীর বরাবর অঞ্চলে, থানা জেলায় খাঁড়িতে এবং বোম্বাই-এর উত্তরে ও দক্ষিণে যথাক্রমে উলহাস ও অম্বা নদীকুলে ক্ষুদ্রাশ্মের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

অন্ধ্র ঃ অন্ধ্রের আদিপ্রস্তর যুগের প্রত্নক্ষেত্রসমূহের মধ্যে কুর্নুল, গিদ্দালুর, কারেমপুদি এবং নাগার্জুনিকোণ্ডা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কুর্নুলে সৌন্দররাজন বর্তমান শতকের পঞ্চম দশকে ভবনাশী এবং অপরাপর নদী-অঞ্চলে অনুসন্ধান করে কিছু আয়ুধ প্রাপ্ত হন যেগুলির মধ্যে আসেউলীয় ধরনের হাতকুড়াল বর্তমান। গিদ্দালুর থেকে প্রাপ্ত আয়ুধসমূহকে চোদ্দটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। এখানকার প্রাপ্ত উপলীয় আয়ুধসমূহকে সোয়ানধর্মী বলা যায় না, বরং বলা যায় যে এগুলি হাতকুড়াল শিল্পের

অন্তকাঠামো অথবা অনিবার্য ব্যাপ্তি। নাগাজুর্নিকোণ্ডার ছয়টি এলাকা থেকে এবং কাবেমপুদির পাঁচটি এলাকা থেকে উপলীয় আয়ুধ, হাতকুড়াল, লেভালোয়া মূল ও পাত, ফলা, ক্ষুদ্রাশ্ম ও পালিশ করা কুঠার পাওয়া গেছে যা প্রস্তর যুগ থেকে নবাশ্মীয় অধ্যায়ে উত্তরণের পরিচয়বাহী। এস. এন. রাও ছয়ের দশকের গোড়ার দিকে নলগোণ্ডা জেলায় কৃষ্ণার তটভূমিতে অনুসন্ধান করে বৃক্ষ আবেভিলীয় ধরনের এবং হাল্কা আসেউলীয় ধরনের হাতকুড়াল আবিষ্কার করেন।

কুর্নুল কাসিমেড ও বাকি'ট যে প্রথম আদি প্রস্তর যুগ ও মধ্যপ্রস্তর যুগের ভেদ প্রদর্শন করেন সেকথা পূর্বে বলা হয়েছে। এখানকার বাটালি ও ভোমর শিল্প বৈচিত্র্যের দিক থেকে নেভাসাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু আকারে বেশ বড়। রাও নলগোণ্ডা জেলা থেকে বিভিন্ন ধরনের বাটালি,



মধ্যপ্রস্তর যুগের আয়ুধ : উপদ্বীপীয় ভারত।
১. মূল, ২. হাতকুড়াল, ৩-৫. বাটালি

ভোমর এবং ফলাশিল্পের উদাহরণ দিয়েছেন। ইয়েলেশ্বরমের ৮ কি. মি. উত্তরে রামতীর্থমপায়া নামক স্থানে মধ্যপ্রস্তর যুগের সর্বাধিক সমাবেশ দেখা যায়। রাইগিরভাগুতে স্তরবিন্যস্ত পরিবেশে এই শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। করিমনগর জেলায় কয়েকটি মধ্যপ্রস্তর যুগের প্রত্নক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। চিত্তুর জেলা থেকে ফলা ও খোদক শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গেছে, বিশেষ করে রেনিগুণ্টা থেকে। এই শিল্পের আরও নিদর্শন পাওয়া যায় মাল্লাগুণ্ডলুর ভূপৃষ্ঠে ও উৎখনিত স্তরে, প্রকাশম জেলার ইয়েরাগোণ্ড-পালেমে, কুড্ডাপা জেলার বেমুলে ও কৃষ্ণা উপত্যকায়।

পঞ্চম দশকেই গুন্টুর জেলার নাগাজুর্নিকোণ্ডায়, কুর্নুল জেলার গিদ্দালুরে এবং বেলারি জেলার সঙ্গনকল্লুতে ক্ষুদ্রাশ্মশিল্পের পরিচয় পাওয়া

যায়। নাগার্জুনিকোণ্ডার ক্ষুদ্রাশ্ম কোন নির্দিষ্ট আকারের নয় এবং তার সঙ্গে কোন মৃৎশিল্পের সম্পর্ক নেই। গিদ্দালুরে ক্ষুদ্রাশ্মসমূহ ভূপৃষ্ঠের উপর থেকেই পাওয়া গেছে। সঙ্গনকল্লুতে ক্ষুদ্রাশ্মের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ দেখা যায়। এখানকার প্রথম পর্বে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাশ্মসমূহ প্রধানত কোয়াৎর্স থেকে তৈরি। এই পর্যায়ে সামান্য কিছু মৃৎশিল্পের ভগ্নাংশ পাওয়া যায় বটে কিন্তু তা পরবর্তী সংমিশ্রণ। সেখানকার মূল ক্ষুদ্রাশ্মশিল্পের সঙ্গে তার কোন অনিবার্য সম্পর্ক নেই। সঙ্গনকল্লুর পরবর্তী পর্বসমূহে নবাশ্মীয় ও তাম্রাশ্মীয় উপাদানের সঙ্গে ক্ষুদ্রাশ্মের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি প্রথম পর্বের ক্ষুদ্রাশ্মের তুলনায় গুণগতভাবে পৃথক।

কর্ণাটক ঃ ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে আর. ভি. যোশী কৃষ্ণা এবং তার দুই উপনদী মলপ্রভা ও ঘটপ্রভা অঞ্চলে অনুসন্ধান চালিয়ে ২১টি প্রত্নক্ষেত্রের পরিচয় দেন এবং এম. শেষাদ্রি কিস্বনহল্লি থেকে একটি আদি প্রস্তর শিল্পধারার বিবরণ প্রকাশ করেন। এই সকল নদী অঞ্চল থেকে এম. এন. দেশপাণ্ডে এবং আর. এস. পাপ্পু কয়েকটি প্রত্নক্ষেত্র আবিষ্কার করেন। ঘটপ্রভার উপর অনগওয়াদি ও বাগলকোট উল্লেখযোগ্য প্রত্নক্ষেত্র, তবে বিক্ষিপ্ত ভাবে কৃষ্ণা নদী অঞ্চলে হেরকাল, কোলহার, অলমত্তি এবং বাদামির নিকটবর্তী অঞ্চলে শিবনন্দী, নন্দিকেশ্বর, পট্টদাকল, শিবযোগমন্দির প্রভৃতি স্থান থেকে আদি প্রস্তর যুগের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। অনগওয়াদি থেকে প্রাপ্ত অধিকাংশ আয়ুধই হাতকুড়াল, এ ছাড়া কোপানি, ছেদক ও চক্রাকার হাতিয়ারও বর্তমান। ছেদক ছাড়া বাকি হাতিয়ারগুলি উপলনির্মিত, এবং কারিগরির দিক থেকে আসেউলীয় ধরনের। স্তরবিন্যস্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রত্নক্ষেত্র হচ্ছে হিরে-মুলাঙ্গি, আলুর (তলকওয়াড়), তমিনহাল এবং হুন্সাগর। বেলারি জেলার নিত্তুরে ৩১টি উপলীয় আয়ুধ পাওয়া গেছে যেগুলির ক্ষেত্রে একমুখী-দ্বিমুখী ভেদ সম্ভব। গুলবর্গা জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে গুলবল নামক স্থানে সম্প্রতি একটি প্রত্নক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে যেখানে আসেউলীয় ধরনের শতাধিক আয়ুধ পাওয়া গেছে।

বাগলকোট থেকে মধ্যপ্রস্তর যুগের নানা আয়ুধ পাওয়া গেলেও সেগুলি কোন স্তরবিন্যস্ত ক্ষেত্রে পাওয়া যায়নি। কিন্তু তমিনহাল এবং অলমত্তিতে তা স্তরবিন্যস্ত ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে। মধ্য প্রস্তর যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র পাওয়া গেছে বিজাপুর জেলার সালওয়াগাদি নামক স্থানে। আর. এস. পাপ্পু (১৯৬৬) কোভল্লি এবং অনগওয়াদি থেকে প্রাপ্ত মধ্যপ্রস্তর যুগের আয়ুধের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। শোরাপুর দোয়াবের কয়েকটি ক্ষেত্রে এবং বেলারি জেলার সঙ্গনকল্লুতে মধ্যপ্রস্তর যুগের আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে।

হরগুণ্ডুগি নামক স্থানে স্তরবিন্যস্ত ক্ষেত্রে জীবাশ্মের সঙ্গে মধ্যপ্রস্তর আয়ুধ পাওয়া গেছে। সালওয়াগাদির নিকটস্থ মেরালভাবিতে (কৃষ্ণা-ভীমা দ্বারা গঠিত শোরাপুর দোয়াব) কে. পাড়ডায়া একটি বিরাট উৎপাদনকেন্দ্র আবিষ্কার করেন যার বিবরণ প্রকাশিত হয় ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে প্রাপ্ত ৯৬৩টি আয়ুধের মধ্যে ৪৪৬টি ফলা ধরনের। কর্ণাটকে আবিষ্কৃত ক্ষুদ্রাশ্ম ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে জলহাল্লি, ব্রহ্মগিরি, কিম্বনহাল্লি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মগিরির ক্ষুদ্রাশ্মশিল্প প্রস্তরযুগের মাত্রা অতিক্রম করেছিল যা আমরা পরে দেখব।

তামিলনাড়ু ঃ আমরা আগে দেখেছি যে বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে প্যাটারসন ও কৃষ্ণস্বামী পালার অববাহিকায় অজস্র প্রত্নাশ্মের সন্ধান পান, ধরনের দিক থেকে যেগুলি ভূতাত্ত্বিক মধ্য প্লাইস্টোসীন যুগের নর্মদা ও পাঞ্জাব অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত আয়ুধসমূহের কাছাকাছি। প্যাটারসন মাদ্রাজের নিকটবর্তী ভাডামাদুরাই থেকে প্রাপ্ত আয়ুধসমূহকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। অত্তিরামপক্কমের সম্মুখ প্রত্নক্ষেত্রে পঞ্চম দশকেই ভূসংস্থানের ভিত্তিতে কয়েকটি চত্বর নির্ধারিত করা হয়। দ্বিতীয় চত্বরের নিম্নস্থ কাঁকরমাটির মধ্যে বিপুলসংখ্যক আসেউলীয় ধরনের হাতকুড়াল ও ছেদক এবং তৎসহ মুল ও পাতনির্মিত আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়। শ্রীপেরুম্বুদুর নামক স্থানে জীবাশ্মের সঙ্গে আদি প্রস্তরযুগের কিছু আয়ুধ পাওয়া গেছে ষষ্ঠ দশকের শুরুতে। এগুলির মধ্যে একটি ভগ্ন অথচ সুগঠিত মধ্য আসেউলীয় ধরনের হাতকুড়াল, ইংরাজী ইউ অক্ষরের মত আকারবিশিষ্ট ছেদক ও চক্রাকার আয়ুধ উল্লেখযোগ্য। কে. ডি. ব্যানার্জী মাদ্রাজ থেকে নেলোর পর্যন্ত উপকূলবর্তী অঞ্চলে আদি প্রস্তরযুগের অনেকগুলি আয়ুধ আবিষ্কার করেন। তিনি গুডিয়াম পর্বতছত্রে ধারাবাহিক উৎখননের সূচনা করেন। প্রথম দফার খননে, স্তরবিন্যস্ত পর্যায়ে না হলেও, প্রাক্-আসেউলীয় পাতশিল্পধারা থেকে ক্ষুদ্রাশ্ম শিল্পে উত্তরণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দ্বিতীয় দফায় উৎখননে শিথিল বাদামী মাটির নিচে কংকর মিশ্রিত ল্যাটেরাইট সমাবেশে পাত ও মুল নির্মিত নানা আয়ুধের সন্ধান পাওয়া যায়। সন্নিকটস্থ শ্রীকৃষ্ণপুরম গ্রামে উৎখননের ফলে, সর্বনিম্ন স্তরে কিছু পাওয়া না গেলেও, উপরের সংস্তরে পরবর্তী-আসেউলীয় হাতকুড়ালের সঙ্গে মধ্যপ্রস্তর আয়ুধের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রতি আবিষ্কৃত প্রত্নক্ষেত্রসমূহের মধ্যে উত্তর আর্কট জেলার আর্কোনম তালুকের অন্তর্গত কিলবেনপক্কম এবং তিরুমলপার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মধ্য প্রস্তর যুগের আয়ুধসমূহের পরিচয় অত্তিরামপক্কম ও ভাডামাদুরাই

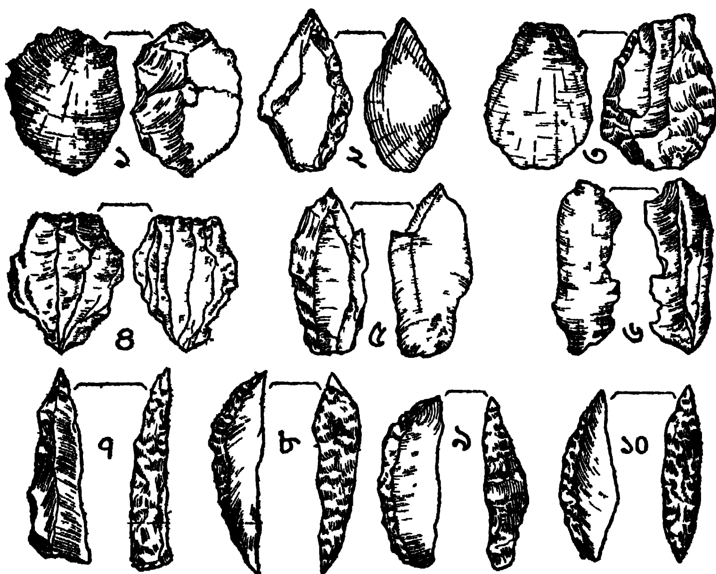
থেকে পাওয়া যায়। অত্তিরামপক্কমের দ্বিতীয় চত্বরে ক্ষয়প্রাপ্ত ল্যাটেরাইট সংস্থানের মধ্যে একজাতীয় ফ্লেক বা পাতশিল্পের বিকাশ দেখা যায়। হাতিয়ারসমূহের ক্ষেত্রে ভোমর, বাটালি ও দীর্ঘায়িত ফলার প্রাধান্য। উপরের স্তরে ক্ষুদ্রাশ্মের অবস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়। গুডিয়ামে খননকার্যের ফলে অনুরূপ হাতিয়ার ও উপকরণের সন্ধান পাওয়া গেছে। গুডিয়াম ও তৎপরিধির অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণপুরমের মধ্যপ্রস্তর সমাবেশ কিছুটা এলোমেলো হলেও পূর্ববর্তী যুগের শিল্পধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন নয়। তামিলনাড়ুতে ক্ষুদ্রাশ্ম শিল্পের বিশেষ বিকাশ দেখা যায় তিরুনেলভেলি জেলায় যার উপর আয়ম্পন বিশেষ আলোকপাত করেন ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৫৬-তে জিউনার এবং অলচিন তিরুনেলভেলির ক্ষুদ্রাশ্ম শিল্পকে 'তেরি শিল্প' নামে অভিহিত করেন। বালিয়াড়ি এলাকাসমূহকে স্থানীয়ভাবে 'তেরি' আখ্যা দেওয়া হয়। বিশেষ ক্ষুদ্রাশ্মক্ষেত্রগুলি হচ্ছে মেগন্নপুরম, কুট্টমপুলি, কুথনকুলি, সওয়ারপুরম (যেখানে আয়ম্পন অনুসন্ধান করেছিলেন) কট্টলনকুলম, কুলাতুর, পুত্তম-তারুবই প্রভৃতি, যেখানে জীবাশ্মের সঙ্গে ক্ষুদ্রাশ্ম নির্মিত হাতিয়ার বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। এগুলির উপকরণ প্রধানত স্ফটিক ও চার্টপাথর। আয়ুধসমূহের মধ্যে পাত, ফলা, ভোমর, চক্র, বর্শাফলক, ত্রিকোণ, চাঁছনি বা বাটালি, খোদক, ছোট কোপানি সবই বর্তমান।

প্রস্তর যুগের সংস্কৃতি

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে যা জানা গেল, উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে শুরু করে দক্ষিণে কাবেরী পর্যন্ত এবং পশ্চিমে সাবরমতী অববাহিকা থেকে শুরু করে পূর্বে নিম্ন-গাঙ্গেয় অঞ্চল পর্যন্ত মধ্য-প্লাইস্টোসীন যুগের মত সুপ্রাচীনকালেও মানুষের বসতি ছিল যাদের দ্বারা নির্মিত অমসৃণ পাথরের আয়ুধ এদেশে আদিপ্রস্তর যুগেব সূচনা করেছিল। আমরা দেখেছি যে এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হাতকুড়াল শিল্পধারা যার তুলনা পশ্চিম এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় পাওয়া যায়। প্রধান আয়ুধ বলতে বোঝায় হাতকুড়াল ও ছেদক, কোর বা মূল নির্মিত চক্রাকার হাতিয়ার, বিভিন্ন ধরনের কর্তরি বা কোপানি, এবং পাত বা ফ্লেক নির্মিত সামগ্রী। মধ্যপ্রস্তর যুগের শিল্পসমূহ আদি প্রস্তর যুগের ধারারই অনুবর্তন এবং সেগুলি প্রধানত ফ্লেক বা পাতনির্ভর। এই যুগেব প্রধান হাতিয়ার বলতে বোঝায় ফ্লেকনির্মিত বিভিন্ন ধরনের স্ক্রেপার বা বাটালি, এবং তৎসহ অপরাপর পাত ও মূল (কোর) নির্মিত আয়ুধ। এই যুগের সাংস্কৃতিক সংবাদ আমরা খুব কমই জানি। অন্যত্র মধ্যপ্রস্তর যুগের আয়ুধসমূহ বহু ক্ষেত্রে গুহা বা এমন জায়গায় পাওয়া গেছে যেখানে মনুষ্যবসতি ছিল। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে গুহা বা অধিবসতিমূলক অবক্ষেপের মধ্যে এই জাতীয় আয়ুধ কদাচিৎ পাওয়া যায়। ব্যতিক্রম পাকিস্তানের সাংঘাও গুহা যেখানে মনুষ্যবসতিজনিত অবক্ষেপের (ডিপোজিট) মধ্যে ফ্লেক-শিল্পের ধারাবাহিকতা আবিষ্কৃত হয়েছে। শেষ প্রস্তর যুগের শিল্পধারা আদি ও মধ্যপ্রস্তরযুগের শিল্পধারার পরিনতি, এছাড়া এখানে কিছু বাইরের প্রভাবও থাকতে পারে। এ যুগের বিশেষত্ব ক্ষুদ্রাশ্মশিল্প। আঞ্চলিক পার্থক্যও পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় এযুগের শিল্পের ক্ষেত্রে বেশি। এযুগের সংস্কৃতি সম্পর্কেও অধিকতর সংবাদ পাওয়া যায় কেননা এযুগে পর্বতগুহা ও পর্বতছত্র সমূহে মনুষ্যবসতির নিদর্শন এবং তজ্জনিত অবক্ষেপস্তূপের মধ্যে আয়ুধের সমাবেশ পাওয়া গেছে। কিছু গুহাচিত্রকেও এযুগের বলে মনে করা হয়।

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রত্নক্ষেত্র ও প্রত্নসামগ্রীর অভাব নেই, কিন্তু সেগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত করার এবং কালনিরূপণ করার ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধা আছে। কাশ্মীরে এবং পাঞ্জাবে তুষারযুগ সংক্রান্ত অনুসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক-সোয়ান, সোয়ান ও বিবর্তিত-সোয়ান শিল্পধারাকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা হওয়া সত্ত্বেও এই বিশাল দেশে এত বেশি

ভূপৃষ্ঠগত পরিবর্তন ঘটেছে যে প্রত্নতত্ত্ববিদের পক্ষে প্রাচীন মানুষের পরিত্যক্ত নিদর্শনসমূহকে ভূতাত্ত্বিক ওঠানামার পটভূমিকায় যথার্থভাবে স্থাপন করা রীতিমত অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। উপদ্বীপীয় ভারত ও মধ্যভারত কাশ্মীর ও উত্তর-পূর্ব পাঞ্জাবে দৃষ্ট হিমবাহ ও অন্তর্হিমবাহ পর্যায়সমূহের প্রত্যক্ষ পরিধির অন্তর্গত নয়। তবে এই অঞ্চলের নদী উপত্যকাসমূহ ভূতাত্ত্বিক প্লাইস্টোসীন যুগের দ্বিতীয়ার্ধে আবহাওয়াগত পরিবর্তন সমূহের পরিচয়বাহী, এবং সেই হিসাবে উভয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু



শেষ প্রস্তর যুগের আয়ুধ : লাংঘনাজ, গুজরাত।
১-৩. পাতশিল্প, ৪. মূল নির্মিত ফলা, ৫. খোদক,
৬-৭. ফলা, ৮-১০. অর্ধচন্দ্রাকার আয়ুধ বা লুনেট

তা স্বাভাবিক ভাবেই অনির্দিষ্ট ধরনের। উত্তর-পূর্ব পাঞ্জাবের নদীচত্বর-সমূহের সঙ্গে নর্মদা ও অপরাপর নদীর চত্বরসমূহকে সম্পর্কিত করার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তার ভিত্তি প্রাপ্ত আয়ুধসমূহের সাদৃশ্য, সেগুলির ধরন সম্পর্কে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী, যেখানে কোন নিশ্চয়তাজ্ঞাপক মানদণ্ড নেই। তবে এই সকল নদীর ক্ষেত্রে অবক্ষেপণের একটি বিশেষ স্থায়ী পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায় যা প্রত্নতাত্ত্বিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে কিছুটা অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করে। মোটের উপর এটুকু বলা যায় যে ভারতের নানা প্রান্তরে অবস্থিত প্রস্তরযুগের সংস্কৃতির ভৌগোলিক বণ্টন সম্পর্কে খবরের অভাব নেই।

এই সকল প্রত্নক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত আয়ুধ ও উপকরণসমূহের ভিত্তিতে এগুলির প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করা গেলেও, এদের পারস্পরিক সম্পর্ক, কালসীমা ও বিবর্তনের চিত্রটি খুব স্পষ্ট নয়।

প্রত্নতাত্ত্বিক ভূগোলের বিচারে ভারতীয় উপমহাদেশকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। প্রথমে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অংশে এই এলাকাগুলি হল বালুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিমের নিম্ন হিমালয় অঞ্চল যেখানকার সংস্কৃতিসমূহের উপর বাইরের, বিশেষ করে ইরান, পশ্চিম এশিয়া ও মধ্য-এশিয়ার, প্রভাব পড়া অসম্ভব নয়, যদিও প্রস্তর যুগে এ প্রভাবের কথাই ওঠেনা। কাশ্মীরে নবাশ্মীয় অধ্যায়ে অবশ্য বাইরের প্রভাবের চিহ্ন দেখা যায়। একথা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের ক্ষেত্রেও সত্য যা বলতে বোঝায় আসাম, পূর্বতন আসাম প্রদেশে গড়ে ওঠা পার্বত্য রাজ্যসমূহ এবং বঙ্গদেশ। ভারতের অবশিষ্ট এলাকাকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—সিন্ধু ও তার উপনদীসমূহ বিধৌত পশ্চিমোত্তরাঞ্চল, গঙ্গা অববাহিকার পূর্বোত্তরাঞ্চল এবং বিন্ধ্যের দক্ষিণে উপদ্বীপীয় ভারত। এছাড়া মধ্যভারতের পার্বত্য ও অরণ্যময় ভূখণ্ডটি একটি আভ্যন্তরীণ সীমান্ত অঞ্চলের ভূমিকাবাহী। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক যুগের লক্ষণ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হলেও প্রতিটি এলাকার কিছু স্বকীয়ত্ব আছে।

আদিপ্রস্তর যুগের মানুষের কোন স্থায়ী বসতির পরিচয় পাওয়া যায়নি। তারা ছিল যাযাবর যারা অস্থায়ীভাবে বাস করত পাহাড়ের পাদদেশে, খোলা মালভূমিতে, নদীতীরে, অরণ্য সীমান্তে যেখানে আয়ুধ ও জীবনোপকরণসমূহ তৈরির উপাদান, জল, শিকার এবং ফলমূল সহজলভ্য। অতি উচ্চতা বিশিষ্ট স্থান এবং জলাভূমি অঞ্চল তারা স্বাভাবিকভাবেই এড়িয়ে যেত। তাদের অর্থনৈতিক জীবন ছিল সরলতম ধরনের, শিকার ও সংগ্রহ নির্ভর। একমাত্র আয়ুধ ছাড়া তাদের অস্তিত্বকে সনাক্ত করার আর কোন উপায় নেই। সিন্ধু ও কেরালা ব্যতিরেকে ভারতের সর্বত্রই আদিপ্রস্তর যুগের কোপানি, ছেদক ও হাতকুড়াল শিল্পের বিকাশ দেখা যায়, যদিও পাঞ্জাব থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ-পূর্বে ও দক্ষিণ পশ্চিমে যত অগ্রসর হওয়া যায় কোপানি জাতীয় হাতিয়ারের ক্রমিক হ্রাসমানতা ততই চোখে পড়ে। আয়ুধের উপকরণ প্রধানত শিলাস্ফটিক ও উপল। আয়ুধ তৈরির পদ্ধতি ছিল সরল যদিও শ্রম ও সময় সাপেক্ষ। একটি শিলাখণ্ডকে অস্ত্রের আকার দেওয়ার জন্য সেটি থেকে ধীরে ধীরে একের পর এক ফ্লেক বা পাত খসিয়ে ফেলা হত। আবার এই পাতগুলিকেও নানা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হত এবং সেই উদ্দেশ্যে সেগুলিকেও নির্দিষ্ট

আকার দেবার চেষ্টা করা হয়।[১] উপলীয় আয়ুধসমূহ প্রধানত কাটা, ভাগ করা, ছাল ছাড়ানো, খোসা তোলা প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হত। হাতকুড়াল এবং সেগুলির নানা উপধরন প্রায় সর্বপ্রয়োজনেই ব্যবহৃত হত। হাতকুড়ালের মত ছেদকও ছিল সর্বার্থসাধক হাতিয়ার। এগুলি দিয়ে গাছ পর্যন্ত কাটা চলত এবং কোপানি ও ফ্লেক সহযোগে কাঠের হাতিয়ারও তৈরি করা যেত, অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে যা আজও দেখা যায়। শিকার করা পশুর ছাল ছাড়ানো, মাংস কেটে বার করা, বিভিন্ন প্রয়োজনে পশুর হাড় ছেদন করা প্রভৃতি কাজেও এই আয়ুধগুলির কার্যকারিতা ছিল। আদিপ্রস্তর যুগের মানুষের জীবনধারা সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি তথ্য আমাদের হাতে নেই। তাদের ধর্মবিশ্বাসের কোন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়নি, কোন সমাধিও পাওয়া যায়নি। তারা কোন্ নৃগোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিল কিছু জানা যায়না। তারা যে দলবদ্ধ জীবনযাপন করত এটা অনুমান করতে কোন অসুবিধা নেই, তবে তাদের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে কোন কিছু অনুমান করার মত উপকরণ আমাদের হাতে নেই।

একমাত্র সাংঘাও ছাড়া মধ্যপ্রস্তর যুগের কোন সুনির্দিষ্ট বসতির পরিচয় পাওয়া যায় না, কেননা মানুষ তখনও ছিল একান্তই খাদ্যসংগ্রাহক ও যাযাবর। দাক্ষিণাত্যে, নর্মদা উপত্যকায় এবং আরও নানা স্থানে কয়েকটি মধ্যপ্রস্তর যুগের উৎপাদনকেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু সেগুলি বসতি নয়। গুহার অভ্যন্তরে বা পর্বতছত্রের তলায় জমে থাকা অবক্ষেপের মধ্যে মধ্যপ্রস্তর যুগের সামগ্রীর অভাব এখানে ভয়ানকভাবে চোখে পড়ে তবে সে আমলের মানুষ যে নদীতীরকে অবহেলা করেনি তার প্রমাণ নদী অঞ্চলেই তাদের হাতিয়ার বেশি পাওয়া গেছে। উৎপাদন কেন্দ্রসমূহের পরিমাপ এই যুগে জনসংখ্যাবৃদ্ধির সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের নৃগোষ্ঠীগত পরিচয় জানা সম্ভব

১। আসলে আয়ুধ নির্মাণের মূল ব্যাপারই ছিল ফ্লেকিং বা পাত-খসানো। এটা ঠিক পাথর ভাঙা নয়, পাথর থেকে চটা বার করা। একেবারে আদিমতম পর্যায়ে যে পাথর থেকে আয়ুধ তৈরি হবে সেটিকে ঠুকে বা আছড়ে চটা বার করা হত। পরবর্তীকালে এর বিপরীত কৌশলটি ব্যবহৃত হয় যাকে বলা হয় স্টোন হ্যামার টেকনিক। আয়ুধ নির্মাণের পাথরটির বিভিন্ন জায়গায় অন্য একটি পাথরকে হাতুড়ি হিসাবে ব্যবহার করে আঘাত করে কিছুটা ইচ্ছামত আকারের চটা বার করা সম্ভব। আঘাতের গুরুত্বকেও কাজে লাগানো হত। এরই আরও একটু-উন্নততর পদ্ধতি সিলিণ্ডার হ্যামার টেকনিক নামে পরিচিত। এই পদ্ধতিতে যে বস্তুর সাহায্যে পাথরে আঘাত করা হবে সেটির কার্যকারিতা সম্পর্কে একটা পূর্বধারণা রাখতে হত। আঘাত করার জন্য এমনকি গাছের ডাল বা নানা-আকারের কাঠের ডাণ্ডা বা অস্থিও ব্যবহার করা হত। এছাড়া চাপ দিয়ে পাথর ছাড়ানো বা চটা তোলার পদ্ধতিও চালু ছিল যাকে বলা হয় প্রেসার টেকনিক। চটা বা পাতকে আস্তে আস্তে আঘাত করে তার দুদিক সমান্তরাল করার পদ্ধতিকে বলা হয় ব্লেড টেকনিক। এইভাবেই ফলা তৈরি হত। হাল্কা কাঠের মুগুর দিয়ে অন্যভাবে আঘাত করে ফলার কোণ ভেঙে খোদক তৈরি করা হত।

নয়। মধ্যপ্রস্তর যুগের আয়ুধসমূহ তুলনামূলক ভাবে আগের যুগের চেয়ে কিছুটা হাল্কা, যেগুলির একটি বড় অংশ আগেট, চার্ট, জ্যাস্পার, কালসেদনি প্রভৃতি আধা-দামী পাথরে তৈরি, এবং আয়ুধসমূহের মধ্যে বাটালি, ভোমর বা তুরপুন, শল্য বা পয়েন্ট, ছোট হাতকুড়াল, কদাচিৎ ক্ষুদ্রায়তন ছেদক প্রভৃতি। এই আয়ুধবৈচিত্র্য শিকারজীবনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় কিছুটা অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দেয়। কারিগরি, ধরন, স্তর ও উপকরণের বিচারে এই সকল আয়ুধের বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। বস্তুত প্রবরার তীরবর্তী নেভাসা থেকে প্রাপ্ত আয়ুধ গুণগতভাবে পূর্ববতী যুগের আয়ুধের থেকে পৃথক। আয়ুধ নির্মাণের পদ্ধতির ক্ষেত্রেও পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এযুগে মূল বা কোরের তুলনায় ফ্লেক বা পাতের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারি ধরনের মূল-নির্মিত অস্ত্র যদিও অপ্রচলিত হয়ে যায়নি, কিন্তু অস্ত্রনির্মাতার দৃষ্টি ছিল পাথরের মূল অংশের চেয়ে পাত বা চাকলা বা শল্কের দিকেই বেশি এবং সেগুলিকেই অধিকতর হাল্‌কা, ফলদায়ক ও নিয়মিত করায় প্রতি। ফ্লেক বা পাত নির্মিত মধ্যপ্রস্তর শিল্পধারার ক্ষেত্রে লেভালোয়া-মুসতেরীয় কারিগরির আভাস পাওয়া যায়। আদি প্রস্তর যুগের মত মধ্যপ্রস্তর যুগের মানুষদের জীবনের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে জানার সুযোগ খুবই কম। তাদের সামাজিক সংগঠন, ধর্মবিশ্বাস, মৃতের সৎকার পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করার মত পর্যাপ্ত তথ্য আমাদের হাতে নেই।

শেষপ্রস্তর যুগে অবশ্য অনেকগুলি পরিবর্তনের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। আবহাওয়াগত ও ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন তৎকালীন মানুষের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রেও নানা পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। তুষার যুগসমূহের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভূতাত্ত্বিক হিসাবে যুগপরিবর্তন ঘটে, প্লাইস্টোসীন যুগ থেকে হলোসীন যুগে উত্তরণের মধ্য দিয়ে। শেষপ্রস্তর যুগের মানুষ পূর্ববর্তী দুই যুগের মানুষের মত যাযাবরধর্মী হলেও অস্থায়ী বসতির লক্ষণ দেখা যায়। একই এলাকায় অনেকগুলি উৎপাদনকেন্দ্রের অবস্থিতি জনসংখ্যাবৃদ্ধি, পরস্পরের নিকটস্থ থাকার অভিপ্রায়, এবং অস্থায়ী বসতি গড়ে তোলার ইঙ্গিতবহ। বাসস্থান হিসাবে গুহা ও পর্বতছত্রের আকর্ষণীয়তার নজীর আছে। এই পর্যায়ে শিকার ও সংগ্রহের পাশাপাশি অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে যে পশুপালনের প্রবর্তন ঘটেছিল তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় লাংঘনাজ ও আদমগড় থেকে। শেষ প্রস্তর যুগের আয়ুধসমূহ মধ্যপ্রস্তর যুগের আয়ুধসমূহের অনুবর্তন, তবে তার সঙ্গে সমান্তরাল ধারবিশিষ্ট ফলা শিল্পের সংযোজন ঘটেছিল যার প্রচলন পরবর্তী নবাশ্মীয়-তাম্রাশ্মীয় অধ্যায়েও

অব্যাহত ছিল। শেষ প্রস্তর যুগের আয়ুধের বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে ক্ষুদ্রাশ্ম সেকথা আগেই বলা হয়েছে। ধরনের দিক থেকে এগুলিকে দুভাগে ভাগ করা হয়-জ্যামিতিক (যেগুলির আকার আছে, ত্রিকোণ, ট্রাপেজ প্রভৃতি) এবং অজ্যামিতিক (সর্বরকম আকারযুক্ত এবং বিশেষ পরিকল্পনাহীন)। এখানে প্রথম ধরনের সঙ্গে মৃৎশিল্পের সংযোগ দেখা যায়, যদিও মীর্জাপুর জেলার বাঘাই-খোর-এ দ্বিতীয় ধরনটির সঙ্গে মৃৎশিল্পের অস্তিত্ব দেখা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মধ্যপ্রদেশের আদমগড়ে শেষ প্রস্তর যুগের আদি পর্যায়ের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে কোন মৃৎশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়নি। আদি ও মধ্যপ্রস্তর যুগের কোন সমাধিক্ষেত্র আবিষ্কৃত না হলেও শেষ প্রস্তরযুগে সমাধির নিদর্শন দুর্লভ নয়। মধ্যপ্রদেশের পাচমারি এবং উত্তরপ্রদেশের বাঘাই-খোর ও লেখাহিয়ার পর্বতছত্রের নিচে শেষপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকটি সমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে প্রদত্ত সামগ্রী হিসাবে কিছু ক্ষুদ্রাশ্মের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজস্থানের বাগোর এবং গুজরাতের লাংঘনাজের সমাধিগুলিতে শায়িত অথবা বিভিন্ন ভঙ্গীতে রক্ষিত দেহাবশেষের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রথমোক্ত স্থানে শেষ প্রস্তর, নবাশ্মীয়-তাম্রাশ্মীয় এবং লৌহ এই তিন যুগেরই সমাধিক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। শেষোক্ত স্থানে, অর্থাৎ লাংঘনাজে, তিন যুগের সমাধি পাওয়া গেছে এবং প্রস্তর যুগের সমাধি ক্ষেত্রে কিছু মৃৎপাত্রাংশের চিহ্ন দেখা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এখান থেকে শেষপ্রস্তর যুগের যে তেরটি কংকাল পাওয়া গেছে সেগুলির বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করে সেখানে দুটি নৃগোষ্ঠীর অস্তিত্ব অনুমিত হয়েছে—প্যালিও-মেডিটারেনিয়ান এবং প্রোটো-অস্ট্রালয়েড।[১] লেখাহিয়াতে একটি সমাধির চারদিকে পাথরের টুকরোর বেষ্টনী দেখা যায়, যা সম্ভবত মৃতকে অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রদত্ত হয়েছিল। অর্থাৎ মৃত্যুসংক্রান্ত কিছু বিশেষ চিন্তাভাবনা এই যুগে গড়ে উঠেছিল। শেষপ্রস্তর যুগের দেব-দেবী বা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের কোন পাথুরে প্রমাণ নেই। শিল্পবোধের বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়

১। প্রোটো-অস্ট্রালয়েড: খর্বাকার, কৃষ্ণবর্ণ, খাঁজকাটা চোখের ভুরু, নাকের গোড়ার দিক চাপা অথচ অগ্রভাগ পুরু ও চওড়া, মুখের অংশ একটু বেশি সম্মুখপ্রসারিত, পুরু ঠোঁট এবং ঢেউ খেলানো থেকে কুঞ্চিত চুল। দক্ষিণভারতের চেঞ্চু, মালায়ান, কুরুম্ব প্রভৃতির মধ্যে এবং মধ্যভারত, বিহার, বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার মুণ্ডা, সাঁওতাল ও কোল গোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে এই উপাদান সর্বাধিক।

প্যালিও-মেডিটারেনিয়ান: মধ্যম আকার, লম্বা মাথা, ছোট অথচ চওড়া নাক, দেহে ও মুখে চুলের ভাগ কম, কালো-আভমুখী গায়ের রঙ। এই ধরনটি দক্ষিণভারতের তামিল-ভাষীদের মধ্যে পাওয়া যায়।

আদমগড়, ভীমবেতকা, মোহরনা প্রভৃতি স্থানের গুহাগাত্রে বা পর্বতছত্রের তলবর্তী দেওয়ালে অঙ্কিত চিত্রাবলী থেকে। বিশেষ করে মধ্যপ্রদেশের সেহোর, ভূপাল, রাইসেন, হোসঙ্গাবাদ, এবং সাগর জেলায় এই সকল গুহাচিত্র বর্তমান। এই রকম একটি চিত্রক্ষেত্র মান্দসুর জেলার ভানপুরায় সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। দেওয়ালে এবং ছাদের সিলিং-এ অঙ্কিত চিত্র-সমূহে রঙের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বিষয়বস্তুর মধ্যে পশুপাখির চিত্র সর্বাধিক, তারপরে মানুষের চিত্র এবং তারপরে বিভিন্ন প্রতীক বা অলংকরণ-চিত্র। তবে সকল চিত্রকেই শেষপ্রস্তর যুগের মনে করার কোন কারণ নেই। অধিকাংশই অনেক পরবর্তীকালে অঙ্কিত হয়েছে। এমনকি আরোপিত পুনরঙ্কনও লক্ষ্য করা যায়। তবে কিছু যে শেষপ্রস্তর যুগের অঙ্কন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

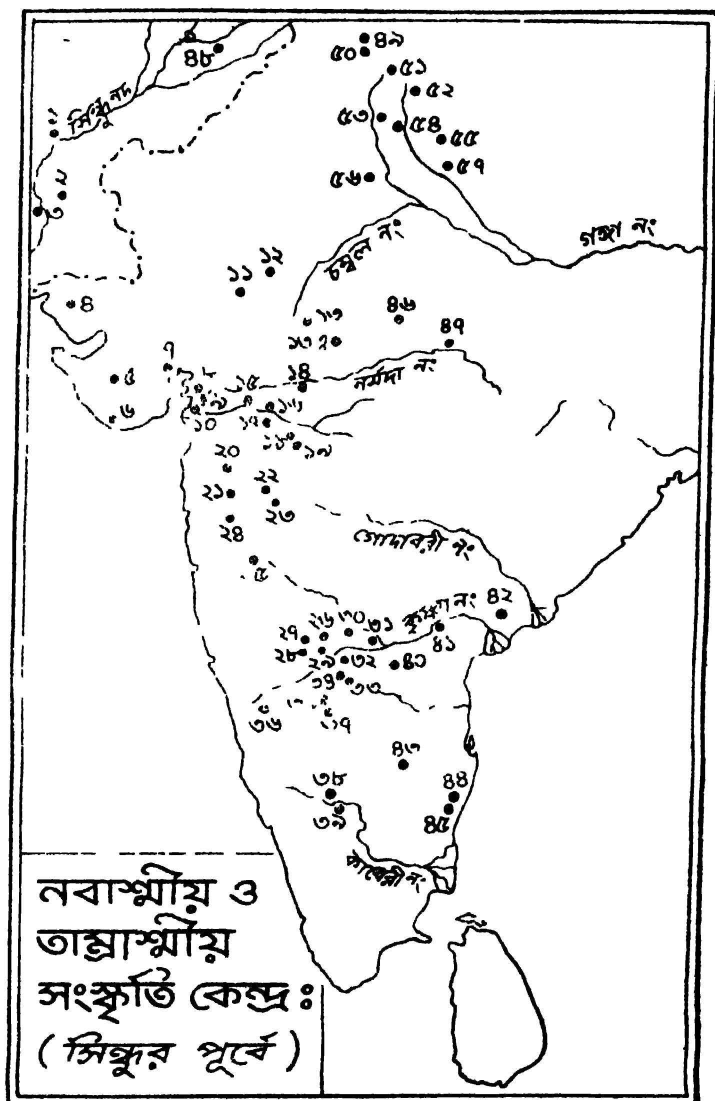
নবাশ্মীয় অধ্যায়

নবাশ্মীয় অধ্যায় প্রস্তরযুগের পরবর্তী বিকাশ। এই অধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য-সমূহ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি এবং সেইসঙ্গে এদেশে নবাশ্মীয় অধ্যায় সম্পর্কে চর্চার নানা খোঁজ খবর দিয়েছি। একথাও পূর্বে বলা হয়েছে যে ভারতীয় পটভূমিকায় নবাশ্মীয় অধ্যায়ের বিকাশ বড়ই অসম, কালের বিচারে অর্বাচীন এবং প্রকৃতির দিক থেকে মিশ্র, কেননা এখানে নবাশ্মীয়ের সঙ্গে তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির ব্যাপক সংমিশ্রণ হয়েছে। পালিশ করা কুঠার, অস্থি-নির্মিত আয়ুধ এবং ধূসরবর্ণের মৃৎপাত্র দ্বারা চিহ্নিত অবিমিশ্র নবাশ্মীয় সংস্কৃতির সংখ্যা বড়ই কম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পালিশ করা কুঠারের সঙ্গে কৃষ্ণবর্ণের দ্বারা চিত্রিত লোহিতাভ মৃৎপাত্র, দীর্ঘায়িত ফলা এবং তাম্র-ব্রোঞ্জ নির্মিত সামগ্রী পাওয়া যায় যা মূলত তাম্রাশ্মীয় যুগের পরিচায়ক।

অবিমিশ্র ধরনের নবাশ্মীয় বসতিসমূহের মধ্যে, অর্থাৎ যেখানে ধাতব কোন উপকরণ নেই, বালুচিস্তানের কিছু কেন্দ্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই কেন্দ্রগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে কোয়েটা অঞ্চলে এবং লোরালাই ও ঝোব উপত্যকায়। এগুলি প্রাক্-হরপ্পীয়, বিকাশকাল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দ। কিন্তু এই সকল কেন্দ্রে বাইরের প্রভাবেই হোক বা যে কোন কারণেই হোক, তাম্রের ব্যবহারের প্রচলন হয়েছিল যার ফলে এই কেন্দ্রগুলির অত্যল্পকালের মধ্যেই তাম্রাশ্মীয় পর্যায়ে উত্তরণ ঘটে। মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রেও হস্তনির্মিত মৃৎপাত্রের বদলে চক্রনির্মিত এবং বিশেষ বর্ণরঞ্জিত মৃৎপাত্রের প্রবর্তন দেখা যায় বিশেষ করে কিলিগুল মহম্মদ, রানা ঘুণ্ডাই, সুরজাঙ্গাল, লোরালাই, মুণ্ডিগক এবং ঝোব উপত্যকার নানা কেন্দ্রের পরবর্তী পর্বসমূহে। স্থায়ী বসতির কিছু কিছু নিদর্শন বালুচিস্তানের কেন্দ্রসমূহের দ্বিতীয় পর্ব থেকে মোটামুটিভাবে পাওয়া যায়। আফগানিস্তানের মুণ্ডিগকের প্রথম পর্ব থেকেই তাম্রের ব্যবহার দেখা যায়। ডাম্ব সদাতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে এবং কুল্লী, নান্দারা, নাল, মেহী প্রভৃতি প্রাক্-হরপ্পীয় কেন্দ্র থেকেও তাম্রের আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সকল কেন্দ্রের কথা আমরা অন্যত্র পৃথকভাবে আলোচনা করব।

কাশ্মীরের বুর্জাহোম ও অপর কয়েকটি স্থানে অবিমিশ্র নবাশ্মীয় সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। বুর্জাহোমে ধারাবাহিক খননকার্যের ফলে তিনটি যুগের বসতিচিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রথম যুগের বসতির সর্বনিম্ন কাল ২৩৭৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। এখানে বিবরনিবাসের নিদর্শন, হস্তনির্মিত ধূসর ও কৃষ্ণবর্ণের মৃৎপাত্র, ভূমিতে ব্যবহারোপযোগী নানা ধরনের পাথর ও

হাড়ের হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। দ্বিতীয় বসতির যথার্থ কালনির্ণয় সম্ভব হয়নি তবে তা অবশ্যই ১৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পূর্বে। প্রাপ্ত নিদর্শন-



সমূহ প্রথম যুগের বসতির অনুরূপ। বুর্জাহোমের প্রথম যুগের দ্বিতীয় পর্বে ছয়টি সমাধি পাওয়া গেছে, চারটি পূর্ণ এবং দুটি আংশিক। দ্বিতীয়

যুগের আবিষ্কৃত সমাধির সংখ্যা তিনটি। একটি তাম্রনির্মিত বর্শাফলক সমাধিসামগ্রী হিসাবে প্রদত্ত হয়েছে। এছাড়া এখানে পশুদেরও সমাধি প্রদানের রীতির পরিচয় পাওয়া গেছে। প্রথম যুগের কয়েকটি কঙ্কালে লাল রং লাগানো হয়েছিল বলে জানা যায়। বুর্জাহোমে একটি তৃতীয় যুগেরও হদিশ পাওয়া যায় যেখানে মহাশ্মীয় (মেগালিথিক) কারিগরির নিদর্শন ও অমসৃণ লাল রঙের মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে।

উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে আসামের কামরূপ, গোয়ালপাড়া, দারাং, লখিমপুর ও শিবসাগর জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু নবাশ্মীয় সংস্কৃতির পরিচয়



১-৩. খাসি ও নাগা পাহাড় থেকে প্রাপ্ত কুঠার।

পাওয়া যায়। মেঘালয়ের গারো পাহাড় অঞ্চলে অন্যান তেরটি কেন্দ্রে পালিশ করা পাথরের হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবেনাগা ও খাসি পাহাড়েও কিছু কিছু নবাশ্মের পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তর কাছাড় পার্বত্য এলাকার দেওজালি-হাডিং-এ খননকার্যের ফলে ভূমিতে ব্যবহারোপযোগী বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার পাওয়া গেছে, যদিও সংখ্যায় বড় কম। গৌহাটির ২৫ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্ব শরতারু নামক গ্রামে খননকার্যের ফলে নয়টি কুঠার আবিষ্কৃত হয়েছে। দেওজালি-হাডিং থেকে প্রাপ্ত আয়ুধসমূহকে আসামের অন্যত্র এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য রাজ্যগুলি থেকে পাওয়া আয়ুধসমূহের তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে তরুণ শর্মা সেগুলিকে

---

৫৫ পাতার মানচিত্র পরিচিতি

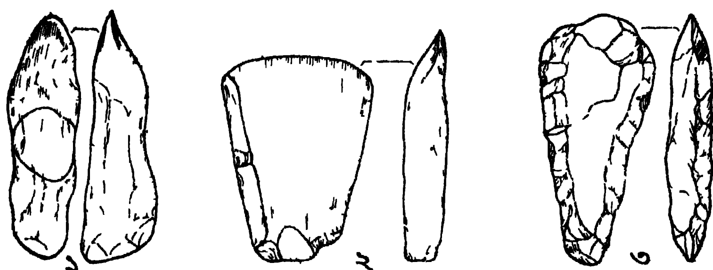
১। বুকর ২। ছানহুদরো ৩। অম্রী ৪। দেশলপার ৫। রোজদি ৬। সোমনাথ ৭। রংপুর ৮। মেহগম ৯। তেলোদ ১০। ভগত্রব ১১। অহর ১২। গিলুন্ড ১৩। নাগদা, কায়থা ১৪। নভডাটোলি ১৫। বহুরূপা ১৬। প্রকাশ ১৭। সভালডা ১৮। বহল ১৯। টেকওয়াদা ২০। নাসিক ২১। জোরওয়ে ২২। দাইমাবাদ ২৩। নেভাসা ২৪। চন্দোলী ২৫। সোনেগাঁও ২৬। ওয়াটগল ২৭। বিব্বমরায়ণগুডডা ২৮। পিকলিহাল ২৯। মাস্কি ৩০। কাল্লুর ৩১। উৎনুব ৩২। তেক্কলকোটা ৩৩। সঙ্গনকল্লু ৩৪। কুপগল ৩৫। কুদাতিনী ৩৬। হাল্লুর ৩৭। ব্রহ্মগিরি ৩৮। টি. নরসিপুর ৩৯। হেম্মিগে ৪০। পাটপাদ ৪১। নাগার্জুনিকোন্ডা ৪২। কেশবপল্লী ৪৩। পাইয়ামপল্লী ৪৪। গৌরীমেদু ৪৫। মঙ্গলম ৪৬। এরান ৪৭। ত্রিপুরী ৪৮। হরপ্পা ৪৯। রূপর ৫০। বরা ৫১। বরগাঁও ৫২। অম্বাখেরী ৫৩। আলমগিরপুর ৫৪। হস্তিনাপুর ৫৫। অহিচ্ছত্রা ৫৬। নোহ ৫৭। অত্রাঞ্জিখেরা।

চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। দেওজালি-হাডিং থেকে মৃৎপাত্রও পাওয়া গেছে, কিন্তু ওই সকল মৃৎপাত্রের এলোমেলো অবস্থানের জন্য খননকার্যের দ্বারা প্রাক্-মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পের পর্যায়ভেদ সম্ভব হয়নি। শর্মা আসামের নবাশ্মীয় অধ্যায়কে দুটি পর্বে বিভক্ত করেছেন, প্রতিটি পর্বের দুটি করে উপপর্বসহ। প্রথম পর্বের কালনিরূপণ সম্ভব হয়নি, দ্বিতীয় পর্বটিকে ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি স্থান দেওয়া হয়েছে। সাংকালিয়া মেঘালয়ের নবাশ্মীয় অধ্যায়ের কালসীমা দিয়েছেন ৪০০০—২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাশ্মীয় অধ্যায়ের চিত্রটি খুব পরিষ্কার নয়। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার খুঁকরাখোপী, ওরগাণ্ডা, বেলপাহাড়ী ও শুশুনিয়া পাহাড় এবং দার্জিলিং জেলার দুংরোবস্তি ও সিন্দিবোঙ-এ কিছু নবাশ্মীয় ধরনের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। বর্ধমান জেলার পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে নবাশ্মীয় থেকে তাম্রাশ্মীয় এবং তা থেকে লৌহ-যুগে উত্তরণের চিহ্ন চোখে পড়ে। এম. এন. দেশপাণ্ডে মেদিনীপুরের তমলুকে উৎখনিত স্তরে নবাশ্মীয় কুঠার এবং ভাল করে না পোড়ানো মৃৎপাত্র আবিষ্কার করেন। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলায় কুচাই-এ পালিশ করা প্রস্তর নির্মিত আয়ুধের সঙ্গে আগুনে পোড়ানো লোহিতাভ মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে যেগুলিতে আঙুলের ডগার ছাপ অথবা নখের আঁচড় দিয়ে অলংকরণ করা হয়েছে। আয়ুধসমূহের মধ্যে কুঠার, খুরপি, কাটারি, পেষক প্রভৃতি কৃষিজীবনের সাক্ষ্য দেয়। বিহারে গয়া জেলার শোনপুরে এবং ভাগলপুর জেলার উরিউপে মিশ্র নবাশ্মীয় সমাবেশ লক্ষ্য করা গেলেও একটি অবিমিশ্র ও গুরুত্বপূর্ণ নবাশ্মীয় কেন্দ্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় সারণ জেলার চিরান্দ নামক স্থানে। চিরান্দের উপরের স্তরের আনুমানিক তারিখ ১৬৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ এবং নিচের স্তরের ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। এখানকার ভূসংস্থান পলি দিয়ে গঠিত। প্রাপ্ত সামগ্রীর মধ্যে আছে মৃৎপাত্র (হস্তনির্মিত নানা আকারের, চার ধরনের) অস্থিনির্মিত আয়ুধ (এত বেশি ধরনের যার তুলনা অন্যত্র নেই), ভূমিতে ব্যবহারের উপযোগী প্রস্তর নির্মিত আয়ুধ, ক্ষুদ্রাশ্ম (চার্ট, কালসেদনি ও বেলেপাথরের তৈরী) আধা-দামী পাথরের অলংকারের উপকরণ, অস্থি ও পোড়ামাটির বলয়, পোড়ামাটির সর্পমূর্তি প্রভৃতি।

দক্ষিণের নবাশ্মীয় বসতিসমূহের মধ্যে ব্রহ্মগিরি, সঙ্গনকল্লু, পিকলিহাল, হাল্লুর, গৌরিমেদু, মাস্কি, নাগার্জুনিকোণ্ডা, উৎনুর, টি-নরসিপুর, তেক্কল-কোটা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তবে 'এই সব কেন্দ্রের নবাশ্মীয় সংস্কৃতি অবিমিশ্র নয়। এই সকল নবাশ্মীয় বসতির কাল নিরূপণ করা হয়েছে ২৫০০ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে, কিন্তু ১৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পর থেকেই

এই সকল নবাশ্মীয় সংস্কৃতি, তাম্রাশ্মীয় পর্যায়ে উপনীত হয়। যে কোন কারণেই হোক এখানকার অধিবাসীরা তাম্রের ব্যবহারে অভ্যস্ত হয় এবং তারই প্রভাবে অন্যান্য জীবনোপকরণের ক্ষেত্রেও তারা নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে নেয়। এই সকল নবাশ্মীয় কেন্দ্র অধিকাংশই উৎখনিত যার ফলে প্রতিটি কেন্দ্রেই স্তর-কাল-পর্বের ভেদ করা হয়েছে। সঙ্গনকল্লু, ব্রহ্মগিরি প্রভৃতি প্রায় সকল কেন্দ্রেই প্রথম পর্যায়ে অবিমিশ্র নবাশ্মীয় সংস্কৃতিব বিকাশ দেখা যায়। এই অবিমিশ্র নবাশ্মীয় সংস্কৃতির লক্ষণ প্রধানত ভূমিতে ব্যবহারের উপযোগী মসৃণ কুঠার ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক আয়ুধ, চার্ট ও কোয়ার্ৎজ নির্মিত ক্ষুদ্রাশ্ম, অস্থিনির্মিত আয়ুধ, ফলা শিল্প (ব্যাপক বিকাশ সঙ্গনকল্লু ব্রহ্মগিরি ও পিকলিহালে), বিভিন্ন ধরনের হস্তনির্মিত এবং প্রধানত ধূসরবর্ণের মৃৎশিল্প (পিকলিহালে পাঁচ ধরনের, সঙ্গনকল্লু, ব্রহ্মগিরি ও মাস্কিতে তিন ধরনের), কাঠের খুঁটিওয়ালা চালাঘর, কিছু পোড়ামাটির বৃষমূর্তি, প্রভৃতি।



১–৩. বেলারি জেলা থেকে প্রাপ্ত কুঠার।

কিন্তু এই সকল নবাশ্মীয় বসতির পরবর্তী পর্যায়ে তাম্রের সামগ্রী পাওয়া যায়। হাল্লুরের প্রথম পর্যায়ের অবক্ষেপের মধ্যেই তিনটি তাম্রের উপকরণ পাওয়া গেছে। ব্রহ্মগিরি, পিকলিহাল ও মাস্কিতে উপরের স্তরে তাম্রের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। তেক্কলকোটার প্রথম পর্যায়ে একটি তাম্রনির্মিত কুঠার এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে কয়েকটি তাম্রনির্মিত সামগ্রী পাওয়া গেছে।

একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে অবিমিশ্র নবাশ্মীয় সংস্কৃতিই হোক অথবা মিশ্র নবাশ্মীয়-তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতিই হোক কালসীমার বিচারে অন্যদেশের তুলনায় সেগুলি বড়ই অর্বাচীন তাই অনুমান করা যেতে পারে যে এদেশে শেষপ্রস্তর যুগ অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। একেবারে উত্তর-পশ্চিমে বালুচিস্তানে ও উত্তরে কাশ্মীরে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দে শেষপ্রস্তর যুগ থেকে নবাশ্মীয় অধ্যায়ে উত্তরণ ঘটেছিল, কিন্তু সেই সময় ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে শেষপ্রস্তর যুগ বিরাজিত ছিল। পরবর্তীকালে, কোন আভ্যন্তরীণ

উদ্ভাবনার কারণেই হোক অথবা বাইরের প্রভাবেই হোক বালুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম ভারতে তাম্র ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার শুরু হয়, যখন ভারতের অপরাপর স্থানে তখনও শেষপ্রস্তর যুগ বজায় আছে, কেবল মাঝে মাঝে দ্বীপের মত উপদ্বীপীয় ভারতে এবং পূর্বোত্তর অঞ্চলে স্থানে স্থানে শেষ প্রস্তর যুগ থেকে নবাশ্মীয় পর্যায়ের উত্তরণ ঘটেছে। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে, বিশেষ করে সিন্ধু নদীর অববাহিকায়, বালুচিস্তান, সিন্ধু ও সংলগ্ন এলাকায়, প্রাক্-হরপ্পীয় তাম্রাশ্মীয় বসতি-সমূহের অবশেষের উপরেই হরপ্পাসভ্যতা গড়ে ওঠে ২৩৫০ থেকে ১৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে, এবং সেই সভ্যতার বিস্তৃতি ঘটে মাকরান উপকূলে একেবার ইরান ও পাকিস্তানের সীমানায় সুতকাগেনদোর পর্যন্ত, উত্তর শিবালিক পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত, এবং দক্ষিণে কচ্ছ উপদ্বীপ, ক্যাম্বে উপসাগরের মুখে বন্দরনগরী লোথাল এবং নর্মদার উপর ভগতরব পর্যন্ত। সম্ভবত এই হরপ্পাসভ্যতার প্রভাবে মহারাষ্ট্রর গোদাবরী-প্রবরা অববাহিকায় এবং তাপী উপত্যকায় এবং মধ্যপ্রদেশের বেতোয়া ও নর্মদা উপত্যকায় গড়ে ওঠা নবাশ্মীয় বসতিগুলি অতি দ্রুত তাম্রাশ্মীয় পর্যায়ে উপনীত হয়, এবং এই সকল রূপান্তরিত তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির প্রভাবে অন্ধ্র-কর্ণাটকে কৃষ্ণা ও কাবেরী উপত্যকার নবাশ্মীয় বসতিসমূহে ধাতুর ব্যবহার প্রচলিত হয়।

নবাশ্মীয় অধ্যায়ে স্থায়ী বসতির ও তৎসহ কৃষি ও পশুপালনের উপযোগী পরিবেশ-সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। বালুচিস্তানে ও সিন্ধুপ্রদেশের প্রাক্-হরপ্পীয় কেন্দ্রসমূহে মাটির দেওয়ালযুক্ত চালাঘর থেকে ইণ্টকনির্মিত আবাস-ব্যবস্থায় রূপান্তর পরবর্তীকালে হরপ্পাসভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রে নাগরিকতা গড়ে তোলার পটভূমি সৃষ্টিতে অবশ্যই সহায়ক হয়েছিল। কাশ্মীরে নবাশ্মীয় বিবরনিবাস এবং দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থানে পর্বতগুহা বা পাহাড় কাটা বসতির কথা বাদ দিয়ে একথা বলা যায় যে নবাশ্মীয় পর্যায় থেকেই কাঠের খুঁটিওয়ালা মাটির দেওয়াল ও পেটা মেঝেযুক্ত যে চালাঘরের প্রচলন হয়েছিল, সেই ধারা আজও পর্যন্ত বজায় আছে, যদিও অঞ্চলভেদে কিছু কিছু উপকরণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে পার্থক্য ঘটেছে। শেষপ্রস্তর যুগে শিকার ও সংগ্রহের পাশাপাশি অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে যে পশুপালনের প্রবর্তন ঘটেছিল তার কিছু প্রমাণ আছে। বালুচিস্তানের নবাশ্মীয় সংস্কৃতিগুলি ছিল মূলত পশুপালন নির্ভর, বোধ হয় জলাভাবের কারণেই সেখানে কৃষির বিকাশ ঘটেনি, যা অন্যত্র ঘটেছিল। সিন্ধু অঞ্চলে এবং সিন্ধু ও দক্ষিণে কর্ণাটকের মধ্যবর্তী মহারাষ্ট্র-সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে যে ব্যাপক কৃষিকাজের প্রচলন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এছাড়া ভূমিতে ব্যবহারোপযোগী হাতিয়ারের বণ্টন

থেকে কৃষির পরিধি বুঝতে অসুবিধা হয়না। ভূমিকুঠার তৈরি হত সচরাচর ডোলেরাইট, ব্যাসাল্ট ও চার্টপ্রস্তর দিয়ে। ফ্লেকিং অথবা পাত-খসানো পদ্ধতির সাহায্যে আকার দেওয়া হত, এবং সর্বশেষে পালিশ করে ধারালো করা হত।

মৃৎশিল্পের ব্যাপক বিকাশ নবাশ্মীয় পর্যায় থেকেই লক্ষ্য করা যায়, তবে গোড়ার দিকে চক্রের পরিবর্তে হস্তনির্মিত মৃৎপাত্রের নিদর্শন বেশি পাওয়া যায়। আসামে দেওজালি-হাডিং-এ একজাতীয় হস্তনির্মিত মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলি অমসৃণ ও বাইরের দিক থেকে দাগ টেনে যেগুলিতে নকশার কাজ করার চেষ্টা হয়েছে। কাশ্মীরের নবাশ্মীয় বুর্জাহোম থেকে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রসমূহ ধূসর, হরিদ্রাভ অথবা কৃষ্ণবর্ণের। এগুলি ওজনে ভারী এবং সঠিকভাবে অগ্নিপক্ক নয়। তুলনায় দক্ষিণের নবাশ্মীয় কেন্দ্রগুলিতে, বিশেষ করে উৎনুর ও পিকলিহালে কিছুটা উন্নত ধরনের হস্তনির্মিত মৃৎপাত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। নবাশ্মীয় পর্যায়ে ললিতকলা বিকাশের পরিচয় মোটামুটি তিনটি ক্ষেত্র থেকে পাওয়া যায়—পাত্র-অলংকরণ, পর্বতগাত্রে চিত্রাংকণ ও পোড়ামাটির মূর্তি নির্মাণ। প্রাক্-হরপ্পীয় বালুচিস্তানের নানা কেন্দ্রে পাত্রসমূহের দেহে জ্যামিতিক নকশা ও পশুপাখি বৃক্ষপুষ্পাদির চিত্রণের সূত্রপাত নবাশ্মীয় অধ্যায় থেকে, যদিও সেগুলির চূড়ান্ত বিকাশ তাম্রাশ্মীয় পর্যায়ে ঘটেছিল। দক্ষিণে কুপগল, মাস্কি, পিকলিহাল প্রভৃতি স্থানে পর্বতগাত্রে নবাশ্মীয় অধ্যায়ে অঙ্কিত চিত্রাদির পরিচয় পাওয়া যায়। ছবির বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে পশুরই প্রাধান্য অধিক। বালুচিস্তানের নানাস্থানে প্রাপ্ত পোড়ামাটির বৃষ এবং মাতৃকামূর্তি ও চিরান্দের সর্পমূর্তি প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় দেয়। বস্তুত, পৃথিবীর নানাস্থানেই নবাশ্মীয় অধ্যায়ে মাতৃকা উপাসনার বিকাশ দেখা যায়। এই উপাসনার মূলে উর্বরতামূলক জাদু বিশ্বাসের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান ছিল, যে বিশ্বাস আদিম কৃষিভিত্তিক জীবনধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার মূল কথা প্রাকৃতিক ও মানবিক ফলপ্রসূতা একই সূত্রে গ্রথিত, এবং মাতৃকাদেবী তারই প্রতীক। বৃষমূর্তির সঙ্গে কৃষিজীবনের সম্পর্ক খুবই সুস্পষ্ট। সর্প-পূজার পিছনে সর্পভয়, সর্পের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস ও প্রজননমূলক ধ্যানধারণা ক্রিয়াশীল ছিল।

প্রাক্-হরপ্পীয় বালুচিস্তানের আটটি সংস্কৃতিকেন্দ্র থেকে সমাধির পরিচয় পাওয়া যায় যেগুলি হল উত্তরে পেরিয়ানো ঘুণ্ডাই, মুঘল ঘুণ্ডাই ও ডাবর-কোট এবং দক্ষিণে নাল, কুল্লী, মেহী, শাহীটুম্প ও সুতকাগেনদোর। বালুচিস্তানে মৃতদেহ দাহ করার রীতিও ছিল যার

প্রমাণ এতদঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত ভস্মাধার থেকে পাওয়া যায়। আংশিক ও পূর্ণ উভয় ধরনেরই সমাধির প্রচলন ছিল। পূর্ণ সমাধির ক্ষেত্রে আগাগোড়া শায়িত ভঙ্গীর পরিবর্তে উপবিষ্ট ধরনের ভঙ্গীরই অধিক প্রচলন ছিল। প্রদত্ত সামগ্রীর ক্ষেত্রে মৃৎপাত্র, ধাতব হাতিয়ার (তাম্রাশ্মীয় পর্যায়ে) ও পাথরের উপকরণের পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েক ক্ষেত্রে মৃতদেহ কোন দূরবর্তী স্থানে কিছুকাল ফেলে রাখার পর যে সকল অস্থি অবশিষ্ট থাকে অথবা দাহ করার পর যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, তা কোন আধারে রেখে সমাধিস্থ করা হত। বালুচিস্তানের সমাধিক্ষেত্রগুলি বসতি এলাকর বাইরে ছিলনা। দক্ষিণের নবাশ্মীয় (পরে তাম্রাশ্মীয়) কেন্দ্রগুলির মধ্যে নাগার্জুনিকোণ্ডা পালাভোয়, পিক্লিহাল, তেক্কলকোটা, ব্রহ্মগিরি, হাল্লুর, টি.-নরসিপুর, তেরডাল, কোভল্লি, প্রভৃতি স্থান থেকে সমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সকল কেন্দ্রে আংশিক ও পূর্ণ উভয় ধরনের সমাধিপ্রদানের রীতিই বর্তমান। পাত্রসমাধিরও ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায়। সমাধিতে সামগ্রীদানেরও রীতি পরিলক্ষিত হয়। আরও একটি বিশেষ ধরনের সমাধিপ্রদানের রীতি পাওয়া গেছে, বিশেষ করে নাগার্জুনিকোণ্ডায়, যেখানে কয়েকজনের দেহাবশেষকে একটি দেহের মাপমত সাজিয়ে কবর দেওয়া হয়।

প্রাক্‌-হরপ্পীয় বসতিসমূহ

বালুচিস্তানে আবিষ্কৃত উল্লেখযোগ্য প্রাক্‌-হরপ্পীয় সংস্কৃতিগুলি হল উত্তরের কোয়েটা অঞ্চলে কিলিগুল মুহম্মদ (চার পর্যায়) ও ডাম্ব সাদৎ (তিন পর্যায়), লোরালাই উপত্যকায় রানা ঘুণ্ডাই (উপপর্যায় সহ চারটি প্রধান পর্যায়), ঝোব উপত্যকায় পেরিয়ানো ঘুণ্ডাই (তিন পর্যায়), মধ্য অঞ্চলের আঞ্জীরা (পাঁচ পর্যায়), দক্ষিণের কুল্লী-মেহী ও নাল-নান্দারা, এবং গোমাল উপত্যকায় গুমলা ও হাথালা, যেগুলির কালানুক্রম মোটামুটি ৩৫০০ থেকে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে।

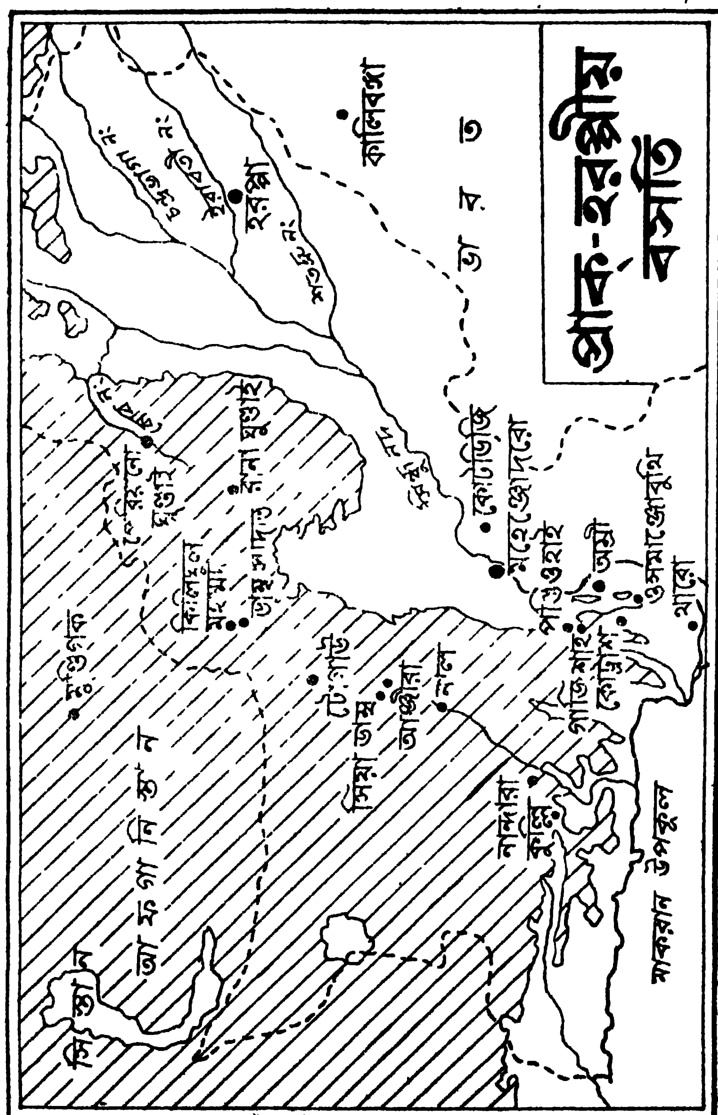
উপরিউক্ত সংস্কৃতিগুলির ক্ষেত্রে কয়েকটি বিবর্তনধর্মী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়, যেমন গ্রাম্য দশা থেকে ইষ্টকনির্মিত আবাসব্যবস্থায়, অর্থাৎ নাগরিকতায় রূপান্তর; হস্তনির্মিত মৃৎপাত্র থেকে চক্রনির্মিত, ক্ষেত্রবিশেষে রঙের দ্বারা চিত্রিত, মৃৎপাত্রশিল্পে রূপান্তর; অমসৃণ পাতনির্মিত ফলা-শিল্প থেকে চার্টপ্রস্তর নির্মিত সূক্ষ্ম, ধারালো ফলা-শিল্পে রূপান্তর; এবং হাতিয়ারগত কলাকৌশলের ক্ষেত্রে প্রস্তর থেকে তাম্র, এবং ব্রোঞ্জ থেকে লৌহে রূপান্তর। এই সকল সংস্কৃতিতে মৃতদেহ সমাধিস্থ করার কয়েকটি পদ্ধতির এবং দেহ বা দেহাবশেষের সঙ্গে নানা প্রকার সামগ্রী দেবার রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রদত্ত সামগ্রীসমূহের মধ্যে তামার হাতিয়ার ও উপকরণ, আধা-দামী পাথরের গহনাপত্র, মৃৎপাত্র এবং তামা অথবা ব্রোঞ্জ নির্মিত দর্পণের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া পোড়ামাটির বৃষ ও মাতৃকামূর্তির কথাও উল্লেখ্য। মাতৃকামূর্তি ঝোব উপত্যকা ছাড়াও কুল্লী ও মেহীতে এবং গুমলা ও হাথালায় পাওয়া গেছে। সম্ভবত ভূমির উর্বরতা, ফলপ্রসূতা ও মানবীয় প্রজনন রহস্যের আদিম নানা ধারণার সঙ্গে এই মাতৃকামূর্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ছিল।

বালুচিস্তানের সংস্কৃতিগুলির প্রকৃতি পর্যালোচনা করে প্রত্নতত্ত্ববিদরা এই অঞ্চলের মানবিক জীবনযাত্রার অগ্রগতি ও বিবর্তনের পাঁচটি পর্যায় লক্ষ্য করতে সমর্থ হয়েছেন। (১) উত্তর-পূর্ব ইরান থেকে পশুপালক ও কৃষিজীবী মানুষদের এই অঞ্চলে আগমন ও বসতিস্থাপন; (২) পূর্বদিক, বিশেষ করে সিন্ধু অঞ্চল থেকে আগত প্রভাবের ফলে এতদঞ্চলে স্থানীয় সংস্কৃতিসমূহের বিকাশ; (৩) উত্তরে কোয়েটা থেকে দক্ষিণে লাসবেলা এবং পশ্চিমে মাকরান উপকূল থেকে পূর্বে ক্ষীরথর পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় হরপ্পা সভ্যতার প্রসার; (৪) হরপ্পা সভ্যতার অবক্ষয় এবং তৎস্থলে আগন্তুক অথবা উদ্ভুত সংস্কৃতিসমূহের বিকাশ; এবং (৫) খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে

সাসানীয়দের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত গড়ে ওঠা সংস্কৃতিসমূহ, যেগুলির প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এখনও সুদূরপরাহত।

কিলিগুল মুহম্মদ, আঞ্জীরা, শিয়া ডাম্ব ও রানা ঘুণ্ডাই-এর প্রথম যুগে কোন গৃহাদির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। মোটামুটিভাবে ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পর থেকে, অর্থাৎ কিলিগুল মুহম্মদের প্রথম যুগের অবসানের সময়ে, আফগানিস্তান সীমান্তে অবস্থিত মুণ্ডিগকের দ্বিতীয় যুগে এবং ডাম্ব সাদাতে ইষ্টকনির্মিত আবাসের পরিচয় পাওয়া যায়। মুণ্ডিগকের চতুর্থ যুগে প্রতিরক্ষা প্রাকারের আভাস পাওয়া যায় যা নাগরিকতায় উত্তরণের ইঙ্গিতবহ। এই সকল সংস্কৃতির অর্থনীতি যে কৃষিকাজ ও পশুপালন নির্ভর ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় কুল্লী ও ডাম্ব সাদাত-এ প্রাপ্ত কিছু শস্য-পেষক হাতিয়ার থেকে এবং নানা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত পোড়ামাটির বৃষমূর্তি থেকে। রানা ঘুণ্ডাই-এর নিম্নতম সংস্তর থেকে ভেড়া, ছাগল, গাধা এবং গরুর হাড় পাওয়া গেছে। আয়ুধের মধ্যে চার্ট, জ্যাসপার, কালসেদনি প্রভৃতি নির্মিত ফলা-শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলি হরপ্পার দীর্ঘায়ত ফলাশিল্পের পূর্বসূরী। অপরাপর আয়ুধের মধ্যে অস্থিনির্মিত কাটারুনি (অল) উল্লেখযোগ্য। মুণ্ডিগকের প্রথম এবং কিলিগুল মুহম্মদের দ্বিতীয় যুগ থেকেই তাম্রের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। মুণ্ডিগকের যুগানুক্রমিক সংস্তরসমূহ তাম্রের ক্রমবর্ধমান ও বিচিত্রমুখী ব্যবহারের ইঙ্গিত দেয়। প্রাপ্ত সামগ্রীসমূহের মধ্যে হাতল পরাবার গর্তযুক্ত বাইস, কুঠার, বর্শাফলক এবং কাস্তে ধরনের ফলা উল্লেখযোগ্য। ডাম্ব সাদতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগে তাম্রনির্মিত সামগ্রীর নানা অংশ এবং একটি ছোরা পাওয়া গেছে। কুল্লী থেকে পাওয়া গেছে আয়না, পিন ও কুঠার, এবং নাম্বারা থেকে বলয়। নাল থেকে আঠারোটি তাম্রনির্মিত আয়ুধ পাওয়া গেছে যেগুলির মধ্যে বাইস, করাত ও বাটালি জাতীয় অস্ত্র উল্লেখযোগ্য। বালুচিস্তানের প্রাক্-হরপ্পীয় সংস্কৃতিকেন্দ্রসমূহের প্রথম যুগের মৃৎপাত্র একান্তই হস্তনির্মিত, তবে মুণ্ডিগকের প্রথম যুগ এবং কিলিগুল মুহম্মদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগে চক্রনির্মিত মৃৎপাত্রের প্রচলন দেখা যায়। বালুচিস্তানের মৃৎপাত্র প্রসঙ্গে পিগট বলেছিলেন যে উত্তরাঞ্চলের মৃৎপাত্র লোহিতাভ এবং দক্ষিণাঞ্চলে হরিদ্রাভ। কিন্তু এই পার্থক্য বর্তমানে স্বীকার করা হয় না। দ্বিবর্ণ ও বহুবর্ণরঞ্জিত মৃৎপাত্রের ব্যাপক পরিচয় বিভিন্ন কেন্দ্রে পাওয়া যায়। বালুচিস্তানের প্রাক্-হরপ্পীয় মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রে এলাকাগত পার্থক্য থাকলেও সাধারণভাবে এগুলি ওজনে হাল্কা, আকার ও রঙের দিক থেকে এগুলির ক্ষেত্রে আফগানী এবং ইরানীয় প্রভাব

কেউ কেউ লক্ষ্য করে থাকেন। সমাধিসমূহের কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হয়েছে।



সিন্ধু প্রদেশের আমরীতে বিভিন্ন স্তরে উপপর্যায়যুক্ত পাঁচটি সাংস্কৃতিক পর্যায় আবিষ্কৃত হয়েছে যথা প্রাক্-হরপ্পীয়, হরপ্পীয়, প্রধান হরপ্পীয়,

বঙ্গর ও ইসলামীয়। প্রাক্-হরপ্পীয় পর্যায়টি চারটি উপপর্যায়ে বিভক্ত, প্রথমটিতে গৃহাদির চিহ্ন নেই তবে হস্ত ও চক্রনির্মিত, অনেকক্ষেত্রে ক্রীম রঙের এবং জ্যামিতিক নকশা-শোভিত মৃৎপাত্র, কিছু তামার উপকরণ, চার্ট পাথরের ফলা, পাথরের বল, কড়ি ও পোড়ামাটির তৈরি অলংকারের অংশ প্রভৃতি পাওয়া গেছে। দ্বিতীয়টিতে অসম মাপের ইটের তৈরি আবাসের অংশ, পাত্রাধারে দেহাবশেষ, বাদামী রঙের ত্রিভুজের নকশা আঁকা মৃৎপাত্র ও তৎসহ কুম্ভ বা লোটার নিদর্শন, তৃতীয়টিতে পরিকল্পিত আবাসের এবং চক্রনির্মিত চিত্রিত মৃৎপাত্রের নিদর্শন এবং চতুর্থটিতে বৃহদায়তন গৃহ, দুরকম রঙের মৃৎপাত্র এবং চিত্রিতকরণের কাজে পশুপাখির ছবির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী দুটি পর্যায় আগাগোড়াই হরপ্পীয় উপাদান বহন করে। অম্রীর প্রাক্-হরপ্পীয় মৃৎপাত্রসমূহ হাল্কা লোহিত অথবা পাটল বর্ণের এবং অলংকরণযুক্ত।

সিন্ধুপ্রদেশের খইরপুর শহরের নিকটবর্তী কোট-ডিজিতেও প্রতিরক্ষা-প্রাকার, সুবিন্যস্ত পথ ও গৃহাদি, গণ-অগ্নিক্ষেত্র, উন্নতমানের চক্রনির্মিত মৃৎপাত্র, প্রস্তর ও তাম্র-ব্রোঞ্জের হাতিয়ার ও উপকরণ, পোড়ামাটির খেলনা, মূর্তি, বল প্রভৃতি সমন্বিত একটি প্রাক্-হরপ্পীয় নগরের সন্ধান পাওয়া গেছে। বস্তুত লিখনপদ্ধতি বাদ দিয়ে কোট-ডিজি সংস্কৃতি প্রায় হরপ্পার কাছাকাছি। এখানে হরপ্পীয় বসতিও আবিষ্কৃত হয়েছে যেখানে পরিপক্ক হরপ্পীয় নিদর্শনসমূহের, এমনকি সীলে উৎকীর্ণ চিত্রলিপি ও মাতৃকামূর্তির নজীর আছে। সম্ভবত এখানকার প্রাক্-হরপ্পীয় বসতি হরপ্পীয়গণ কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং সেই ধ্বংসস্তূপের উপর হরপ্পীয়রা নিজস্ব বসতি গড়ে তুললেও, তারা কোট-ডিজির প্রাক্-হরপ্পীয় সংস্কৃতির অনেক কিছুই আত্মসাৎ করেছিল। রেডিও-কার্বন তারিখ অনুযায়ী কোট ডিজির বিকাশকাল ২৬০০-২২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। কোট-ডিজির প্রাক্-হরপ্পীয় বসতিকে নগর বলতে আপত্তি নেই। গৃহাদির ভিত্তি প্রস্তরনির্মিত, উপর দিকের গাঁথনির ক্ষেত্রে ইটের ব্যবহার দেখা যায়। প্রতিরক্ষা প্রাকারের উচ্চতা কোন কোন স্থানে বারো থেকে চোদ্দ ফুট। দৈর্ঘ্যের যেটুকু অংশ পাওয়া গেছে তা প্রায় ১০৮ ফুট। কোট-ডিজির মৃৎপাত্র হাল্কা, সুমসৃণ কাদা দিয়ে চক্রের সাহায্যে নির্মিত, মূল রং পাটল থেকে লোহিতাভ। বেড়সমূহের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রঙের প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়। আদি পর্যায়ের পাত্রগুলি কাঁধ ও কানাহীন। পরবর্তী পর্যায়ে সাদা কালো অলংকরণ দেখা যায়। পাথরের শস্যপেষক আয়ুধ এবং সুমসৃণ বল এখানকার বিশেষত্ব। প্রথম সংস্তর থেকে একটি তাম্রনির্মিত বলয় পাওয়া গেছে। পুঁতি ও পোড়ামাটির অলংকার,

পোড়ামাটির বল ও পিণ্ড এখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। কোট-ডিজির প্রাক্-হরপ্পীয় বসতি যে অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল সেরকম ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

উত্তর রাজস্থানের গঙ্গানগর জেলায় অবস্থিত কালিবঙ্গায় প্রাক্-হরপ্পীয় ও হরপ্পীয় উভয় সংস্কৃতিরই বিকাশ দেখা যায়। এখানকার প্রাক্-হরপ্পীয় বসতিতে পাঁচটি সংস্তর দেখা যায়। ইষ্টকনির্মিত গৃহ ছাড়াও প্রতিরক্ষা-প্রাকারের নিদর্শন পাওয়া যায়, তবে প্রাকৃতিক অথবা মানবিক শত্রু কার বিরুদ্ধে এই প্রতিরক্ষাব্যবস্থা তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। ইষ্টকনির্মিত গৃহসমূহ গলির দ্বারা পরস্পর পৃথকীকৃত। এখানে একটি প্রাক্-হরপ্পীয় অথচ পোড়া ইটের ড্রেন পাওয়া গেছে। একটি গৃহে অনেকগুলি উনানের চিহ্ন বর্তমান। পাথরের ফলা শিল্প, চুনাপাথর ও আধা দামী পাথরে নির্মিত নানা উপকরণ, তামার তৈরি কিছু সামগ্রীরও নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখানে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রসমূহ আকার ও বর্ণ উভয় দিক থেকেই হরপ্পীয় মৃৎপাত্রের সঙ্গে সম্পর্কহীন। কালিবঙ্গার প্রাক্-হরপ্পীয় মৃৎপাত্র চক্রনির্মিত, হাল্কা, লোহিতাভ থেকে পাটল বর্ণের, কালো রঙের দ্বারা চিত্রিত, জ্যামিতিক বা প্রাকৃতিক অলংকরণ সহ। অমলানন্দ ঘোষ কালিবঙ্গার প্রাক্-হরপ্পীয় মৃৎশিল্পকে সোথি সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত করেন, কেননা ঘগ্গরের উপনদী চৌতাঙ্গের তীরে সোথি নামক স্থানে এমন একজাতীয় মৃৎপাত্রের নিদর্শন পাওয়া গেছে যা কালিবঙ্গা মৃৎপাত্রেব অনুরূপ। তিনি সোথি মৃৎশিল্পের সঙ্গে ঝোব, কোয়েটা, মধ্য বালুচিস্তান ও আফগানিস্থানের মৃৎশিল্পের তুলনা করেন। তাঁর মতে এই বিশেষ ধরনটির বিকাশ অন্য যে কোন প্রাক্-হরপ্পীয় ধরনের তুলনায় অধিকতর ব্যাপক এবং তা মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা ও কোট-ডিজির আদি পর্যায়ের মৃৎশিল্পের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। কালিবঙ্গায় প্রাক্-হরপ্পীয় সংস্কৃতির কালসীমা মোটামুটি ২৩৭০ থেকে ২১০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের মধ্যে। ১৯৬৮তে মিটাথলে খননকার্যের ফলে সরস্বতী অববাহিকায় প্রাক্-হরপ্পীয় থেকে হরপ্পা-উত্তর সংস্কৃতির বিকাশের স্তরবিন্যস্ত নিদর্শন পাওয়া যায়। মিটাথলের প্রথম পর্যায়ের মৃৎশিল্পের সঙ্গে কালিবঙ্গার প্রথম যুগের মৃৎশিল্পের সাদৃশ্য এবং পার্থক্য উভয় বিষয়ই পরিলক্ষিত হয়। মিটাথলের মৃৎপাত্রসমূহ বেশ দৃঢ়ধরনের যেখানে চিত্রিত নক্শা বিরল, এবং নক্শার মধ্যে সাদা রং অনুপস্থিত। হরিয়ানার অন্তর্গত হিসার থেকে ২৬ কি.মি. দূরে অবস্থিত শিসওয়ালে কালিবঙ্গা ও মিটাথল উভয়েরই প্রথম যুগের মৃৎশিল্পের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখানকার প্রথম পর্যায়ের দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম সংস্তরে কালিবঙ্গার প্রথম যুগের অনুরূপ মৃৎসামগ্রীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

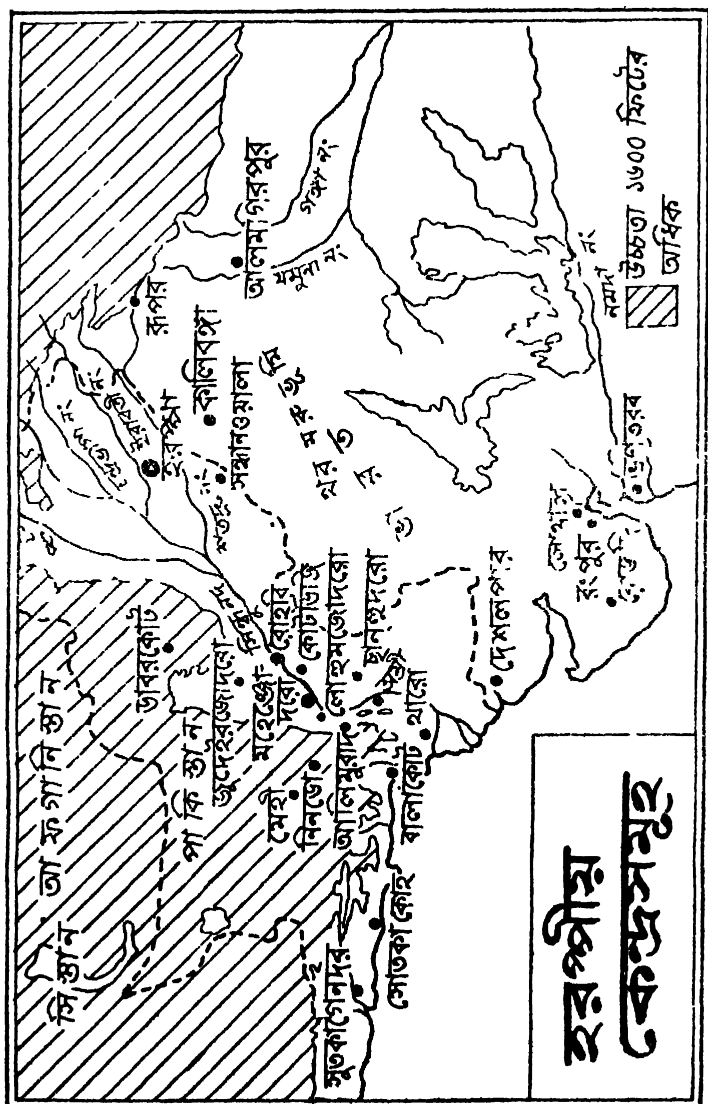
হরপ্পা সভ্যতা

কেন্দ্রসমূহ ঃ হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কারের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হরপ্পা সভ্যতার যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল পাঞ্জাবে, সিন্ধুপ্রদেশে ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তা থেকে জন মার্শাল অনুমান করেছিলেন যে এই সভ্যতার পরিধি আরও বিস্তৃত ছিল। ১৯৪৭-এ হুইলার বলেন যে আরব সাগরের তীর থেকে হাজার মাইল ব্যবধানের মধ্যে অন্তত ৩৭ জায়গায় হরপ্পা সভ্যতার পরিচয় পাওয়া গেছে। ১৯৫০-এ পিগট হরপ্পার বিস্তৃতি হিসাবে মাকরান, কাথিয়াবার ও উত্তর হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত ৯৫০ × ৭০০ × ৫০০ মাইল মাপের একটি ত্রিভূজের কল্পনা করেন যার মধ্যে অন্যূন ৪০টি গ্রাম ও নগরের ধ্বংসাবশেষ থেকে একই ধরনের নানা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। ১৯৫৪-তে চাইলড্ বলেন যে হরপ্পা সভ্যতার বিস্তৃতি 'প্রাচীন সাম্রাজ্য যুগের' মিশরের প্রায় দ্বিগুণ এবং সুমের আক্কাদ সভ্যতার চারগুণ ছিল। এ পর্যন্ত এই সভ্যতার আবিষ্কৃত কেন্দ্রের সংখ্যা ৭০টির বেশি। এই সভ্যতার পরিধি সিন্ধুনদের উপত্যকা ছাড়িয়ে আরও নানাস্থানে বিস্তৃত হবার দরুন সাবেকি 'সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা' না বলে প্রথম আবিষ্কৃত কেন্দ্রের নামানুসারে এই সভ্যতার নামকরণ হয়েছে 'হরপ্পা সভ্যতা'।

পশ্চিমে এই সভ্যতার বিস্তৃতি ছিল ইরান সীমান্তের ৪০ কি. মি. আগে সুতকাগেনদোর পর্যন্ত এবং পূর্বে দিল্লীর নিকটবর্তী আলমগিরপুর পর্যন্ত। পশ্চিম থেকে পূর্বের দূরত্ব ১৫৫০ কি.মির কাছাকাছি। উত্তরে আম্বালা জেলার অন্তর্গত রূপর থেকে দক্ষিণে কিম নদীর উপর ভগতরব পর্যন্ত এই সভ্যতার দুই কেন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ১১০০ কি.মি.। সম্প্রতি জম্মুর ২৮ কি.মি পশ্চিমে মান্দা নামক স্থানে হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এই সভ্যতার উত্তর দিকের সীমা আরও প্রসারিত হয়েছে। দক্ষিণেও অধিকতর প্রসার দেখা যায় তাপ্তীর তীর পর্যন্ত যেখানে মালভান ও জোখা নামক স্থানদ্বয়ে ছোট হরপ্পীয় বাণিজ্যকেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া গেছে।

বালুচিস্তানের সীমান্তবর্তী হরপ্পীয় কেন্দ্রসমূহের মধ্যে মাকরান উপকূলে সুতকাগেনদোর এবং সোতকা-কোহ্ উল্লেখযোগ্য। এই দুটি হরপ্পীয় বসতি সম্ভবত নৌবাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। উত্তর বালুচিস্তানের লোরালাই উপত্যকায় ডাবরকোটে হরপ্পা সভ্যতার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। সিন্ধু-প্রদেশে মহেঞ্জোদরো ছাড়া সিন্ধুর দক্ষিণ তীরে অম্রী এবং বামতীরে

ছানহ্‌দরো ও তৎসহ খইরপুর শহরের নিকটবর্তী কোট-ডিজি উল্লেখযোগ্য হরপ্পীয় কেন্দ্র। সম্প্রতি জাকোবাবাদের ৩০ কি. মি. উত্তরে জুদেইরো-দরোতে



হরপ্পীয় কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আলিমমুরাদও একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। পাঞ্জাবের ভারতীয় অংশে রুপর, বারা ও সালাউরা হরপ্পা সভ্যতার উত্তর

দিকের সীমা নির্দেশ করে। লুধিয়ানা জেলার সাংঘোল এবং তানিলার নিকটবর্তী দাধেরি ও সরায়া-খোটায় হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। হরিয়ানায় বানাওয়ালি, মিটাথল ও রাখিগরহিতে হরপ্পা সভ্যতার কিছু পরিচয় পাওয়া গেছে। হিণ্ডন নদীর তীরবর্তী মীরাট জেলার অন্তর্গত আলমগিরপুরে হরপ্পীয় ও পরবর্তী-হরপ্পীয় বসতির হদিশ মিলেছে। উত্তর রাজস্থানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র কালিবঙ্গা, যেখানে প্রাক-হরপ্পীয় এবং হরপ্পীয় উভয় সংস্কৃতিটা সুনির্দিষ্ট বিকাশ দেখা যায়।

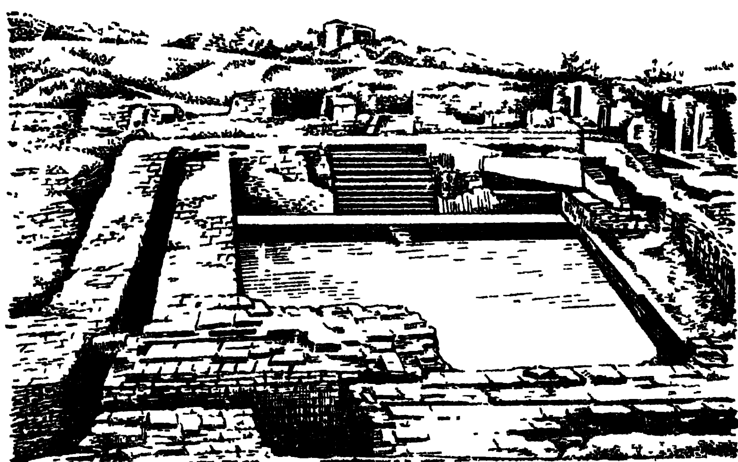
গুজরাত অঞ্চলে হরপ্পীয় বসতির সংখ্যা কম নয় এবং উত্তরের কেন্দ্রগুলির তুলনায় কালসীমার বিচারে সেগুলি কিছুটা অর্বাচীন। অনুমান করা হয় যে হরপ্পীয়রা জলপথে সৌরাষ্ট্রে এবং স্থলপথে সিন্ধু থেকে কচ্ছের নানা কেন্দ্রে প্রবেশ করে। আমেদাবাদ জেলার সারাগওয়ালার নিকটবর্তী লোথালে এবং সুরেন্দ্রনগর জেলার রংপুরে খননকার্যের ফলে প্রাক্-হরপ্পীয়, পরিপক্ক হরপ্পীয় এবং অবক্ষয়ী হরপ্পীয় এই তিন প্রকার বসতির নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু কিছুটা বিলম্বিত সূত্রপাতের জন্য লোথাল ও রংপুরের প্রাক্-হরপ্পীয় চিত্রটি খুব পরিষ্কার নয়। উপকূলবর্তী বাণিজ্যনগরী হিসাবে লোথালের উৎখনিত কেন্দ্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অপরাপর উৎখনিত কেন্দ্রসমূহের মধ্যে নর্মদার উত্তরতীরে রোজদি, প্রভাস, সোমনাথ, দেশলপার, মেহগম ও চবনেশ্বর এবং দক্ষিণতীরে তেলোদ ও তৎসহ তাপ্তীর উপনদী কিমের উপর ভগতরব এবং তাপ্তীতটে মালভান ও জোখা হরপ্পীয় ও হরপ্পা-উত্তর উপাদান বহন করে। এই বিশাল এলাকার সংস্কৃতিসমূহের মধ্যে একটা অদ্ভুতধরনের সমজাতীয়তা আছে। এই সমজাতীয়তা ব্যাখ্যার প্রয়োজনে কেউ কেউ একটি হরপ্পা সাম্রাজ্যের ধারণা করেন এবং হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরোকে সেই সাম্রাজ্যের যুগ্ম-রাজধানী বলে মনে করেন। এই বিস্তৃত এলাকার মধ্যে অবশ্যই কোন প্রশাসনিক বন্ধন ছিল, কিন্তু অধুনা মনে করা হয় যে গোড়ার দিকে মুষ্টিমেয় কয়েকটি কেন্দ্রেই এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল এবং কালক্রমে হরপ্পীয়রা নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই সভ্যতার এলাকা বৃদ্ধি করে।

সিন্ধুপ্রদেশের আম্রী ও কোট-ডিজিতে এবং বালুচিস্তানের কয়েকটি কেন্দ্রে প্রাক্-হরপ্পীয় বসতির উপর হরপ্পীয় বসতির কথা পূর্বে বলা হয়েছে। কালিবঙ্গায় হরপ্পীয়রা প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে যে প্রাক্-হরপ্পীয় প্রাকারসমূহকে ব্যবহার করেছিল তার প্রমাণ আছে। এখানে প্রাক্-হরপ্পীয় থেকে হরপ্পীয় এবং তৎপরবর্তী পর্যায়গুলির বিশেষ ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরোর নগরব্যবস্থার সঙ্গে কালিবঙ্গার রীতিমত

সাদৃশ্য আছে, যদিও বিস্তৃত জলনিকাশী ব্যবস্থা সেখানে অনুপস্থিত। এখানে একটি সমাধিক্ষেত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে হরপ্পীয় বসতির কাল ২১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পরবর্তী। সিন্ধু-বালুচিস্তানের তুলনায় কালিবঙ্গার মৃৎপাত্রসমূহের ক্ষেত্রে পরবর্তী ভারতীয় ঐতিহ্যের পূর্বলক্ষণ দেখা যায়। লোথালে হরপ্পীয় স্তরে যে শহরের নিদর্শন পাওয়া গেছে তা ছয়টি ব্লকে বিভক্ত, প্রতিটিই ইষ্টকনির্মিত ধাপের উপর গঠিত, এবং চওড়া রাস্তার দ্বারা একটি অপরটির সঙ্গে সংযুক্ত। প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ পথ সহ ইষ্টকনির্মিত জাহাজঘাটার সন্ধান এখানে পাওয়া গেছে, হরপ্পা সভ্যতা বিষয়ে যার গুরুত্ব অপরিসীম। রুপর ও আলমগিরপুরে অবক্ষয়ী হরপ্পা সভ্যতার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। উভয় ক্ষেত্রেই হরপ্পীয় ও হরপ্পা-উত্তর লৌহ উপকরণ সমৃদ্ধ সংস্কৃতির মধ্যে বেশ কিছুটা কালগত ব্যবধান বর্তমান। আলমগিরপুরে শেষ হরপ্পীয় পর্যায়ে পোড়া ইটের আবাস, চক্রনির্মিত মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির পশুপাখির মূর্তি, আধা-দামী পাথরের গহনাপত্র প্রভৃতি পাওয়া গেছে।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরোর নগর পরিকল্পনা: হরপ্পা সভ্যতার সম্যক পরিচিতির জন্য মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা এই দুটি শহরের উপরেই গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমটি উপর্যুপরি সাতবার নির্মিত হয়েছিল, দ্বিতীয়টি আটবার। পরিকল্পনার ক্ষেত্রে উভয় নগরেরই বিস্ময়কব সাদৃশ্য বর্তমান। দুটি নগরই ছিল সুবিন্যস্ত, পথগুলি ছিল সমান্তরাল, চওড়ায় ৯ ফুট থেকে ৩৪ ফুট পর্যন্ত। বড় রাস্তাগুলির সোজাসুজি ও আড়াআড়ি সংযোগ থাকার ফলে সেগুলির অভ্যন্তরে বর্গাকার ও আয়তাকার অনেকগুলি ব্লক গড়ে উঠেছিল। উভয় নগরের বাড়িগুলি ছিল একই মাপের পাকা ইটের তৈরি, সুন্দর না হলেও প্রয়োজনানুগ। সাধারণ বাসগৃহ ছাড়াও সর্বসাধারণের নৈমিত্তিক ব্যবহারের জন্য বৃহৎ অট্টালিকা ছিল, যেগুলিতে রাজকার্য সাধিত হত বা যেগুলি পাবলিক-হল হিসাবে ব্যবহৃত হত। নগর প্রান্তে শ্রমিকদের বস্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। হরপ্পার কেন্দ্রস্থলে ১৬৯ × ১৩৫ ফুট একটি বৃহৎ অট্টালিকার অবশেষ পাওয়া যায় যেটিকে শস্যাগাররূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি দুটি ব্লকে বিভক্ত, মধ্যে ২৩ ফুট ব্যবধান, দুটি ব্লকের প্রত্যেকটিতেই ছয়টি করে হলঘর ও পাঁচটি করে বারান্দা বর্তমান। প্রতিটি হল আবার চারভাগে বিভক্ত। মহেঞ্জোদরোর কেন্দ্রস্থলে ১৮০ ফুট লম্বা ও ১০৮ ফুট চওড়া স্নানাগার আবিষ্কৃত হয়েছে। মূল সরোবরটি ৩৯ ফুট লম্বা, ২৩ ফুট চওড়া ও ৮ ফুট গভীর যার চারদিকে ছিল ঘেরা বারান্দা এবং জলে নামার উপযুক্ত সোপানশ্রেণী। দুটি নগরেই কোন দেবায়তন পাওয়া যায়নি, এবং

প্রথম দিকের খননকার্য কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পরিচয় দেয়নি। পরবর্তী-কালে হরপ্পায় পুনরায় খননকার্য চালিয়ে প্রতিরক্ষা প্রাকার এবং দুর্গের চিহ্ন পাওয়া গেছে। সাধারণ ভূ-স্তর থেকে ৫০ ফুট উপরে হরপ্পার পশ্চিমদিকে একটি ঢিবির উপর প্রতিরক্ষাব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। দুটি নগরেরই একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল উত্তম ড্রেন বা জলনিকাশী ব্যবস্থা। প্রতিটি বড় রাস্তার নিচে এমনকি অধিকাংশ গলিতেও এক থেকে দুই ফুট গভীর ঢাকা নর্দমা ছিল, যেগুলির কোন কোন অংশ ছিল গভীরতর, যেখানে জলবাহিত আবর্জনা জমত, যা মাঝে মাঝে তুলে ফেলা হত। এই নর্দমাগুলির সঙ্গে গৃহাভ্যন্তরস্থ স্নানাগারগুলির সংযোগ ছিল। দৃশ্যতই হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরো নগর দুটি ছিল ঘন বসতিপূর্ণ, তবে সযত্ন নগর-পরিকল্পনা,



মহেঞ্জোদরোর স্নানাগার

পর্যাপ্ত জলসরবরাহ ও সুদক্ষ জলনিকাশী ব্যবস্থার নিদর্শন দেখে মনে হয় যে হরপ্পীয়গণ উন্নত পৌরচেতনার অধিকারী ছিল। হরপ্পার সমাজ ছিল শ্রেণীবিভক্ত যা স্পষ্টতই ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রমাণিত হয়। অভিজাত ও সমৃদ্ধিশালী লোকদের সাদৃশ্য প্রাসাদসমূহ যেমন দেখা গেছে, তেমনই দেখা গেছে নগরীর উপকণ্ঠে শ্রমিকদের বস্তি। অর্থাৎ আধুনিক যুগের রাষ্ট্রব্যবস্থার যে লক্ষণসমূহ বর্তমান, হরপ্পা সভ্যতায় তার সবগুলিই ছিল, এবং সেই অর্থে এটা ছিল 'আদিম আধুনিক রাষ্ট্র' এবং ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম রাষ্ট্রশক্তি।

নিদর্শনসমূহে প্রতিফলিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন: হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরোর নগর-পরিকল্পনা থেকে প্রতিভাত হয় যে এই রকম

নাগরিক সভ্যতা উন্নততর খাদ্য উৎপাদন, ব্যাপক বাণিজ্য এবং বিস্তৃত যোগাযোগব্যবস্থা ব্যতিরেকে সম্ভবপর নয়। উৎপাদিত শস্যের মধ্যে গম, যব, নানাধরনের কলাই ও তৈলবীজ, খেজুর প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া নানা ধরনের পশুমাংসও খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হত। গরু, মহিষ, ভেড়া, শূকর ও উটের কঙ্কাল হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত সীলসমূহে অঙ্কিত বৃষমূর্তি গো-জাতীয় জীবের ব্যাপক অস্তিত্বের পরিচায়ক। এছাড়া প্রাপ্ত খেলনাগুলি থেকে মহিষ, গণ্ডার, ব্যাঘ্র, বানর, ভল্লুক, কুকুর, গাধা ও নানাবিধ পাখির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব নিদর্শন থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে উল্লিখিত নগরদ্বয়ের সঙ্গে অসংখ্য গ্রামের যোগাযোগ ছিল যেগুলিতে কৃষিকাজ ও পশুপালন করা হত। গ্রামগুলির পিছনে কিছু বনাঞ্চলও ছিল। বস্তুত অত্যন্ত সুবিস্তৃত কৃষিকাজের পটভূমিকা ব্যতিরেকে এই সভ্যতার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। খাদ্য-উৎপাদনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থেকে বহুসংখ্যক মানুষ মুক্তি না পেলে নগরজীবন গড়ে তোলা সম্ভবপর নয়। নগরবাসী বলতে শাসক সম্প্রদায়, পুরোহিত, সওদাগর, দোকানদার, কারিগর ও শ্রমিকদের বোঝাত।

কাপড় বোনার যে প্রচলন ছিল তা প্রাপ্ত কয়েকটি মাকু থেকেই বোঝা যায়। পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে প্রাপ্ত মূর্তিগুলির সাক্ষ্য থেকে অনুমিত হয় যে উর্ধ্বাঙ্গ ও নিম্নাঙ্গ আবরণ করার জন্য দুটি বস্ত্র ব্যবহার করা হত। বর্তমানে যেভাবে শাল ব্যবহার করা হয় সেভাবেই বাহুর পাশ দিয়ে উত্তরীয় পরার রীতি ছিল। স্ত্রী ও পুরুষদের বেশভূষার খুব একটা পার্থক্য ছিল না। তাঁতবস্ত্র এবং পশমের বস্ত্র দুই-ই ব্যবহার করা হত। প্রাপ্ত মূর্তিগুলি থেকে কেশবিন্যাসের ধরন বুঝতে অসুবিধা হয় না। মেয়েরা যে জাতীয় অলংকার ব্যবহার করত তারও পরিচয় প্রাপ্ত নর্তকী মূর্তি থেকে পাওয়া যায়। তাছাড়া সোনা, রূপা, তামা এবং দামী ও আধা-দামী ঝকমকে পাথরের অলংকারের বহু নিদর্শন উভয় নগর থেকেই পাওয়া গেছে। হাতের চুড়ি, বালা, আংটি, কানের দুল, গলার হার, কোমরের চন্দ্রহার, পায়ের নূপুর সব কিছুরই নিদর্শন পাওয়া গেছে। এছাড়া পাখার মত দেখতে এক ধরনের মস্তকাভরণও ব্যবহৃত হত। তামা বা ব্রোঞ্জ নির্মিত দর্পণ ও ক্ষুর, হাতির দাঁতের নির্মিত চিরুণী প্রভৃতিরও নিদর্শন পাওয়া গেছে।

গৃহস্থালী দ্রব্যের মধ্যে কাংসনির্মিত উপকরণসমূহ ছাড়াও নানা ধরনের এবং নানা আকারের মৃৎপাত্রের ব্যবহার ছিল যেগুলির অজস্র নিদর্শন পাওয়া গেছে। মৃৎপাত্রের অধিকাংশই ছিল সাধারণ প্রয়োজনভিত্তিক। ধাতব ছুঁচ, করাত, ছুরি, বড়শি প্রভৃতিরও সন্ধান পাওয়া গেছে। ওজন ও



মহেঞ্জোদরোতে আবিষ্কৃত অলঙ্কার, সীলমোহর, মৃৎপাত্র, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি।

মাপের পরিচায়ক নানা ধরনের সামগ্রীর পরিচয় পাওয়া গেছে, এমনকি দাঁড়িপাল্লারও। মাটির বাতিদানের উপর মোমবাতি জ্বালিয়ে গৃহ আলোকিত করা হত। এছাড়া প্রদীপও ছিল বহুপ্রচলিত। ধাতব প্রদীপেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। চেয়ার, চৌকি, টুল ও মাদুরের ব্যবহারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। খেলাধুলার জন্য গোলাকার মার্বেল, পাথরের বল ও একজাতীয় পাশার অস্তিত্বও লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়া খেলনা গরুর গাড়ির নিদর্শনও পাওয়া যায় যা থেকে বোঝা যায় যে বৃহত্তর পরিবহনের ক্ষেত্রেও গো-যানের বা পশুবাহিত যানেব ব্যবহার ছিল। কতিপয় সীলে তীর ধনুক সহ শিকারের দৃশ্য দেখা যায়, যা থেকে অনুমিত হয় অবসর বিনোদনের জন্য শিকার একটি ব্যসন ছিল।

দুই শহর থেকেই নানা ধরনের অজস্র হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। যন্ত্রপাতিগুলির মাপ ও আকার পরবর্তীকালে ভারতীয় যন্ত্রপাতির মাপ ও আকারকে সূচিত করে। তাম্র ও ব্রোঞ্জ প্রধান উপকরণ হলেও পাথর একেবারে পরিত্যক্ত হয়নি, বরং চার্ট পাথরের ফলাশিল্পের বিশেষ বিকাশ ঘটেছিল। তামা অথবা ব্রোঞ্জের তৈরি কুড়াল, বর্শা, ছোরা, তীর, গদা, তরবারি প্রভৃতি হাতিযারের নিদর্শন পাওয়া গেছে। বর্শাফলকগুলি পাতলা এবং চওড়া, এবং মধ্যে কোন বন্ধনী নেই। ছোরা বা ছুরিগুলি পত্রাকার, তরবারিগুলির মধ্যদেশ স্ফীত, কিন্তু মুখাগ্র সুতীক্ষ্ণ নয়। দাঁতাল করাতেরও পরিচয় পাওয়া গেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এই সকল অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়া থেকে প্রাপ্ত হাতিয়ারের সাদৃশ্য দেখাবার বা সম্পর্ক টানার চেষ্টা করেছেন।

ধাতব কারিগরী ঃ হরপ্পার উৎপাদনকেন্দ্রগুলির জন্য নানাস্থান থেকেই কাঁচামাল আসত, এমন কি ভারতের বাইরে থেকেও। তাম্রের ব্যবহারের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় আফগানিস্তানের মুন্ডিগক ও বালুচিস্তানের কিলিগুল-মুহম্মদে। অম্রী, কোট-ডিজি ও কালিবঙ্গার প্রাক্-হরপ্পীয় পর্যায়ে তাম্রের প্রচলন দেখা যায়। শেষোক্ত কেন্দ্র থেকে এমন একটি চওড়া কুড়াল পাওয়া গেছে যা হরপ্পীয় সামগ্রীর সূচনা করে। হরপ্পা সভ্যতায় তাম্রের ব্যবহারের চার রকম প্রকারভেদ দেখা যায়—গন্ধকের উপাদানসহ অপরিশোধিত তাম্র, আর্সেনিক ও অ্যান্টিমনি উপাদানের সামান্য লক্ষণসহ পরিশুদ্ধ তাম্র, দুই থেকে পাঁচ শতাংশ আর্সেনিকের উপাদানসহ সাধারণ ব্যবহৃত তাম্র, এবং ব্রোঞ্জ, যেখানে টিনের খাদের পরিমাণ এগারো থেকে তের শতাংশ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে দক্ষিণের ব্রহ্মগিরিতে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জে টিনের খাদ নয় থেকে ষোল শতাংশ, এবং সর্বাধিক ব্রোঞ্জ-নির্মিত সামগ্রী যেখানে

পাওয়া গেছে সেই আদিত্যনাল্লুরে টিনের খাদের পরিমাণ তেইশ শতাংশ। হরপ্পায় কলস জাতীয় পাত্রাদি মূলত ধাতু পিটিয়ে তৈরি করা হত। পাশাপাশি একটা পাত্রের দুটি অংশ পৃথক ঢালাই করে জুড়ে দেবার রীতিও ছিল। ব্রোঞ্জের খেলনা, মূর্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রে ছাঁচে ঢালাই করার প্রথাই চালু ছিল। হরপ্পা সভ্যতায় নানা ধরনের স্বর্ণালংকারও পাওয়া গেছে। এই সোনা হাল্কা রঙের, কিছুটা রৌপ্য মিশ্রিত, উৎস সম্ভবত কর্ণাটক অঞ্চল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে নবাশ্মীয়-তাম্রাশ্মীয় তেক্কলকোটায় সোনার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেছে। মহারাষ্ট্রের দাইমাবাদের তাম্রাশ্মীয় পর্যায়ে স্বর্ণালংকার পাওয়া গেছে। রৌপ্যের সামগ্রীর নিদর্শনও হরপ্পা সভ্যতায় প্রচুর এবং সম্ভবত এই রৌপ্য ছিল বাইরে থেকে আমদানী করা। হরপ্পা-উত্তর অন্যান্য সংস্কৃতি কেন্দ্রে রূপার ব্যবহার বড় চোখে পড়ে না। তবে গুঙ্গেরিয়ার তাম্র-সঞ্চয় কেন্দ্রে একশোটির মত রূপার বাসন পাওয়া গেছে। সোনা বা রূপার কাজের ক্ষেত্রে বর্তমান স্বর্ণকারদের অনুসৃত পদ্ধতিই কার্যকর ছিল।

লিপি ঃ হরপ্পীয় লিপির পরিচয় পাওয়া যায় সেখানে প্রাপ্ত সীল-সমূহ থেকে। লিপির ধরন দেখে মনে হয় যে তার উদ্ভব চিত্রলিপি থেকে হলেও চিহ্নগুলি নির্দিষ্ট ধ্বনিগত মানের দ্যোতক। এই লিপির প্রধান বৈশিষ্ট্য অক্ষরগুলির স্পষ্টতা। ধ্বনিজ্ঞাপক চিহ্নগুলির সংখ্যা চারশোরও বেশি। হরফগুলির বিন্যাস ডানদিক থেকে বাঁ দিকে। এই লিপির সঙ্গে সুমেরীয়, এলামীয়, হিত্তাইত, মিশরীয়, ক্রীটিয় এবং চৈনিক লিপির সাদৃশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ মনে করেন যে ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব হরপ্পীয় লিপি থেকেই হয়েছিল। এই লিপির পাঠোদ্ধার হয়নি, কোন্ ভাষার লিপি তাও জানা যায়নি। এই লিপি পাঠ করার নানা চেষ্টা হয়েছে, এমনকি কম্পিউটারের ব্যবহারও করা হয়েছে, কিন্তু সম্ভব হয়নি। এই লিপির পাঠোদ্ধার কোনদিনই হবে না যতদিন না পর্যন্ত এমন কোন একটি লেখ আবিষ্কৃত হয় যাতে দুরকম লিপি আছে, এবং এই দুরকম লিপির মধ্যে একটি পরিচিত লিপি হওয়া দরকার।

শিল্পধারা ঃ হরপ্পা সভ্যতায় প্রাপ্ত শিল্পকলার নিদর্শনসমূহের মধ্যে শৈল্পিক সুষমা বা কারুকার্যের চেয়েও ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গীরই বিশেষ প্রকাশ চোখে পড়ে। গৃহগুলির ক্ষেত্রে কোন কারুকার্যের পরিচয় নেই, হাতিয়ার ও অপরাপর উপকরণসমূহ নেহাতই সাদামাটা। মৃৎপাত্রের ক্ষেত্রেও অতি সাধারণ ধরনের অলংকরণ ছাড়া কিছু নেই। হরপ্পার শিল্পগত নিদর্শন হিসাবে মূর্তি, সীল, তাবিজ ও নানাপ্রকার ক্ষুদ্র সামগ্রীর উল্লেখ করা যায়। মৃন্ময় মূর্তিগুলি পোড়ামাটির। মহেঞ্জোদরোতে প্রাপ্ত কোন কোন

মূর্তিতে লাল রঙ দেওয়া আছে, হরপ্পার মূর্তিগুলিতে কোন রঙের ছোঁয়াচ নেই। মনুষ্যমূর্তির অধিকাংশই নারীমূর্তি, কটিদেশে একটি আবরণ ভিন্ন নগ্ন। উভয় স্থান থেকেই অজস্র সীল পাওয়া গেছে যেগুলিতে বৃষ, নানা ধরনের উদ্ভিদ, প্রতীকী পৌরাণিক কাহিনী, পশুপাখি, ত্রিশৃঙ্গ যোগভঙ্গিমায় দেবতার মূর্তি প্রভৃতি নানা জাতীয় বিষয় ও কিছু লিপি উৎকীর্ণ আছে। সীলগুলি সম্ভবত বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত, বেশির ভাগই হয় চুনাপাথরের, না হয় পোড়ামাটির তৈরি। হরপ্পা থেকে দুটি ভাঙা প্রস্তরমূর্তি পাওয়া গেছে, একটি ধূসর বর্ণের এবং অপরটি লাল রঙের। দুটিই পুরুষ দেহ এবং গ্রীক মূর্তির মতই এখানে পেশীগত বৈশিষ্ট্যসমূহের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। দুটি মূর্তির গলদেশে গর্ত আছে যা থেকে বোঝা যায় যে মস্তকাংশটি পৃথক ভাবে জোড়া ছিল। ধূসর বর্ণের মূর্তিটি নৃত্যের ভঙ্গিমায় প্রদর্শিত, ডান পায়ের উপর দণ্ডায়মান, বাম পদটি নৃত্যের ভঙ্গিমায় প্রসারিত, যদিও বর্তমান অবস্থায় তা ভগ্ন। লালরঙের মূর্তিটি দণ্ডায়মান পুরুষমূর্তি, বর্তমানে হাত-পা-মাথা-বিহীন। মহেঞ্জোদরো থেকে প্রাপ্ত চুনাপাথরের তৈরি একটি পুরুষ মূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মূর্তিটির চক্ষুদ্বয় অর্ধনিমীলিত, কপাল থেকে সোজা নেমে আসা দীর্ঘ নাসিকা, চুল ও দাড়ি পরিপাটি করে আঁচড়ানো, এবং অঙ্গে চিত্রিত পরিচ্ছদ। মহেঞ্জোদরো থেকে প্রাপ্ত একটি নর্তকীমূর্তিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি ব্রোঞ্জের তৈরি, বাম হস্তে প্রচুর অলংকার, দক্ষিণহস্ত কটিদেশে ন্যস্ত, দ্বিভঙ্গ ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান। ব্রোঞ্জ নির্মিত সামগ্রীসমূহ, খেলনা হিসাবে ব্যবহৃত জীবজন্তুর মূর্তি, ছোট গাড়ী প্রভৃতি ছাঁচে ঢালাই করা হত এবং এর জন্য বিশেষ উৎপাদনকেন্দ্র ছিল। একই ধরনের জিনিস হরপ্পা ও ছানহুদরোর মত পরস্পর দূরবর্তী স্থান থেকে পাওয়া গেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে জিনিসগুলি কোন বিশেষ কারখানা বা উৎপাদন-কেন্দ্র থেকে তৈরি হত এবং বিভিন্ন নগরে চালান যেত। হরপ্পার মৃৎপাত্র-সমূহ কুম্ভকারের চক্রনির্মিত। সর্বদা ব্যবহারযোগ্য পাত্রগুলি খুবই সাধারণ ধরনের, তবে চিত্রিত মৃৎপাত্রও বর্তমান। সাধারণ ব্যবহার্য মৃৎপাত্র সচরাচর লাল রঙের কাদা দিয়ে তৈরি হত, এবং সেগুলিতে লাল অথবা ধূসরবর্ণের বর্ডার দেওয়া থাকত। চিত্রিত মৃৎপাত্রের ক্ষেত্রে চকচকে কালো রঙের ব্যবহার ছিল, এবং সেগুলি জ্যামিতিক নকশা বা পশুপাখির চিত্র বহন করত। অলংকারে ব্যবহৃত আধা-দামী পাথরের মধ্যে পান্না, নীলকান্ত, ল্যাপিস-লাজুলি, জেড, অকীক, জ্যাসপার, প্লাসমা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য, যেগুলি হার বা মালার দানা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। হরপ্পা সভ্যতায় ব্যবহৃত সোনা

আমদানী হত কোলার ও অনন্তপুর জেলার খনি থেকে। ছাঁচে ফেলে এবং পিটিয়ে পাত তৈরি করে সোনার গহনা তৈরি হত, শক্ত করার প্রয়োজনে কিছু খাদেরও মিশেল থাকত। আফগানিস্তান, পারস্য ও আর্মেনিয়া সম্ভবত রৌপ্যের উৎস ছিল। রৌপ্যবলয়, রুপার কানের দুল প্রভৃতি প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া গেছে। চুনাপাথর, তামা ও সীসা প্রভৃতির জন্য রাজস্থান, দক্ষিণ আফগানিস্তান, বালুচিস্তানের পশ্চিমাঞ্চল, উত্তর ইরানের কারাদাগ প্রভৃতি স্থানের উপর হরপ্পার কারিগরেরা নির্ভরশীল ছিল। আধা-দামী পাথরের উপকরণ আমদানী হত কাথিয়াবার ও রাজপিপলা থেকে, রঞ্জক সামগ্রী পারস্য উপসাগরের হোর্মুজ এবং অপরাপর স্থান থেকে, ল্যাপিস-লাজুলি বাদকশান থেকে।

ধর্মব্যবস্থা : হরপ্পা বা মহেঞ্জোদরো কোন শহর থেকেই কোন দেবায়তনের নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তবে উভয় শহরের ধ্বংসাবশেষ থেকে কিছু মাতৃকামূর্তি, কিছু লিঙ্গজাতীয় প্রতীক এবং অজস্র সীল পাওয়া গেছে যা থেকে সে আমলের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যায়। কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতির কারণেই হয়ত এই অঞ্চলে মাতৃকেন্দ্রিক ধর্মব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। মাতৃকামূর্তিগুলির অধিকাংশই পোড়ামাটির তৈরি, নগ্ন তবে কোমরে একটি আবরণ আছে, অলংকার ও শিরোভূষণসহ। মাতৃত্বসূচক অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ মূর্তিগুলিতে একটু প্রকটভাবে প্রদর্শিত। এই মূর্তি-গুলিরই আর একটু আদিম ধরনের পরিচয় পাওয়া গেছে ঝোব ও কুল্লী উপত্যকায়, মেহী, গুমলা এবং হাথালায় ও মহারাষ্ট্রের ইনামগাঁও-এ। এই মূর্তিগুলির সঙ্গে পশ্চিম এশিয়া ও ইরানে প্রাপ্ত মাতৃকামূর্তিগুলির সাদৃশ্য আছে। হরপ্পা থেকে প্রাপ্ত একটি সীলে একটি নগ্ন নারীমূর্তি অঙ্কিত আছে উত্তানপাদ ভঙ্গীতে, অর্থাৎ মাথা নিচের দিকে এবং প্রসারিত পদযুগল উপর দিকে। একটি চারগাছ এই নারীমূর্তির গর্ভ থেকে নির্গত হয়েছে। সীলে প্রদর্শিত এই বিষয়বস্তু পৌরাণিক শাকম্ভরী উপাখ্যানের সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত বা সাদৃশ্যযুক্ত। ওই সীলেরই অপর পীঠে একটি দেবীমূর্তির সম্মুখে নরবলি দেবার চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। অপর একটি সীলে একটি পিপুলবৃক্ষের দুই শাখার অন্তরালে মাতৃকামূর্তি পরিদৃষ্ট হয়। বৃক্ষোপাসনার বহু নিদর্শন অসংখ্য সীলে বিদ্যমান। কিছু সীলে অদ্ভুত চেহারার নানা জন্তুজানোয়ারের ছবি আছে যেগুলি সম্ভবত ধর্মীয় তাৎপর্য বহন করে। প্রস্তরনির্মিত অজস্র লিঙ্গ ও যোনির প্রতীকের পরিচয় পাওয়া গেছে যেগুলি উর্বরতামূলক যাদুবিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং যেগুলি অবলম্বনে পরবর্তীকালে শিব-শক্তি উপাসনার বিকাশ ঘটেছে। এই বক্তব্য একটি সীলের

সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত হয় যেখানে পশুর দ্বারা সমাকীর্ণ তিনমুখ বিশিষ্ট পুরুষ দেবতার নিদর্শন দেখা গেছে, যিনি যোগাসনে উপবিষ্ট এবং যাঁকে পরবর্তীকালের শিবের আদিপর্যায়ের কোন দেবতারূপে গণ্য করা চলে। একই যৌগিক ভঙ্গী কয়েকটি ভাঙা মূর্তিতেও পাওয়া যায়। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরোর ধর্মবিশ্বাসের নিদর্শনসমূহের পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য থেকে তাই অনুমিত হয় যে ভারতের প্রাচীনতম ধর্মব্যবস্থা মূলত মাতৃকাপূজা, তৎসংশ্লিষ্ট লিঙ্গ ও যোনিপূজা এবং দার্শনিক যৌন-দ্বৈতের ধারণা, অর্থাৎ সৃষ্টির মূলে পুরুষ এবং স্ত্রী আদর্শের সংযোগ (সাংখ্যকথিত পুরুষ-প্রকৃতির ধারণা) এবং যোগসাধনা (যার মূল কথা মানবদেহই বিশ্বপ্রকৃতির সকল রহস্যের আধার) প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। এগুলির কোনটিই কোনটির থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, এবং সেই হিসাবে সামগ্রিকভাবে এগুলির দ্বারা এমন একটি ধর্মীয় ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়েছিল যাকে আমরা আদিম তান্ত্রিক ঐতিহ্য আখ্যা দিতে পারি।

মৃতের সৎকার ও সমাধিক্ষেত্র: দুটি হরপ্পীয় সমাধিক্ষেত্রের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, সিমেট্রি আর ৩৭ এবং সিমেট্রি এইচ। দুটি ক্ষেত্রই ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে হুইলার কর্তৃক পুনরুত্থানিত হয়। প্রথম ক্ষেত্রে সমাধি এলাকার বাইরে 'এ-বি', 'এফ' এবং 'জে' ঢিবি থেকে অনেক হাড়গোড় পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদরো থেকে ৪১টি কংকাল আবিষ্কৃত হয়েছে। আরও তিনটি সমাধিক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে ভাওয়ালপুরের অন্তঃপাতী দেরাওয়ারে, লোথালে এবং কালিবঙ্গায়। মৃতের সৎকারের তিনটি পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়—আসবাবপত্র ও ব্যবহার্য সামগ্রীসহ পূর্ণ সমাধি, আংশিক সমাধি এবং দেহাবশেষের আধার বা পাত্র সমাধি। শেষোক্ত দুই কেন্দ্রে খনন-কার্যের ফলে এই তিনটি পদ্ধতিরই পরিচয় পাওয়া যায়। কালিবঙ্গায় যে পাত্রসমাধির নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে কোন দেহাবশেষের চিহ্ন নেই। লোথালে একটি কবরে পাশাপাশি এক জোড়া কংকাল পাওয়া গেছে, একটি পুরুষের অপরটি নারীর। সমাধিক্ষেত্রগুলি বসতি এলাকার বাইরে হলেও খুব দূরে অবস্থিত ছিলনা। সমাধিগুলি ছিল আয়তাকার, যদিও কালিবঙ্গায় গোলাকার সমাধি পাওয়া গেছে। হরপ্পা সভ্যতার প্রাচুর্যের তুলনায় সমাধিতে প্রদত্ত দ্রব্য সামগ্রীর পরিমাণ নগণ্য। 'সিমেট্রি এইচ' সমাধিক্ষেত্রটি বিশুদ্ধ হরপ্পীয় নয়। সম্ভবত হরপ্পার পতনের পর ওই পরিত্যক্ত অঞ্চলে কোন জনগোষ্ঠী বসতি স্থাপন করেছিল। এখানে সমাধিগুলি দুটি স্তরে পাওয়া গেছে, উপরের স্তরে দেহাবশেষের পাত্রসমাধি, এবং নিচের স্তরে সাধারণ সমাধি, শায়িত অথবা ভঙ্গীযুক্ত। প্রদত্ত দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে মৃৎপাত্র

ও তাম্রের উপকরণ পাওয়া গেলেও সেগুলি হরপ্পীয় সামগ্রীর তুলনায় এতই পৃথক ও নিম্নমানের যে এগুলিকে কোন আগন্তুক এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কোন সংস্কৃতির অন্তর্গত (কেউ কেউ বলেন ইরাবতী সংস্কৃতি) বলে মনে করা হয়। অনেকে এই 'সিমেট্রি-এইচ' সংস্কৃতির মানুষদের আর্য হিসাবে সনাক্ত করতে চান।

বাহির্ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগঃ মহেঞ্জোদরো নগরী আবিষ্কৃত হবার পর মার্শাল পরোক্ষ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অনুমান করেছিলেন যে এই সভ্যতার সঙ্গে ইরান, পশ্চিম এশিয়া ও মিশরের শুধু যে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কই ছিল তা নয়, মিশর থেকে শুরু করে সিন্ধুর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় একটি সমজাতীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। মার্শালের এই অনুমান পণ্ডিতবর্গকে এতদূর প্রভাবিত করেছিল যে তিরিশের দশকে অনেকেই হরপ্পা সভ্যতাকে ইন্দো-সুমেরীয় সভ্যতা বলে ঘোষণা করতে দ্বিধাবোধ করেননি। এই অনুমান কোন কোন ভাষাতত্ত্ববিদকে এমনই উৎসাহিত করেছিল যে তাঁরা বলেছিলেন যে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে দ্রাবিড়ভাষী জনগোষ্ঠী তথাকথিত আর্যদের মতই চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, যারা সুমেরে সুমেরীয় সভ্যতার পত্তন করেছিল এবং ভারতবর্ষে হরপ্পা সভ্যতার। হরপ্পার অবসানের পর তারা দক্ষিণ ভারতে চলে আসে, যদিও উত্তরের কোন কোন স্থানে তারা পরেও বর্তমান ছিল। সে যাই হোক, মিশরের সঙ্গে হরপ্পার যোগাযোগের ব্যাপারে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। তবে ইরান ও মেসোপোটামিয়ার সঙ্গে হরপ্পার বাণিজ্যিক যোগাযোগ যে ছিল তার কিছুটা পরোক্ষ এবং সামান্য কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে।

পরোক্ষ প্রমাণগুলি হচ্ছে হরপ্পায় প্রাপ্ত অজস্র ওজনের বাটখারা, প্রচুর সীল এবং লিপির বহুল ব্যবহার যা একটি বাণিজ্যিক সমাজকে সূচিত করে। হরপ্পা সভ্যতায় কয়েকটি উৎপাদন-কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে যেখান থেকে উৎপাদিত একই ধরনের পণ্যসামগ্রী হরপ্পীয় নগরসমূহে যে পাঠানো হত তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। এগুলি হরপ্পার বাণিজ্যিক সংগঠনগুলির দক্ষতার পরিচায়ক। লোথালের ডক-ইয়ার্ড ও গুদামসমূহ বহির্বাণিজ্যের সূচনা করে। মেসোপোটামিয়া অঞ্চলের প্রাচীন পুঁথিসমূহ থেকে জানা যায় যে আক্কাদের সার্গনের সময়ে এবং পরবর্তীকালে উর-এর বণিকরা তিনটি দেশের সঙ্গে বিশেষভাবে বাণিজ্য করত। এই তিনটি দেশ ছিল তিলমুন (বর্তমান বাহারিন), মাগান (ওমান বা দক্ষিণ আরবের কোন স্থান) এবং মেলুহা (ভারতবর্ষ)। অবশ্য মেলুহার সঙ্গে ভারতবর্ষের সনাক্তকরণের কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয়না। শব্দটি নাকি সংস্কৃত ম্লেচ্ছ বা বর্বর শব্দের

মেসোপোটামীয় প্রতিরূপ। বলা হয়েছে যে মেলুহা থেকে জাহাজ বোঝাই হয়ে কাঠ, তামা, হাতির দাঁত, মণিমুক্তা প্রভৃতি উর-এ আমদানী হত।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে সুসা ও মেসোপোটামীয় নগরসমূহে প্রাপ্ত হরপ্পীয় বা হরপ্পাধর্মী সীলের উল্লেখ করা যায় যেগুলি ওই অঞ্চলে ভারতীয় পণ্যের উপস্থিতির পরিচায়ক। অনুরূপভাবে মহেঞ্জোদরো থেকে মেসোপোটামীয় ধরনের কয়েকটি সীল পাওয়া গেছে। লোথাল থেকে একটি গোলাকার বোতাম ধরনের সীল পাওয়া গেছে যেগুলির বহুল প্রচলন ছিল পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরো থেকে প্রাপ্ত কতিপয় সীলে জাহাজের চিত্র অঙ্কিত আছে। লোথাল থেকে একটি পোড়ামাটির জাহাজের মডেল পাওয়া গেছে। এগুলিকে সমুদ্রযাত্রার মানসিকতার প্রতিফলন বলে গণ্য করা চলে। মোটের উপর এটুকু বলা যায় যে প্রতিবেশী দেশ হিসাবে পারস্য উপসাগর ও ইউফ্রাতেস-তাইগ্রিস নদীবিধৌত অঞ্চলের সঙ্গে হরপ্পার কিছু বাণিজ্যিক যোগাযোগ অবশ্যই ছিল, কিন্তু এ বিষয় বিশদ তথ্য আমাদের হাতে নেই।

হরপ্পা সভ্যতার স্রষ্টা কারা? মহেঞ্জোদরো আবিষ্কারের পর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে অনেকেই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে এই সভ্যতার স্রষ্টা প্রাক্-বৈদিক দ্রাবিড়ভাষী মানুষেরা। তাঁদের বক্তব্য সংক্ষেপে উপরের অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে। মার্শাল তাঁর রিপোর্টে বলেছিলেন যে হরপ্পা সভ্যতা (তখন বলা হত সিন্ধু সভ্যতা) বৈদিক সভ্যতার পূর্ববর্তী এবং প্রকৃতিব দিক থেকে একেবারে পৃথক। এই পার্থক্য দেখাবার জন্য তিনি একটি দীর্ঘ তালিকাও পেশ করেছিলেন। এই তালিকায় তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে হরপ্পা সভ্যতার প্রকৃতি ছিল নগর-কেন্দ্রিক যেখানে বৈদিক সভ্যতা ছিল গ্রামীণ, হরপ্পীয়রা কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল ছিল যেখানে বৈদিক মানুষেরা ছিল পশুপালন নির্ভর, হরপ্পীয়রা পূজা-উপাসনা করত যেখানে বৈদিক মানুষেরা যাগযজ্ঞ করত, হরপ্পায় মাতৃকাদেবী ও লিঙ্গের উপাসনা ছিল যেগুলি বৈদিক মানুষেরা বরদাস্ত করত না, হরপ্পীয়রা অশ্ব ও লোহের ব্যবহার জানত না যেখানে বৈদিক মানুষেরা তা জানত (ঋগ্বেদে অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে লোহের উল্লেখ নেই) ইত্যাদি, ইত্যাদি। দ্রাবিড়-উদ্ভবপন্থীগণ এই সকল হরপ্পীয় বৈশিষ্ট্যকে ষোল আনা দ্রাবিড় বলে গণ্য করেছিলেন এবং প্রাক্-হেলেনীয় ঈজিয়ান সভ্যতার সঙ্গে প্রাক্-বৈদিক দ্রাবিড়ীয় হরপ্পা সভ্যতার ঐতিহাসিক সাদৃশ্য প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন। পক্ষান্তরে ভিন্নমতের পণ্ডিতেরাও নিষ্ক্রিয় ছিলেন না যাঁরা মনে করতেন যে হরপ্পা সভ্যতা বৈদিক

সভ্যতারই অংশ এবং হরপ্পীয়দের ভাষা ছিল বৈদিক বা বৈদিক ধরনের ভাষা। তাঁদের মতে প্রথমত, মার্শাল হরপ্পীয়দের যে বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রাক্-বৈদিক বা অবৈদিক আখ্যা দিয়েছেন, সমস্ত বিষয়গুলিই বৈদিক সাহিত্যে বর্তমান, কাজেই সেগুলিকে অবৈদিক মনে করার কোন কারণ নেই। দ্বিতীয়ত, প্রত্নতত্ত্ববিদরো যখন বৈদিক সভ্যতাকে বর্বরসৃষ্ট বলেন এবং হরপ্পা-উত্তর অপকৃষ্ট সংস্কৃতি-গুলিকে বৈদিক সভ্যতার নিদর্শন বলে চালাবার চেষ্টা করেন, এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তাঁরা বৈদিক সাহিত্যের সম্যক অনুশীলন করেননি। তৃতীয়ত, বৈদিক সাহিত্যের কোন বৈজ্ঞানিক কালনির্ণয় না করেই বৈদিক সভ্যতাকে হরপ্পা-পরবর্তী আখ্যা দেওয়া ঐতিহাসিক গবেষণার আদর্শবিরোধী। রেডিও-কার্বন পরীক্ষায় হরপ্পার যেমনই হোক একটা কালনির্ণয় হয়েছে, কিন্তু বৈদিক সাহিত্যের কালানুক্রম অনুসরণের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিপক্ষ যা অনুসরণ করেন সে তো উনিশ শতকে কৃত ম্যাক্সমুলারের নিছকই একটি সাদামাটা অনুমান এবং সেই অনুমানও ন্যায়শাস্ত্র সম্মত নয়। উভয় পক্ষের মতামতই সংক্ষেপে দেওয়া হল। বাস্তব পরিস্থিতি হচ্ছে এই যে হরপ্পীয়রা কোন্ ভাষা-পরিবারের অন্তর্গত ছিল তা আজও জানা সম্ভব হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবেনা, যতদিন না পর্যন্ত হরপ্পার লিপিসমূহের পাঠোদ্ধার সম্ভব হচ্ছে। হরপ্পা সভ্যতায় প্রাপ্ত কঙ্কালগুলি পরীক্ষা করে তিন ধরনের নৃতাত্ত্বিক জন-গোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া গেছে, যথা মেডিটারেনিয়ান, প্রোটো-অস্ট্রালয়েড ও আল্পো-দিনারিক, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে হরপ্পা সভ্যতা কোন বিশেষ নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি নয়, মিশ্র জনসমাজের সৃষ্টি।

কালনির্ণয় প্রসঙ্গ : হরপ্পা সভ্যতার কাল নির্ণয়ের বিষয় নিয়েও নানা সমস্যা আছে। এক্ষেত্রে প্রত্নতত্ত্ববিদরো মেসোপোটামীয় সাক্ষ্যের উপরই সর্বাংশে নির্ভর করেছেন, কিন্তু অন্যনিরপেক্ষ অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যপ্রমাণাদি সংগ্রহের কোন চেষ্টা হয়েছে বলে জানা নেই। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্যার জন মার্শাল বিশুদ্ধ অনুমানের ভিত্তিতে মহেঞ্জোদরোর আদি পর্যায়ের কালনির্ণয় করেন ৩২৫০ থেকে ২৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে। ১৯৩২-এ সি. জে. গ্যাড উর-এ প্রাপ্ত হরপ্পীয় ধরনের সীলের নিরিখে দেখান যে হরপ্পার সঙ্গে বহির্দেশের বাণিজ্য সম্পর্কের কাল মোটামুটি ২৩৫০ থেকে ১৭৭০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইরাকে প্রাপ্ত সীলগুলি হরপ্পার কালনির্ণয়ে সহায়তা করে, কেননা এগুলি আক্কাদ নৃপতি সার্গনের সমসাময়িক অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ২৩৫০ অব্দের কাছাকাছি। মেসোপোটামীয় লিখিত উপাদান সমূহে উর-এর তৃতীয় বংশের (২১৩০-২০৩০ খ্রীঃ পূঃ) এবং পরবর্তী লারসা বংশের (২০৩০-১৭৭০ খ্রীঃ পূঃ) আমলে মেলুহা-র সঙ্গে ওই

অঞ্চলের বাণিজ্য ছিল বলে উল্লেখ আছে। তবে মেলুহা-ই যে হরপ্পা তার কোন প্রমাণ নেই। পিগট (১৯৫০) ও হুইলার (১৯৪৬, ১৯৬০) ইরানীয় এবং মেসোপোটামীয় কালানুক্রমের ভিত্তিতে হরপ্পার মোট সময় সীমাকে ২৫০০ থেকে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে গণ্য করেন এবং এই সকল দেশের সঙ্গে হরপ্পার যোগাযোগের কালকে ২৩০০ থেকে ২০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের মধ্যে স্থান দেন। অলব্রাইট (১৯৫৫) মেসোপোটামীয় সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই ১৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দকে হরপ্পার সমাপ্তি বলে ঘোষণা করেন। ফেয়ারসার্ভিস (১৯৫৬) কোয়েটা উপত্যকার নিদর্শনসমূহের রেডিও-কার্বন পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ২০০০ থেকে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ধার্য করেন। ১৯৬৪-তে ডি. পি. আগরওয়াল হরপ্পা, মহেঞ্জোদরো ও আরও কয়েকটি হরপ্পীয় কেন্দ্রের নিদর্শনের রেডিও-কার্বন পরীক্ষার ভিত্তিতে ২৩০০ থেকে ১৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে হরপ্পা সভ্যতাকে নির্দিষ্ট করেছেন। এই তারিখ কোট-ডিজি, লোথাল ও কালিবঙ্গার হরপ্পীয় পর্যায়গুলির ক্ষেত্রেও খাটে।

অবক্ষয় ও অবসান ঃ কিভাবে হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে তার কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। আবহাওয়ার পরিবর্তন, বন্যার প্রকোপ, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বা বৈদেশিক আক্রমণের যে কোন একটি হরপ্পা সভ্যতার বিনাশের কারণ হিসাবে গণ্য হতে পারে অথবা নাও পারে। অনেকে মনে করেন যে সিন্ধু, বালুচিস্তান ও সান্নিহিত রাজস্থান অঞ্চলের আবহাওয়া ভয়ানক রকম রুক্ষ হয়ে পড়ায় এবং মরু অঞ্চলের তজ্জনিত বিস্তৃতি ঘটায় ওই সকল অঞ্চল ক্রমশঃ মনুষ্যবাসের অনুপযোগী হয়ে ওঠে। কিন্তু রাইকস, ডাইসন এবং ফেয়ারসার্ভিস আবহতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব ও প্রাণীতত্ত্বের হিসাবনিকাশ করে জানান যে ওই সকল অঞ্চলের আবহাওয়ায় এরকম কোন সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার ঘটেনি। অনেকে মনে করেন যে নানা কারণে হরপ্পা সভ্যতার অর্থনৈতিক বনিয়াদ ভেঙে পড়েছিল। এস. আর. রাও দেখিয়েছেন যে রংপুর এবং গুজরাতের আরও কয়েকটি কেন্দ্রে হরপ্পা সভ্যতা অদৃশ্য হয়নি, কিন্তু অধঃপতিত ও অপকৃষ্ট স্থানীয় সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

অনেকে মনে করেন যে বন্যার প্রকোপে হরপ্পার ধ্বংস হয়েছিল। এম. আর. সাহনি বুধ-ঠক্কর নামক স্থানে জমাট পলিস্তূপ এবং লোথালের নিকটে কোলহ নামক স্থানে অনুরূপ পলি অবক্ষেপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যেগুলির সৃষ্টি বন্যার ফলে হয়েছে বলে অনুমান করা যেতে পারে। ম্যাকের মতে বন্যাই প্রধানত চানহুদরো ধ্বংসের কারণ। এস. আর. রাও-এর মতে লোথাল, রংপুর, দেশলপার ও ভগতরবের হরপ্পীয় বসতিসমূহ যে বন্যার ফলে ধ্বংস হয়েছিল তার প্রমাণ বর্তমান। মহেঞ্জোদরো এবং

হরপ্পার ক্ষেত্রেও এই কথা খাটে। বন্যার স্বপক্ষে এক ধরনের পরোক্ষ প্রমাণের উল্লেখ করা হয়। হরপ্পা, মহেঞ্জোদরো, রূপর, দেশলপার ও ভগতরবে হরপ্পীয়দের পর অন্য কোন জনগোষ্ঠীর অধিবসতির কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। খোদ হরপ্পায় এবং রূপর ও বারায় অবশ্য পাওয়া যায়, কিন্তু সেক্ষেত্রেও একটা বিরাট সময়ের ব্যবধান আছে। মোটের উপর হরপ্পীয়রা ওই সকল বসতি পরিত্যাগ করে যাবার পর দীর্ঘকাল ওই অঞ্চলে লোকবসতি ছিল না। এই ঘটনাটি বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে এবং প্রাকৃতিক কারণের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। রাইকসের মতে, সাধারণ বন্যা নয়, একটি অসাধারণ ভূপৃষ্ঠগত পরিবর্তনজনিত বন্যাই, হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসের কারণ। কিন্তু পশেল বলেন যে এরকম বন্যার কোন ভূতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই।

কিছুকাল আগে পর্যন্ত মনে করা হত যে আর্যদের আক্রমণে হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংস হয়েছিল। হরপ্পার সিমেট্রি এইচ নামক যে কবরখানার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটি অনেক পরের যুগের যেখানে হরপ্পীয় নয় এমন একটি সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে গর্ডন চাইল্ড এই কবরখানাকে আক্রমণকারী তথাকথিত আর্যদেরই হওয়া সম্ভব বলে মনে করেন। ১৯৪৬-এর খননকার্য এই সম্ভাবনাকে আরও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। বলা হয় যে হরপ্পা সভ্যতার শেষ পর্যায়ে নগরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে নূতন করে গড়ে তোলা হয়েছে, নগরবাসীরা যেন কোন বহিরাগতদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। ছানহুদরোর ধ্বংসস্তূপ থেকেও একই ইঙ্গিত পাওয়া যায় বলে মনে করা হয়। বলা হয় যে সেখানকার সর্বনিম্ন স্তরে বিশুদ্ধ হরপ্পা সংস্কৃতির পরিচয় রয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে দুটি স্বতন্ত্র ও আগন্তুক সংস্কৃতির নিদর্শন আছে। পারিপার্শ্বিক আরও কিছু পরোক্ষ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হুইলার ও পিগট এই সিদ্ধান্তে আসেন যে হরপ্পা সভ্যতা লিপিহীন এক বহিরাগত জাতির আক্রমণে বিনষ্ট হয়েছিল যারা ভারতীয় ইতিহাসে বৈদিক আর্য নামে পরিচিত। হুইলার এ বিষয়ে রমাপ্রসাদ চন্দের লেখা থেকে ঋগ্বেদে উল্লিখিত কিছু ঘটনার কথা বলেছেন, ইন্দ্র কর্তৃক শত্রুদের পুর বা নগর ধ্বংসের কথা প্রভৃতি। কিন্তু এই মতবাদের পিছনেও ফাঁকি আছে, কেননা হরপ্পা সভ্যতার কেন্দ্রগুলির উপর যে সব অপকৃষ্ট সংস্কৃতির নিদর্শন মিলেছে—অবশ্য বহু সময়ের ব্যবধানে—সেগুলি আর্যদেরই কি না তার কোন প্রমাণ নেই। আর্যদের কোন প্রত্যক্ষ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ভারতে নেই, এবং সত্যই যদি কোন বহিরাগত আর্য আক্রমণ এদেশে হয়ে থাকে তার সাল তারিখ আমাদের অজ্ঞাত, কেননা আর্য সংক্রান্ত আমাদের ধারণাগুলি বহুলাংশেই অনুমানমূলক।

হরপ্পা-উত্তর তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতিসমূহ

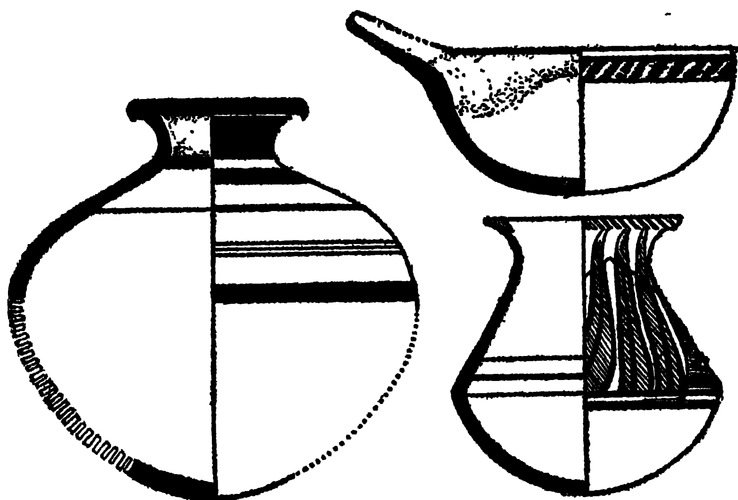
গুজরাতে হরপ্পা-উত্তর বসতিসমূহের মধ্যে লোথাল, রংপুর, প্রভাস পাটন, রোজাদি, অমরা, দেশলপার প্রভৃতি উৎখনিত ক্ষেত্রসমূহ এতদঞ্চলের তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির উপর আলোকপাত করে। এই সকল বসতির কালসীমা মোটের উপর ১৮০০ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে। এই সকল সংস্কৃতির অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল কৃষিকাজ ও পশুপালন, কেননা প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহের মধ্যে যেমন একদিকে প্রস্তর নির্মিত জাঁতা বা পেষক ধরনের সামগ্রী বর্তমান, অপরদিকে তেমনই গৃহপালিত নানা পশুর মাটির মডেল এবং পাত্রে উৎকীর্ণ চিত্র পাওয়া গেছে। রংপুর থেকে মৃত্তিকা নির্মিত দুটি ঘোড়ার মডেল পাওয়া গেছে। পোড়ামাটির তৈরি টাকু ও মাকু উভয়ের অস্তিত্ব থেকে বয়নশিল্পের প্রচলন প্রমাণিত হয়। এই সকল সংস্কৃতি থেকে নানা ধরনের তামার সামগ্রী ও ব্রোঞ্জ নির্মিত কুঠার, ক্ষুর, পিন ও ছুরি পাওয়া গেছে। কার্নেলিয়ান, আগেট, জ্যাসপার, শংখ ও হাতির দাঁতের পুঁতিও আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রস্তর নির্মিত আয়ুধের মধ্যে সমান্তরাল ধারযুক্ত দীর্ঘ ফলার পরিচয় পাওয়া যায়। কাঁচা ইটের তৈরি আবাসের নিদর্শনও বর্তমান। মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল লাল বর্ণের পাত্র এবং কালো-ও-লাল পাত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম শ্রেণীর পাত্রাদির মধ্যে বাটি, পিরিচ ও কলস উল্লেখযোগ্য। এগুলির জমি পাতলা এবং আকারে এগুলি ছোট। অলংকরণসমূহ অর্ধাংশ জুড়ে বর্তমান যেগুলি গভীর কালো রঙে চিত্রিত, বহুক্ষেত্রেই জ্যামিতিক নকশা সহ। কালো-ও-লাল পাত্রসমূহ মোটামুটি চার ধরনের : গোলাকৃতি খুরোযুক্ত বাটি, বৈশিষ্ট্যহীন কানা-সহ ; পেটমোটা ধরনের বাটি ; বাঁকানো কানাযুক্ত পিরিচ এবং কুঁজো-জাতীয় কলস। এছাড়াও একশ্রেণীর রুক্ষ লাল ও রুক্ষ ধূসর বর্ণের মৃৎপাত্র দেখা যায়। রংপুর থেকে প্রাপ্ত কিছু পাত্রের টুকরোয় দাগ দিয়ে অলংকরণের কৌশল লক্ষ্য করা যায়।

দক্ষিণ পূর্ব রাজস্থানের বানাস উপত্যকায় উদয়পুরের নিকটবর্তী অহর (আহড়) সংস্কৃতি নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে ধূলকোট নামক ৫০০ মি. দীর্ঘ, ২৭৫ মি. বিস্তৃত এবং ১৩ মি. উচ্চতা বিশিষ্ট একটি ঢিবি উৎখনিত হয়েছে। স্তরবিন্যাস ও সংস্কৃতি উভয় দিক থেকেই অহরে দুটি প্রধান যুগের পরিচয় পাওয়া যায়, উভয় যুগই তিনটি করে উপপর্যায়ে বিভক্ত। এই সংস্কৃতিকে বানাস সংস্কৃতিও বলা হয় তার কারণ বানাস ও

তার উপনদীসমূহের তীরে উদয়পুর, চিতোর ও ভিলওয়ারা জেলায় অনুরূপ সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই সংস্কৃতির কালসীমা ২০০০ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে। অহরে উৎখননের ফলে মৃত্তিকা ও প্রস্তর নির্মিত আবাসের পরিচয় পাওয়া গেছে। পাথরের ভিত্তির উপর কাঁচা বা পাকা ইট অথবা মাটির ঘর, কাঠের খুঁটি দিয়ে তৈরি থাম এবং কড়ি, বাঁশ বা কাঠের খাঁচার উপর লম্বা ঘাস বা পাতা দিয়ে ছাওয়া ঢালু চাল, এখানকার আবাস ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। একই সংস্কৃতির অন্তর্গত গিলুন্দ এবং অপরাপর কেন্দ্রে পাথরের পরিবর্তে আগাগোড়া ইটের ব্যবহারই দেখা যায়। গৃহে উনান বা চুলার নিদর্শন পাওয়া যায়,যেগুলির মধ্যে কয়েকটি আকারে বেশ বড়, যা বৃহৎ পরিবারের অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়। শস্য পেষণের জাঁতা এবং মাটির তৈরি কড়াই শস্যজাত খাদ্য ব্যবহারের ইঙ্গিতবাহী। অহর সংস্কৃতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রস্তর নির্মিত হাতিয়ারের অনুপস্থিতি এবং তাম্রনির্মিত হাতিয়ার ও উপকরণের প্রাচুর্য, যার উৎস আরাবল্লী পাহাড়ের খনি অঞ্চল। কিন্তু প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে একই সংস্কৃতিভুক্ত গিলুন্দে পাথরের ফলা শিল্পের বিশেষ বিকাশ দেখা যায়। গিলুন্দের প্রত্নক্ষেত্রটি বৃহদায়তন। এখানকার পাকা ইটের আবাস ও প্রাকারের নিদর্শন হরপ্পীয় পরিকল্পনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে পোড়ামাটির মূর্তি পাওয়া গেছে ও এখানকার মৃৎপাত্রের ধরন অহরের অনুরূপ। অহরে সাত ধরনের মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে, প্রধান ধরনটি হচ্ছে কালো-ও-লাল, সাদা চিত্রণসহ। পধান পাত্রাদির মধ্যে বাটি, খুরোযুক্ত পিরিচ এবং গোলাকৃতি কুম্ভ উল্লেখযোগ্য। মৃৎপাত্রের জমি পুরু ও পাতলা দুরকমেরই, কিন্তু তা পেলব। খুরোযুক্ত পিরিচ কিছুটা হরপ্পীয় প্রভাবকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সমকালীন সৌরাষ্ট্র ও মালবের সংস্কৃতিসমূহের সঙ্গে অহরের যে সম্পর্ক ছিল তার প্রমাণ এই কালো-ও-লাল মৃৎশিল্প। অপরাপর ধরনের মৃৎপাত্রের মধ্যে চিত্রিত কৃষ্ণ, ধূসর, লোহিত ও বহুবর্ণের পাত্রাদি পরিলক্ষিত হয়। গিলুন্দের উপরের সংস্তরে নৃত্যশীল মানবদেহ ও চিহ্নিত পশুর নকশাসহ ক্রীম রঙের যে সকল পাত্র পাওয়া গেছে সেগুলির সঙ্গে নভডাটোলির প্রথম ও দ্বিতীয় যুগে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের সাদৃশ্য আছে।

চম্বল, নর্মদা ও মধ্যপ্রদেশের অপরাপর নদীবিধৌত এলাকায় তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির ব্যাপক নিদর্শন পাওয়া গেছে। কায়থা, মহেশ্বর, নভডাটোলি, নাগদা, আভ্‌রা, মানোতি, এরান, আজাদনগর, বেসনগর প্রভৃতি স্থানে উৎখননের ফলে স্তরবিন্যস্ত নানা পর্যায় আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সকল সংস্কৃতির মধ্যে কায়থায় প্রাক্-লৌহ তিনটি বসতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রথমটির কাল ২০১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি যেখানে হরপ্পীয় ধরনের চিত্রিত লাল মৃৎপাত্র, সোথী ও কালিবঙ্গার প্রাক্-হরপ্পীয় ধারার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত ঈষৎ পীতাভ মৃৎপাত্র এবং অমসৃণ লাল রঙের মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় পর্যায়টিকে ১৯৬৫-১৬৭৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে ধরা হয়েছে যেখানে অদ্ভুত ধরনের কালো-ও-লাল মৃৎপাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। তৃতীয় পর্যায়ের কালসীমা ১৬৭৫ থেকে ১৩৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে। এই পর্যায়ে মালব ও জোরওয়ে ধরনের মৃৎপাত্রের বিকাশ লক্ষ্য করা গেছে। কায়থার প্রত্নক্ষেত্রটি উজ্জয়িনীর ২৫ কি. মি. পূর্বে অবস্থিত। নভডাটোলিতে প্রত্নাশ্মীয় থেকে তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতিতে উত্তরণের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। শেষোক্ত পর্যায়টি চারটি সংস্তরে বিভক্ত, কালসীমা মোটামুটি ১৬৬০



নভডাটোলির মৃৎপাত্র

থেকে ১৪৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। প্রথম সংস্তরে গোলাকার ও চতুষ্কোণ চালাঘর পাথরের ফলাশিল্প ও তামার হাতিয়ার ও তৎসহ, সচরাচর মালব মৃৎশিল্প নামে পরিচিত, বিশেষ লাল রঙের রঞ্জিত কালো রঙের চিত্রণযুক্ত মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। এই সংস্তরে ব্যাপক কৃষি ও পশুপালনের ঐতিহ্য লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় সংস্তরে নিরেট খুরোর উপর দাঁড় করানো ছোট ছোট পানপাত্র চোখে পড়ে। তৃতীয় সংস্তরে চক্রনির্মিত কালো রঙের সামান্য অলংকরণসহ হালকা লাল রঙের মৃৎপাত্রের উপস্থিতি দেখা যায়। এগুলি জোরওয়ে মৃৎশিল্প হিসাবে পরিচিত। চতুর্থ সংস্তরে উজ্জ্বল লাল রঙের নূতন এক ধরনের মৃৎশিল্পের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

কায়থার দ্বিতীয় পর্যায়ে যে কালো-ও-লাল মৃৎপাত্রের পরিচয় পাওয়া যায় তাতে অহরের প্রভাব বর্তমান। বস্তুত মধ্য ভারতের দুটি প্রত্নক্ষেত্র



আভরা ও মানোতি অহর থেকে খুব দূরে নয়। উভয় স্থানেই নিম্নতর সংস্তরে এই জাতীয় মৃৎপাত্র বহুল পরিমাণে পাওয়া গেছে। নভডাটোলির

প্রথম সংস্তরে, নাগদা এবং এরানে কালো-ও-লাল মৃৎপাত্রের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। বেসনগরের নিকট রঙ্গাই থেকে তিন ধরনের মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে : লাল, কালো-ও-লাল এবং ধূসর-ও-লাল। তবে সবচেয়ে প্রচলিত ধরনটি হচ্ছে লাল রঙে রঞ্জিত কালো নকশাযুক্ত মৃৎপাত্র। এই ধরনটির ব্যাপ্তি মালব অঞ্চলে সর্বাধিক হওয়ার জন্য তা মালব মৃৎশিল্প নামে পরিচিত। নভডাটোলির তাম্রাশ্মীয় বসতিতে এই ধরনটির ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। নাগদা এবং এরানেও মালব মৃৎশিল্পের নিদর্শন ভাল রকমই পাওয়া যায়, বিশেষ করে নিম্ন সংস্তরে। কায়থা, মানোতি এবং আভ্‌রায় এই ধরনটিকে পাওয়া যায় অহর সংস্কৃতি প্রভাবিত কালো-ও-লাল মৃৎপাত্রের নিচের সংস্তরে। নভডাটোলির প্রথম দুই সংস্তরে অল্প সংখ্যায় সাদা রঙের কিছু মৃৎপাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, উপরের দিকে যেগুলির অস্তিত্ব নেই। কিন্তু অন্য মৃৎপাত্রের তুলনায় এগুলির আকার বহুবিধ। নভডাটোলির তৃতীয় সংস্তরে জোরওয়ে ধরনের মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে যে কথা আগে বলা হয়েছে। এই ধরনটি আহমদনগর জেলার জোরওয়ে নামক স্থানের নামে পরিচিত। উপরি-উক্ত ধরনগুলি ছাড়াও মধ্যপ্রদেশের তাম্রাশ্মীয় বসতিসমূহে একজাতীয় ধূসর মৃৎপাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে, বিশেষ করে এরানে। এগুলির কালসীমা মোটামুটি ১৭৫০ থেকে ৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে। এগুলি কিন্তু গাঙ্গেয় অঞ্চলের চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্রের চেয়ে ভিন্ন। দক্ষিণ ভারতের নবাশ্মীয় অধ্যায়ের পালিশ করা ধূসর মৃৎপাত্রের সঙ্গেও এগুলির সম্পর্ক নেই। ভিন্দ জেলা থেকে কিছু পাত্রের ভাঙা টুকরো পাওয়া গেছে যেগুলি এরানের এই ধূসর মৃৎপাত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। নাগদা থেকে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রসমূহ গুজরাত সৌরাষ্ট্র ধারার সঙ্গে, বিশেষ করে রংপুরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। অলংকরণের ক্ষেত্রে এখানকার মৃৎপাত্রে রংপুরের মতই ময়ূর, এলায়িত শৃঙ্গবিশিষ্ট গবাদি পশু ও বিন্দু দিয়ে চিহ্নিত হরিণের প্রতিকৃতির ব্যবহার দেখা যায়।

মধ্যপ্রদেশের তাম্রাশ্মীয় বসতিসমূহের অধিকাংশই মাটির কুটির, যদিও মানোতিতে পাকা ইটের তৈরি আবাসের পরিচয় পাওয়া যায়। নাগদায় কাঁচা ইটের তৈরি গৃহাদির অবশেষ দেখা যায়। মানোতিতে কাঁচা ইটের তৈরি আয়তাকার ধাপি দেখা যায় যা সম্ভবত চম্বলের বন্যার হাত থেকে বসতিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নির্মিত। এখানে একটি এগারো ফুট প্রশস্ত এবং দশ থেকে বারো ফুট উচ্চতা সম্পন্ন প্রতিরক্ষা প্রাকারেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। নাগদা এবং এরানেও এই রকম প্রতিরক্ষা প্রাকারের আভাস মেলে যদিও এই প্রতিরক্ষা সম্ভবত প্রাকৃতিক শত্রুর বিরুদ্ধে। মহেশ্বর এবং

নভডাটোলির আবাসন ব্যবস্থা অপরিকল্পিত। গৃহগুলি নানা আকারের, পরস্পর সংলগ্ন, কাঠের খুঁটির উপর নির্মিত, দেওয়াল বাঁশের বাখারির দুদিকে মাটি লেপে তৈরি। কতকগুলি গোলাকার গৃহ এত ছোট যে সেগুলি সম্ভবত শস্যের মরাই হিসাবে ব্যবহৃত হত। ঘরের মাপ সচরাচর ছিল দশ-বাই-আট-ফুট, বৃহত্তম আয়তাকার ঘরটির মাপ চল্লিশ-বাই-কুড়ি ফুট। মেঝে তৈরি হত কাদার সঙ্গে গোবর মিশিয়ে। প্রধানত কৃষ্ণমৃত্তিকা বা হলদে পলিমাটি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত। এর সঙ্গে চুণও মেশানো হত। আভ্‌রা এবং এরানে হলদে পলির সঙ্গে কাঁকর মিশিয়ে মেঝে তৈরি হত। নভডাটোলি, এরান ও আরও কয়েকটি স্থানে গৃহের মধ্যে উনান পাওয়া গেছে। আজাদনগরে একটি গৃহে একটি শিশুর সমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে। নভডাটোলি এবং কায়থা থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য শস্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে যেগুলির মধ্যে ধান, গম, যব, ডাল, তৈলবীজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সকল কেন্দ্রেই তাম্রের ব্যবহার দেখা যায়। কায়থা থেকে দুটি পুরু তামার কুঠার ও একটি বাটালি পাওয়া গেছে। কুঠারগুলি ১˙৫ সে. মি. পুরু এবং অত্যন্ত সুন্দর আকারে ঢালাই করা। তাম্রের ব্যবহার প্রচলিত থাকলেও পাথরের ফলা শিল্পের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। অলংকারসমূহের মধ্যে তাম্রের বলয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কায়থার একটি গৃহ থেকেই ২৯টি তাম্রবলয় পাওয়া গেছে। নভডাটোলিতে ও মহেশ্বরে তাম্রবলয়ের পাশাপাশি মাটির বলয়ও লক্ষ্য করা যায়। এরান থেকে একটি স্বর্ণচক্র পাওয়া গেছে, পরিমাপ ২˙৫ সে. মি. ওজন ২০ গ্রাম। এটি কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত বলা যায় না। এছাড়া মালার জন্য বিভিন্ন মাপের আধাদামী পাথরে নির্মিত অনেক পুঁতি পাওয়া গেছে। পোড়ামাটির বৃষমূর্তি পাওয়া গেছে কায়থা, নভডাটোলি, আভ্‌রা এবং এরান থেকে। পোড়ামাটির চক্র ও বল কিছু পাওয়া গেছে যেগুলি হয়ত বাটখারা হিসাবে ব্যবহৃত হত। জবলপুরের নিকটবর্তী ত্রিপুরীতে যে তাম্রাশ্মীয় বসতির পরিচয় পাওয়া যায় তা ওই অঞ্চলে লোহ যুগের সূচনার পূর্ববর্তী, কালসীমা ১৫০০ থেকে ১০৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে।

দাক্ষিণাত্যের উত্তরাঞ্চলের, বিশেষ করে মহারাষ্ট্র ও সন্নিহিত এলাকার তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতিসমূহের মধ্যে প্রকাশ ও বহল পশ্চিমে বহমান তাপী নদীর উপত্যকায় অবস্থিত এবং জোরওয়ে, নেভাসা, দাইমাবাদ, চন্দোলি, সোনেগাঁও ইনামগাঁও ও বহুরূপা মহারাষ্ট্রের পশ্চিমের জেলাগুলিতে অবস্থিত। এই সংস্কৃতিগুলির সঙ্গে সামীপ্যের কারণে মধ্যপ্রদেশের তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতি-গুলির সাদৃশ্য আছে। এই বসতিগুলি মোটামুটিভাবে গোদাবরী ও প্রবরা নদী এবং তাদের উপনদী ঘোদ এবং মহালুঙ্গির অববাহিকায় অবস্থিত।

মধ্যপ্রদেশের মত এই সকল বসতি কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলে অবস্থিত। দাইমাবাদের প্রথম পর্যায়ের প্রস্তর নির্মিত ভূমিকুঠার ও ফলাশিল্প, অমসৃণ কৃষ্ণ অথবা ধূসরবর্ণের মৃৎপাত্র এবং একটি সমাধিক্ষেত্রের পরিচয় পাওয়া যায় যেগুলি কতকটা উচ্চ-নবাশ্মীয় সংস্কৃতির দ্যোতক। দাইমাবাদের দ্বিতীয় পর্যায়ে এবং প্রকাশের প্রথম পর্যায়ের সূচনাপর্বে তামার উপকরণ ও মালব ধরনের মৃৎপাত্রের সাক্ষাৎ মেলে, যেগুলিকে ১৭০০-১৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়। জোরওয়ে, নেভাসা, চন্দোলি ও সোনেগাঁও সংস্কৃতিগুলির মধ্যে সমজাতীয়ত্ব বর্তমান এবং এগুলির বিকাশকাল ১৩৭৫ থেকে ১০৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে।

এই সকল স্থানে কাঠের খুঁটির কাঠামোর উপর গড়ে তোলা শক্ত মেঝেওয়ালা কুটিরের নিদর্শন পাওয়া গেছে। দাইমাবাদ, চন্দোলি ও সোনেগাঁও-এ খননকার্য খুবই সীমাবদ্ধ আকারে হওয়ার দরুন আবাসব্যবস্থার বিশদ পরিচয় পাওয়া যায় না। ইনামগাঁও-এ আবিষ্কৃত আটটি গৃহের মধ্যে বৃহত্তমটি দৈর্ঘ্যে ২০ ফুটের মত প্রস্থে ১২ ফুট। নেভাসার বৃহত্তম আবাসটির মাপ ৪৫ × ২০ ফুট, যদিও সাধারণ মাপ ৮ × ৭ ফুট। এই সকল সংস্কৃতিতে পাথরের ফলাশিল্পের বিশেষ প্রচলন থাকলেও তাম্রনির্মিত নানা আকারের হাতিয়ারের বিকাশ লক্ষ্যণীয়। চন্দোলি থেকে দুটি তাম্রনির্মিত বাটালি, একটি কুঠার, একটি ছোরা, তিনটি বঁড়শি ও একটি দণ্ড পাওয়া গেছে। নেভাসা থেকে একটি বাটালি, একটি পিরিচ, একটি দণ্ড ও একটি পাত্র পাওয়া গেছে। জোরওয়ে থেকে ছয়টি কুঠার পাওয়া গেছে। প্রস্তর নির্মিত আয়ুধসমূহের মধ্যে নেহাই, হাতুড়ি, পালিশ করা কুঠার, বাটালি, কাটারনি এবং বল পাওয়া গেছে বিশেষ করে নেভাসা এবং চন্দোলি থেকে। ফলাশিল্পের মার্জিততর প্রকাশ হিসাবে প্রধানত কালসেদনি পাথর নির্মিত কাস্তের উল্লেখ করা চলতে পারে যেগুলিতে কাঠের অথবা হাড়ের হাতল লাগানো হত। প্রস্তরনির্মিত নৌকাকৃতি পেষকেরও পরিচয় পাওয়া গেছে। দাইমাবাদ থেকে চারটি ব্রোঞ্জনির্মিত মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলি হল হাতি, গণ্ডার, মহিষ এবং মনুষ্যচালিত-বৃষবাহিত রথ।

নেভাসা, ইনামগাঁও ও চন্দোলিতে তাঁতশিল্পের অস্তিত্ব দেখা যায়। কার্পাস ছাড়াও রেশমের বস্ত্র উৎপাদিত যে হত তারও প্রমাণ আছে। তামা, পোড়ামাটি, অস্থি এবং হাতির দাঁতের অলংকার এবং আধা দামী পাথরের পুঁতির পরিচয় পাওয়া যায়। নেভাসায় একটি মৃত শিশুদেহের কণ্ঠে তামার পুঁতির মালা পাওয়া গেছে। মৃৎপাত্রের ক্ষেত্রে পূর্বতন অমসৃণ ও ধূসর ধরনের পরিবর্তে পূর্বকথিত মালব ও জোরওয়ে-ধরন, এবং তৎসহ অল্প

অল্প পরিমাণে উজ্জ্বল লাল রঙের মৃৎপাত্রের বিকাশ দেখা যায়। এতদঞ্চলের সর্বপ্রাচীন মৃৎশিল্প বলতে বোঝায় প্রকাশ ও নেভাসায় প্রাপ্ত পাণ্ডুর ধূসর মৃৎপাত্র। এগুলির মধ্যে বাটি, লোটা ও কুম্ভধরনের পাত্রই বেশি। প্রকাশ, দাইমাবাদ, চন্দোলি, সোনেগাঁও এবং ইনামগাঁও-এ মালব মৃৎশিল্পের বিকাশ দেখা যায়। এগুলি বিশেষ লাল রঙের অস্তরের উপর কালো রঙের চিত্রণ-যুক্ত। জ্যামিতিক ও প্রাকৃতিক উভয় ধরনের নকশারই পরিচয় পাওয়া যায়। দাইমাবাদ থেকে প্রাপ্ত একটি বৃহৎ পাত্রের উপর দিকে একটি পেশী-বহুল মানুষের চিত্র উৎকীর্ণ হয়েছে যার সামনে রয়েছে দুটি অগ্রসরমান মৃগ এবং মধ্যে কয়েকটি ময়ূর। নিম্নাংশে তিনটি দীর্ঘদেহ ও পদযুক্ত ব্যাঘ্রের উৎকীর্ণ চিত্র বর্তমান। পরবর্তী পর্যায়ে জোরওয়ে ধরনের মৃৎশিল্পের প্রাধান্য দেখা যায়। এই ধরনের মৃৎপাত্রের অস্তর হাল্কা লাল রঙের। অলংকরণে কালো রঙের জ্যামিতিক নকশা ছাড়াও কুকুর ও হরিণের ছবি উৎকীর্ণ। নেভাসায় জোরওয়ে ধরনের লোটা ও থালার আধিক্য দেখা যায়। চন্দোলি, সোনেগাঁও এবং ইনামগাঁও-এর মৃৎপাত্রে আকারগত বৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয়।

নেভাসায় ১৩১টি সমাধি পাওয়া গেছে, ইনামগাঁও-এ ৫০টি, এছাড়া বহল, চন্দোলি, দাইমাবাদ ও সোনেগাঁও-এ কিছু সমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে। অনুমান করা হয় যে শিশুদের মৃতদেহ গৃহাভ্যন্তরে সমাধিস্থ করা হত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মাংস শুকিয়ে ঝরে যাবার পর পাত্রসমাধি দেওয়া হত। নেভাসায় ১২১টি, চন্দোলিতে ২৩টি, সোনেগাঁও-এ ৪টি, দাইমাবাদে ৩টি এবং ইনামগাঁও-এ ৫০টি শিশুর মৃতদেহ শিশুমৃত্যুর ব্যাপকতা প্রমাণ করে। সাবালকদের ক্ষেত্রে প্রথমে বাইরের বিবরে এবং পরে ঘরের মধ্যে মেঝের নিচে সমাধিপ্রদানের রীতি ছিল। কঙ্কালগুলিকে প্রলম্বিত সমাধি দেওয়া হত, তবে একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের নজীর পাওয়া গেছে। সমাধিতে দেহাবশেষের সঙ্গে পাত্রাদি রাখা হত। শিশুদের গলায় তাম্র বা পাথরের পুঁতি পরিয়ে দেওয়া হত যার প্রমাণ পাওয়া যায় নেভাসা ও চন্দোলি থেকে। এই সকল রীতি থেকে মৃত্যু ও পরলোক সম্পর্কে কিছু চিন্তা ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্রের এইসব তাম্রাশ্মীয় কেন্দ্রের মানুষদের ধর্মচিন্তা সম্পর্কেও কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায় প্রাপ্ত পোড়ামাটির কিছু মূর্তি থেকে। নেভাসায় কিছু পোড়ামাটির নারীমূর্তি পাওয়া গেছে, ছোট মাথা কিন্তু সুস্পষ্ট মুখবিহীন, ক্ষুদ্র বক্ষ ও বৈশিষ্ট্যহীন নিম্নদেশসহ, কিন্তু এগুলিকে ঠিক মাতৃকামূর্তি বলা চলে না। কিন্তু ইনামগাঁও থেকে প্রাপ্ত এমন কিছু পোড়ামাটির মূর্তি আছে যেগুলি সুস্পষ্টভাবে মাতৃকামূর্তির দ্যোতক।

বিহারের চিরান্দ, শোনপুর, বৈশালী, মানের ও উরিউপ এবং পশ্চিম-বঙ্গের পাণ্ডুরাজার ঢিবি, মহিষাদল, নানুর, হারাইপুর ও ঠুসিপুর থেকে পূর্বাঞ্চলের তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতিসমূহের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল সংস্কৃতির আবাসব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাওয়া যায় না। শোনপুর, চিরান্দ এবং পাণ্ডুরাজার ঢিবি থেকে ঘরের মেঝের পরিচয় পাওয়া গেছে। এই মেঝে কাঁকর ও পলিমাটি দিয়ে তৈরি। শোনপুর ও পাণ্ডুরাজার ঢিবির মেঝেতে চুণের প্রয়োগ দেখা যায়। অনুমান করতে অসুবিধা নেই যে বাঁশের কাঠামোর উপর মাটি দিয়ে ঘর তৈরি করা হত এবং খড়জাতীয় সামগ্রী দিয়ে ছাদ তৈরি করা হত। পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও চিরান্দে উনান পাওয়া গেছে যা থেকে রান্নাঘরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। এতদঞ্চলের প্রধান মৃৎশিল্পের ধারাটি হচ্ছে কালো-ও-লাল মৃৎপাত্র। চিরান্দে প্রাপ্ত এই সকল মৃৎপাত্রের কাল মোটামুটি ১৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি। শোনপুর, বৈশালী, মানের ও আন্তিচোকে এই জাতীয় মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। দীর্ঘ-গ্রীব কলস, পানপাত্র, বাটি, পিরিচ প্রভৃতি নানা আকারের সামগ্রীর নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। চিরান্দ এবং উরিউপে কিছু চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। বঙ্গদেশে তিন ধরনের মৃৎপাত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, কালো-ও-লাল, উজ্জ্বল লাল এবং চকোলেট রঙের অস্তরের উপর সাদা, ক্রীম, হলদে অথবা কালো রঙের চিত্রণসহ। মানুষ বা পশুর ছবির অনুপস্থিতি চোখে পড়ে, তবে জ্যামিতিক নকশা বিদ্যমান। বর্ধমান জেলার পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রস্তর থেকে লৌহ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। এখানকার তাম্রাশ্মীয় উপকরণসমূহের মধ্যে পাথরের ফলা ও ভূমিকুঠার, তাম্রনির্মিত কিছু হাতিয়ার এবং লাল ও কালো-ও-লাল মৃৎপাত্র উল্লেখযোগ্য। মহিষাদল থেকে তাম্রনির্মিত কুঠার আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ছাড়া নানা ক্ষেত্র থেকে অস্থিনির্মিত আয়ুধ পাওয়া গেছে। প্রস্তর নির্মিত আয়ুধের মধ্যে ফলা ও শল্যের বিকাশ দেখা যায় বিশেষ করে শোনপুর, চিরান্দ ও পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে। পোড়ামাটির মূর্তিসমূহকে দু ভাগে ভাগ করা যায়, মানব ও পশু। নৃত্যভঙ্গীতে রত একটি পুরুষমূর্তির অংশ পাণ্ডুরাজার ঢিবি থেকে পাওয়া গেছে। উরিউপ থেকে উন্নত বক্ষযুক্ত একটি নারীমূর্তি পাওয়া গেছে। অলংকারে ব্যবহৃত হবার মত আধাদামী পাথরের পুঁতি সর্বত্রই পাওয়া গেছে। তাম্রনির্মিত বলয় পাওয়া গেছে উরিউপ ও পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে এবং অস্থিনির্মিত বলয় পাওয়া গেছে মহিষাদল থেকে। শেষোক্ত স্থান থেকে একটি অস্থি নির্মিত চিরুণীও পাওয়া গেছে। মৃতদেহ সংকারের কিছু কিছু প্রথার নিদর্শনও এতদঞ্চল থেকে পাওয়া যায়।

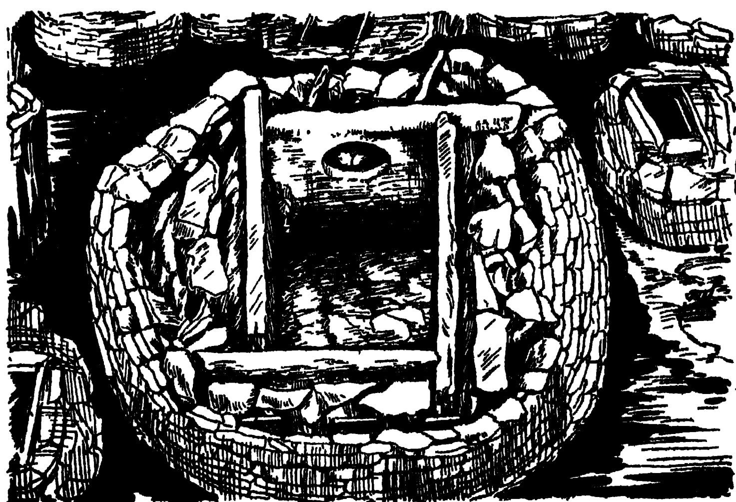
শোনপুরে কিছু দাহ-উত্তর বিবরসমাধি এবং অস্থি সমাকীর্ণ বৃহৎ পাত্রাধার আবিষ্কৃত হয়েছে। পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রলম্বিত সমাধির অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। তাছাড়া সেখানে অন্য ধরনের সমাধিপ্রদানের রীতির নিদর্শনও পাওয়া গেছে।

গঙ্গাযমুনা দোয়াব অঞ্চলের তাম্রসঞ্চয় কেন্দ্রগুলি এই অঞ্চলের তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির উপর বিশেষ আলোকপাত করে। এই অঞ্চলের উৎখনিত প্রধান কেন্দ্রগুলি হচ্ছে বাহাদরাবাদ, রাজপুর-পরশু, বিসাউলি, ফতেগড়, মথুরা, সার্থাউলি, দেওলি, সেওরাজপুর, কোশাম, পোণ্ডি, বরগাঁও, অম্বাখেড়ি, অত্রাঞ্জিখেরা, আলমগিরপুর, নোহ্, হস্তিনাপুর প্রভৃতি। এই সকল তাম্র-সঞ্চয় কেন্দ্রের সঙ্গে একটি বিশেষ ধরনের মৃৎশিল্পের সংযোগ লক্ষ্য করা যায়, যা গৈরিকবর্ণের মৃৎপাত্র নামে পরিচিত। গঙ্গাযমুনা দোয়াব অঞ্চলে বন্যার ফলে প্রাচীন বসতিগুলি সম্ভবত লুপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে এতদঞ্চলে কালো-ও-লাল মৃৎপাত্র সংস্কৃতির এবং চিত্রিত-ধূসর-মৃৎপাত্র সংস্কৃতির মানুষেরা বসতি করে। গৈরিকবর্ণের মৃৎপাত্রশিল্প আসলে কিন্তু লাল রঙেরই ছিল। দীর্ঘকাল আর্দ্রভূমিতে চাপা থাকার দরুন মূল বর্ণটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গৈরিকে রূপান্তরিত হয়েছে। এই মৃৎশিল্পটিকে প্রথম সনাক্ত করেন বি. বি. লাল বদায়ুন জেলার বিসাউলি এবং বিজনোর জেলায় রাজপুরের তাম্রসঞ্চয় কেন্দ্রে উৎখননের কালে। সে যাই হোক এই মৃৎপাত্র-শিল্পের ক্ষেত্র অতি ব্যাপক। সাহারানপুর জেলার অম্বাখেড়ি ও বরগাঁও, এটাহ্ জেলার অত্রাঞ্জিখেরা, অহিচ্ছত্রা, ভরতপুরের নিকটবর্তী নোহ্, সর্বত্রই এই মৃৎপাত্রের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই জাতীয় মৃৎপাত্র হস্তিনাপুরে আদি-লৌহযুগ স্তরের নিচেও পাওয়া গেছে। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে এই মৃৎপাত্রশিল্পের এলাকা উত্তর থেকে দক্ষিণে বাহাদরাবাদ থেকে নোহ্ পর্যন্ত প্রায় ৩০০ কি. মি. এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে জলন্ধরের নিকটবর্তী কাটপালোন থেকে অহিচ্ছত্র পর্যন্ত ৪৫০ কি. মি. বিস্তৃত ছিল। যদিও তাম্রসঞ্চয় কেন্দ্রগুলির সঙ্গে এই বিশেষ ধরনের মৃৎপাত্রশিল্পের সংযোগকে উপেক্ষা করা যায়না, তথাপি একথাও বলা যায়না যে ওই মৃৎপাত্রশিল্পের মানুষেরাই এইসকল তাম্রসঞ্চয় কেন্দ্রের স্রষ্টা। কেননা বিসাউলি এবং রাজপুর-পরশুর তাম্রসঞ্চয় ক্ষেত্রসমূহে গৈরিক বর্ণের মৃৎপাত্রের সঙ্গে কোন তাম্রসামগ্রী পাওয়া যায়নি। বাহাদরাবাদেও গৈরিক মৃৎপাত্রের সঙ্গে তাম্র-সামগ্রীর প্রত্যক্ষ সংযোগ প্রতিপাদন করা যায়নি। পক্ষান্তরে রুরকির নিকট নরসিপুরে, বরগাঁও-এ, ও আরও কয়েকটি স্থানে উভয়ের সংযোগ দেখা যায়। এই ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে অসুবিধাজনক তা হচ্ছে এই যে এই সকল তাম্রসঞ্চয়

কোন স্তরবিন্যস্ত পর্যায়ে পাওয়া যায়নি এবং এগুলির সঙ্গে অন্যান্য কোন প্রত্নসামগ্রীর বিশেষ সহযোগ নেই। গঙ্গাযমুনা দোয়াব ছাড়াও বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে তাম্রসঞ্চয় আবিষ্কৃত হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার অন্তর্গত গুঙ্গেরিয়ার বিখ্যাত তাম্রসঞ্চয়ের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। প্রাপ্ত সামগ্রীসমূহের মধ্যে অন্যূন তিন ধরনের কুঠার, বর্শা ও বাঁকা বর্শাফলক, শৃঙ্গল তরবারি ও কিছু মূর্তি উল্লেখযোগ্য। উত্তরপ্রদেশের গাঙ্গেয় দোয়াব অঞ্চলের সামগ্রীসমূহকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায় যথা—বর্শা, মূর্তি ও শৃঙ্গল তরবারি। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেও কিছু কিছু তাম্রসঞ্চয় কেন্দ্র বর্তমান যেগুলির কথা এদেশে প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বচর্চার পটভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বেই বলা হয়েছে। হাইনে গেলডার্ণ এবং আরও অনেকে এই তাম্রসঞ্চয় কেন্দ্রের মানুষদের সঙ্গে আর্যদের সনাক্ত করতে চেয়েছেন, যে প্রসঙ্গ আমরা পরে আলোচনা করব। স্টুয়ার্ট পিগটের মতে তাম্রসঞ্চয় কেন্দ্রসমূহ আসলে হরপ্পীয় উদ্বাস্তুদের সৃষ্টি। তিনি বলেন যে গাঙ্গেয় উপত্যকায় হরপ্পীয়দের অধঃপতিত বংশধরেরা নিম্নমানের যে সংস্কৃতিসমূহের পত্তন করেছিল এই সকল তাম্রসঞ্চয় কেন্দ্র এবং সংশ্লিষ্ট গৈরিক মৃৎশিল্পের সঙ্গে সেগুলির সম্পর্ক ছিল। গৈরিক মৃৎশিল্প ছাড়াও গাঙ্গেয় দোয়াব অঞ্চলে কালো-ও-লাল মৃৎশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে ভরতপুরের অন্তর্গত নোহ্ ও তৎসহ অত্রাঞ্জিখেরা ও আলমগিরপুরে। এছাড়া এই মৃৎশিল্পের উপস্থিতি কৌশাম্বী, শ্রাবস্তী, প্রহ্লাদপুর, রাজঘাট, মাসাওন, সোহাগুরা প্রভৃতি স্থানে লক্ষ্য করা যায়। এই মৃৎশিল্পের উপর অহর সংস্কৃতির প্রভাব আছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। নোহ্ ও অত্রাঞ্জিখেরায় এই ধরনের মৃৎপাত্রের কিছুটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

লৌহযুগের সূত্রপাত : সংশ্লিষ্ট সমাধি ও মৃৎশিল্প

আনুমানিক ১১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময় থেকে ভারতবর্ষে লোহার প্রচলন শুরু হয়। দক্ষিণ ও মধ্য বালুচিস্তানের কয়েকটি সমাধি-ক্ষেত্রে একটি সমজাতীয় সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় যার স্রষ্টারা একটি বিশেষ ধরনের মৃৎশিল্প ও তৎসহ লৌহ এবং অশ্বের ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। এই সংস্কৃতিসমূহ ১১০০ থেকে ৭৫০ খ্রীষ্টপর্বাব্দের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। এগুলির বিন্যাস নিম্নরূপ : উত্তর বালুচিস্তানের ঝোব উপত্যকায় মুঘল ঘুণ্ডাই ও চেপারকাই পর্বতাঞ্চল এবং লোরালাই উপত্যকায় টোর-ধেরাই ও স্বরজাঙ্গাল ; মধ্য বালুচিস্তানে কোয়েটা উপত্যকায় কোয়েটা দশ নম্বর কেন্দ্র ও নাল ; দক্ষিণ বালুচিস্তানের উচ্চভূমিতে জবায়ক, শাহদিনজাই, ওয়াহির,

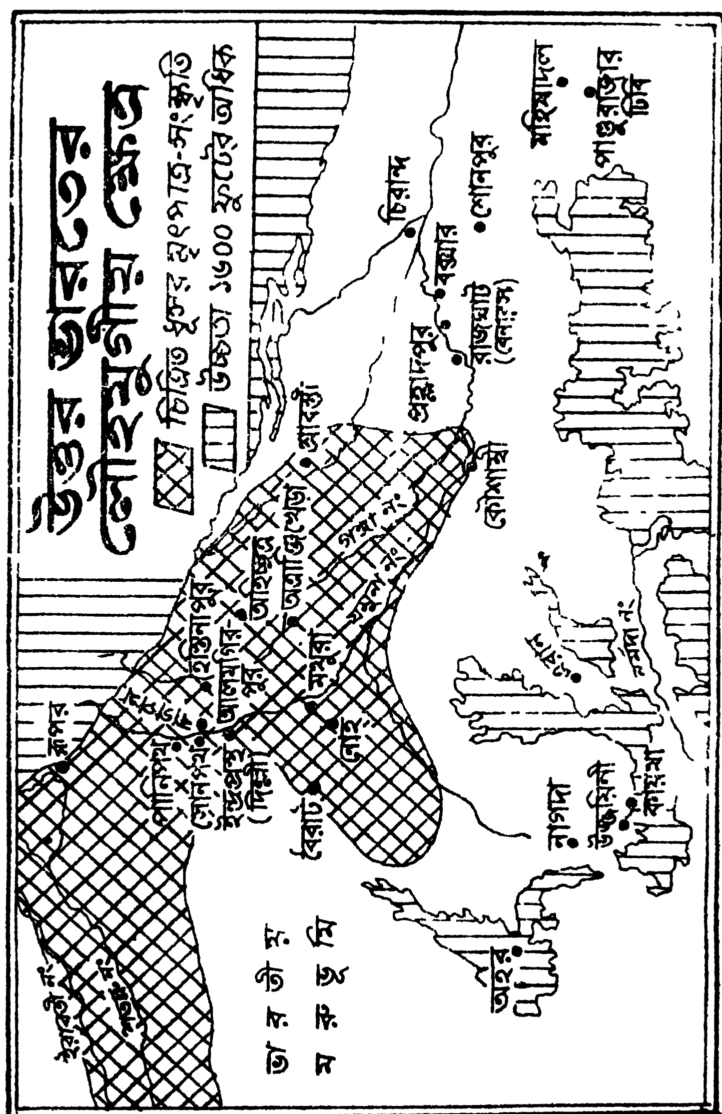


সিস্ট সমাধি : ব্রহ্মগিরি

মাদেনা, ডাম্ব ও কুল্লি ; মাকরান উপকূলে জিওয়ানরি, টেক-ডাপ, গত্তি, জাঙ্গিয়াল, ডাম্বা-কোহ ও নাসিরাবাদ ; লাস-বেলা সমভূমিতে কানার ও গিয়ান-গোথ। এতদঞ্চলে প্রাপ্ত সমাধিগুলি শিলাস্তূপ দ্বারা আবৃত। লোহার উপকরণ ছাড়া এই সকল সমাধিক্ষেত্রে প্রাপ্ত দ্রব্যসামগ্রী নানাজাতীয় এবং বহুমুখী হবার দরুন ভারত ও ভারতের বাইরের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে সেগুলিকে সম্পর্কিত করার একটা প্রবণতা প্রত্নতত্ত্ববিদদের মধ্যে দেখা যায়।

সোয়াট নদীর উপত্যকায় তিমরগড়, বালাঘাট, থানা, বুৎকারা, কাতেলাই, লোয়েবানর প্রভৃতি স্থানে যে সমাধিক্ষেত্রগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলিতে

তাম্রাশ্মীয় ও লৌহযুগীয় উভয় পর্যায়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। তাম্রাশ্মীয় পর্যায়টি দুটি উপপর্যায়ে বিভক্ত যেগুলির কালানুক্রম যথাক্রমে ১৬০০ থেকে



১৩০০ এবং ১২০০ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। এই পর্যায়ে পূর্ণ সমাধি এবং দাহ-পরবর্তী অবশেষসমূহের পাত্রসমাধির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

প্রদত্ত উপকরণসমূহের মধ্যে তাম্রনির্মিত সামগ্রী বর্তমান। লোহযুগীয় পর্যায়টি ৯০০ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্যায়ে দাহ-পরবর্তী এবং পরিত্যাগ-পরবর্তী দেহাবশেষের সমাধি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। প্রদত্ত সামগ্রীসমূহের মধ্যে লোহের উপকরণ বর্তমান। তাছাড়া রান্নার উপযোগী মৃৎপাত্র, খুরো-যুক্ত বাটি, গেলাস ধরনের পানপাত্র, খাদ্যগ্রহণের উপযোগী থালা এবং ছোট ছোট বিভিন্ন মাপের পাত্র প্রভৃতির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এই পর্যায়ের মানুষদের বৈদিক আর্যদের সঙ্গে সনাক্ত করার চেষ্টা হয়েছে, যদিও তা প্রমাণসিদ্ধ হয়নি।

উত্তর ভারতের প্রাচীন লোহ ব্যবহারকারীদের সংস্কৃতির সঙ্গে একটি বিশেষ মৃৎশিল্পের ধারা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যার নামকরণ করা হয়েছে চিত্রিত-ধূসর-মৃৎপাত্র-সংস্কৃতি বা পেণ্টেড-গ্রে-ওয়্যার-কালচার, সংক্ষেপে পি. জি. ডাব্লিউ। এই বিশেষ মৃৎপাত্র সংস্কৃতি পাঞ্জাব থেকে একদিকে উত্তর রাজস্থান ও অপরদিকে গঙ্গাযমুনা দোয়াব অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পাঞ্জাবের রূপরে এই মৃৎশিল্পের পরিচয় পাওয়া গেছে হরপ্পীয় ও ঐতিহাসিক পর্যায়ের মাঝামাঝি স্তর থেকে। দোয়াব অঞ্চলে পানিপত, সোনপত, বাগপত, ইন্দ্রপ্রস্থ, আলমগিরপুর, মথুরা, বৈরাট, নোহ্, অত্রাঞ্জিখেরা, অহিচ্ছত্র, হস্তিনাপুর প্রভৃতি স্থানে লোহযুগের সঙ্গে সম্পর্কিত চিত্রিত-ধূসর-মৃৎপাত্র-সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া গেছে, যেগুলির কাল মোটামুটি ১১০০ থেকে ৪৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র অত্রাঞ্জিখেরা, যেখানে উৎখনিত সকল স্তর থেকেই লোহের সামগ্রী পাওয়া গেছে যেমন—কুঠার, ছোরা, খুরপি, বাণফলক, বর্শাফলক, বঁড়শি ইত্যাদি। অত্রাঞ্জিখেরার কাল ১০২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, যার থেকে ১১০ বছর কম-বেশি হতে পারে। অনুরূপ সামগ্রীসমূহ চিত্রিত-ধূসর-মৃৎপাত্রের সঙ্গে নোহ্ নামক স্থানে খননকার্যের ফলে পাওয়া গেছে। অহিচ্ছত্র, হস্তিনাপুর ও অন্যান্য ক্ষেত্রের সম্পর্কেও একই কথা খাটে।

গাঙ্গেয় পূর্বোত্তরাংশে লোহযুগের বসতিগুলির সঙ্গে আর একটি নূতন ধরনের মৃৎশিল্পের সংযোগ ঘটেছিল যার নামকরণ করা হয়েছে উত্তরের-কৃষ্ণমসৃণ-মৃৎপাত্র-সংস্কৃতি বা নর্দান-ব্ল্যাক-পলিশড-ওয়্যার, সংক্ষেপে এন. বি. পি। এইগুলির পরিচয় পাওয়া যায় বিশেষ করে রাজঘাট (কাশী) সোনপুর, চিরান্দ, প্রহ্লাদপুর, কোশাম্বী প্রভৃতি অঞ্চল থেকে। এন. বি পি-র বিকাশকাল ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পর থেকে। উত্তর প্রদেশের শ্রাবস্তী (সাহেট-মাহেট), বিহারের বক্সার ও পশ্চিমবঙ্গের মহিষাদল ও বর্ধমান (পাণ্ডুরাজার ঢিবি) থেকেও লোহযুগের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। গুজরাতে

সোমনাথের তৃতীয় পর্বের দ্বিতীয় পর্যায়ে এন. বি. পির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, যদিও প্রথম পর্যায়ে লৌহের উপকরণের সঙ্গে লাল-ও-কালো মৃৎপাত্রের পরিচয়



পাওয়া যায়। একথা গুজরাতের উপকূল অঞ্চল ব্রোচ ও নাগল এবং নর্মদা মোহানায় অবস্থিত নাগারার ক্ষেত্রেও খাটে। কালো-ও-লাল মৃৎপাত্রের

সঙ্গে লৌহের উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে মধ্যপ্রদেশের এরান ও নাগদায় এবং মহারাষ্ট্রের প্রকাশ ও বহলে। নাগদার দ্বিতীয় পর্ব (৭৫০-৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) পূর্ববর্তী তাম্রাশ্মীয় পর্বের অনুবর্তন। এই পর্ব থেকে ৫৯টি লৌহ নির্মিত সামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রকাশ ও বহলে এন. বি. পি স্তরের নিম্নদেশ থেকে কালো-ও-লাল মৃৎপাত্রের সঙ্গে লৌহের উপকরণ পাওয়া গেছে। এই রকম সাহচর্য মহেশ্বর, ত্রিপুরী, রঙ্গালা, নেভাসা প্রভৃতির ক্ষেত্রেও দেখা যায়। কৌশাম্বীতে লোহার উপকরণের সঙ্গে যুগপৎ কালো-ও-লাল এবং চিত্রিত-ধূসর-মৃৎপাত্রের সমন্বয় দেখা যায়।

উপদ্বীপীয় ভারতে লৌহের সঙ্গে শ্বেতবর্ণে চিত্রিত কালো-ও-লাল অথবা শুধু লাল মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, যা অন্ধ্র-মৃৎশিল্প নামে পরিচিত। দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে শিশুপালগড়, ধরণিকোটা, হাল্লুর, আরিকামেদু, আদিচান্নালুর ও ব্রহ্মগিরি মহাশ্মীয় (মেগালিথিক) সমাধি-ক্ষেত্রগুলিতে লৌহযুগের অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই মহাশ্মীয় বা মেগালিথিক সমাধিগুলি ভারতবর্ষের লৌহযুগের উপর বিশেষ আলোকপাত করে। এই কেন্দ্রগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে এগুলি বসতি এলাকার বাইরে অবস্থিত। সমাধিগুলি দণ্ডায়মান, অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রদত্ত আকারসহ, বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড অথবা খণ্ড প্রস্তরের স্তূপ বা প্রাকার বা সীমার দ্বারা চিহ্নিত। সমাধিগুলি নানা ধরনের, বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র পাত্রাধারে, বিবরে, অথবা চৌবাচ্ছার মত চতুষ্কোণ ক্ষেত্রে (ইংরাজীতে বলে সিস্ট-বেরিয়াল, যেখানে চারটি বড় বড় পাথরের স্ল্যাব বা ফলক এমনভাবে জোড়া হয় যাতে পাথরের বাহুগুলি কিছুটা বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকে এবং চতুষ্কোণ ক্ষেত্রটি ভিতরের দিক থেকে উদ্ভূত হয়; ক্ষেত্রটি খণ্ডপাথরের স্তূপ বা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা থাকে) অথবা পর্বতছত্রের নিচে প্রদত্ত। যে সকল লোহার হাতিয়ার ও উপকরণ এই জাতীয় সমাধি থেকে পাওয়া গেছে সেগুলির গঠনের ক্ষেত্রে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবত এই সকল উপকরণের পৃথক উৎপাদনকেন্দ্র ছিল যেখান থেকে সমাধিতে অর্পণ করার উদ্দেশ্যে সামগ্রীগুলিকে রপ্তানী করা হত।

লৌহের উপকরণসমৃদ্ধ মহাশ্মীয় সমাধির ব্যাপ্তি বিশেষ করে উপদ্বীপীয় ভারতে লক্ষ্য করা গেলেও অন্যত্র তা বিরল নয়। কাশ্মীরের বুর্জাহোমে, লদাকের লে অঞ্চলে, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আসোটায়, সিন্ধুর করাচীতে ও উত্তর ভারতের নানাস্থানে একক প্রস্তর নির্মিত দণ্ডায়মান মেনহির এবং বড় পাথর বা ছোট পাথরের স্তূপ দ্বারা চিহ্নিত সমাধিস্মারক-সমূহ মহাশ্মীয় সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়। উত্তর প্রদেশের বারানসী জেলার

অন্তর্গত কাকোরিয়া, মীর্জাপুর জেলার বানিমিলিয়া বহেরা, চুনারের কুরগি নদী অঞ্চল, এলাহাবাদ জেলার কোটিয়া, আগ্রা জেলার খেরা ও সতমাস, জয়পুর-আগ্রা রাস্তার উপর দৌসা, গুজরাতের আমরেলি প্রভৃতি স্থানে মহাশ্মীয় লক্ষণযুক্ত সমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে। বালুচিস্তানের সমাধিক্ষেত্রগুলির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে প্রদত্ত সামগ্রীর মধ্যে লোহার উপকরণ, বিশেষ করে বাণফলক পাওয়া গেছে। বারানসী এবং এলাহাবাদ জেলায় অবস্থিত হাতিনিয়া পাহাড় এবং কোটিয়া থেকে লোহার উপকরণের সঙ্গে ক্ষুদ্রাশ্ম পাওয়া গেছে, যা তাম্রাশ্মীয় যুগ থেকে লৌহযুগে উত্তরণের ইঙ্গিতবাহী। কোটিয়া থেকে প্রাপ্ত লৌহ সামগ্রী সমূহের মধ্যে বর্শাফলক, কাস্তে, বাণফলক ও কুঠার উল্লেখযোগ্য। এগুলির সঙ্গে কালো-ও-লাল মৃৎপাত্রও পাওয়া গেছে। কেউ কেউ মনে করেন যে লৌহের ঐতিহ্যবাহী মহাশ্মীয় সমাধি সংস্কৃতি উত্তর-পশ্চিম থেকে উত্তর ভারতে আসে এবং সেখান থেকে দক্ষিণে গিয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কতদূর যথার্থ বলা কঠিন।

মহাশ্মীয় সমাধির ব্যাপকতর নিদর্শন পাওয়া যায় উপদ্বীপীয় ভারতে। এখানকার মহাশ্মীয় সমাধিগুলির মধ্যে আশ্চর্য সমজাতীয়তা বর্তমান, বিশেষ করে সমাধিতে প্রদত্ত দ্রব্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে, যেগুলির মধ্যে আছে লোহার উপকরণ, কালো-ও-লাল মৃৎপাত্র, পাথর ও পোড়ামাটির সামগ্রী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সোনা, রুপা বা ব্রোঞ্জের উপকরণ। দক্ষিণের প্রধান প্রধান মহাশ্মীয় কেন্দ্র কর্ণাটকে ব্রহ্মগিরি, জদগণহাল্লি, মাস্কি, হালিঙ্গলি, টেরডাল হুনুর এবং হাল্লুর; তামিলনাড়ুতে সানুর, কুন্নাত্তুর, অমৃথমঙ্গলম এবং পইয়মপল্লি; অন্ধ্রপ্রদেশে এল্লেশ্বরম, নাগার্জুনিকোণ্ডা এবং কেশরপল্লে; মহারাষ্ট্রে জনাপানি ও খাপা; এবং মধ্যপ্রদেশে ধানোরা। এছাড়া কর্ণাটকের বেলারি জেলার সঙ্গনকল্লু এবং মহীশূর জেলার টি. নরসিপুর এবং অন্ধ্রের আদিলাবাদ জেলায় পোছামপাদ উল্লেখযোগ্য। এই সকল স্থানের সমাধি পিট বা বিবর এবং সিস্ট বা চৌবাচ্ছাধর্মী। মেনহির জাতীয় মহাশ্ম, অর্থাৎ সমাধিতে প্রদত্ত দণ্ডায়মান প্রস্তর খণ্ড (কিছু মেনহিরের তলায় অবশ্য দেহাবশেষ থাকে না), এক থেকে চার মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট, পাওয়া গেছে পিকলিহাল ও মাস্কিতে, কেরলের অন্তর্গত দেবীকুলমে, মধ্যপ্রদেশের ধানোরায় এবং আরও কয়েকটি স্থানে। তামিলনাড়ুর চিঙ্গলেপুট জেলার অমৃথমঙ্গলমের একটি ক্ষেত্রে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা চিহ্নিত ২৫০ টিরও বেশি পাত্রসমাধি পাওয়া গেছে। প্রদত্ত সামগ্রীসমূহের মধ্যে লোহার উপকরণ এবং কালো-ও-লাল মৃৎপাত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়। তিরুনেলভেলি জেলার আদিত্যানাল্লুরের সমাধিক্ষেত্রটি বিরাট, ১১৪ একর

জায়গা নিয়ে। এখানকার পাত্রসমাধিগুলির সঙ্গে প্রদত্ত দ্রব্য সামগ্রীর সংখ্যা ৮০০০-এরও বেশি। লোহার হাতিয়ার ও উপকরণসমূহের মধ্যে ত্রিশূল, হাঁসুলি, বর্শাফলক, তরবারি, কাস্তে-জাতীয় অস্ত্র, তেপায়া প্রভৃতি বর্তমান। এখান থেকে প্রদীপের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে অপর কোন মহাশ্মীয় ক্ষেত্র থেকে প্রদীপ আবিষ্কৃত হয়নি। এছাড়া স্বর্ণনির্মিত কিছু সামগ্রীরও পরিচয় পাওয়া যায়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এখানে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের সামগ্রী। একসঙ্গে এত ব্রোঞ্জের সামগ্রী আর কোথাও পাওয়া যায় নি, যেগুলির বৈচিত্র্য ও কারুকার্যও উল্লেখযোগ্য। এখানকার ব্রোঞ্জে টিনের খাদের পরিমাণের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

আর্য সমস্যা ও ভারতীয় পরিস্থিতি

আর্য নামক ধারণা ও বৈদিক সভ্যতা : খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক পঞ্চদশ থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত উত্তর ভারতে আমরা একটি বিশিষ্ট অথচ মিশ্র ও পরিবর্তনশীল নানা সংস্কৃতির সমবায়ে গঠিত, সভ্যতার পরিচয় পাই যা বৈদিক সভ্যতা নামে কথিত। এই সভ্যতার কোন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই, কিন্তু আর এক ধরনের প্রমাণ আছে। এই সভ্যতার মানুষেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এক বিচিত্র সাহিত্য সম্ভার রচনা করেছিল যা থেকে ওই যুগের ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষদের জীবনযাপন পদ্ধতি ও চিন্তা ভাবনা সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া যায়। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে এই বৈদিক সাহিত্য যে ভাষায় রচিত হয়েছিল তা আর্য বা ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের।

এই মানুষদের ব্যবহৃত ভাষার সঙ্গে বাইরের দেশের কয়েকটি প্রাচীন ভাষার সাদৃশ্য দেখে একদা পণ্ডিতেরা অনুমান করেছিলেন যে এই সব ভাষার সৃষ্টি হয়েছে একটি আদি ভাষা থেকে যার ব্যবহারকারীরা কোন একটি কেন্দ্র থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে স্যার উইলিয়ম জোন্স কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদত্ত একটি ভাষণে সংস্কৃতের সঙ্গে বিভিন্ন প্রাচীন এশীয় ও ইউরোপীয় ভাষার একটি গঠনগত সাধারণ ভিত্তি প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেন।[১] ইতিহাসের কোন একটি নির্দিষ্ট যুগে ইউরোপ ও এশিয়ার নানা স্থানে বিভিন্ন জাতির ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য থাকা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। স্বাভাবিকভাবেই ভাষাতত্ত্ববিদেরা তাই এই সকল পরস্পর সাদৃশ্যমূলক ভাষার প্রকৃতি সম্পর্কে গবেষণা করে সেগুলির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পান, সেগুলির সম্ভাব্য উৎস সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন, এবং সংশ্লিষ্ট ভাষাগুলিকে আর্য

১। ষোড়শ শতকে ফ্লোরেন্সদেশীয় বণিক ফিলিপো সাসেতি সংস্কৃতের সঙ্গে ইউরোপীয় কয়েকটি ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে পি কোয়েউর্দো নামক জনৈক মিশনারী সংস্কৃত ভাষার একটি তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনা করেন যেখানে উদাহরণ হিসাবে সংস্কৃতের সঙ্গে কয়েকটি প্রাচীন ইউরোপীয় ভাষার সাদৃশ্য প্রদর্শিত হয়, কিন্তু তিনি এই সাদৃশ্যের কোন বিশেষ কারণ বা তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করেন নি। তিনি বাইবেলে উল্লিখিত ব্যাবেল টাওয়ারের কাহিনীকে সত্য বলেই মনে করতেন, এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ভাষার শব্দ বা ভঙ্গীসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করেন। ব্যাবেল-টাওয়ারের গল্পটি হচ্ছে অতীতে কোন এক সময় ব্যাবিলনে একটি গগনস্পর্শী মিনার গড়ে তোলার কাজে হাত দেওয়া হয়েছিল। পাছে ওই মিনার বেয়ে কোন লোক সোজাসুজি স্বর্গে চলে আসে এই আশংকায় ঈশ্বর স্থপতিদের ভাষা বদলে দেন, এবং কেউ কারো কথা বুঝতে না পারার দরুন ওই মিনার তৈরির কাজটি পরিত্যক্ত হয়।

বা ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারভুক্ত বলে পরিচিত করেন। ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন প্রখ্যাত মিশরতত্ত্ববিদ টমাস ইয়ং ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে।

কিন্তু এই আর্য নামক বিষয়টি কোনদিনই বিশুদ্ধ ভাষাতত্ত্বের এলাকায় আবদ্ধ থাকেনি। এই ধারণাটির সঙ্গে জাতিতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও রাজনীতির সংমিশ্রণ হয়, যার ফলে তা বহু উদ্দেশ্যসাধক হয়ে ওঠে। যদিও ম্যাক্সমুলার বলেছিলেন যে আর্য বলতে ভাষা ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না, তথাপি এই ভাষাতাত্ত্বিক সংজ্ঞা মনেপ্রাণে কেউই গ্রহণ করেননি। পেংকা ও তাঁর অনুগামীরা বলেন যে ভাষা কোন নিরালম্ব বস্তু নয়, যে কোন ভাষারই বিকাশ কোন জাতি বা নৃগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে হয় না। কাজেই আর্যভাষা একটি নৃগোষ্ঠীর মধ্যেই জন্মলাভ করেছিল এবং সেই নৃগোষ্ঠীর ব্যাপ্তি ও স্থানান্তর গমনের ফলেই এশিয়া ও ইউরোপের নানাস্থানে আর্য বা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ছড়িয়ে পড়ে। এই নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা ছিল নৃতাত্ত্বিক নর্ডিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত, অর্থাৎ সুসংবদ্ধ দেহ, দীর্ঘ আকার, লম্বা মাথা, উপ-বৃত্তাকার কপাল, সুচিহ্নিত ভুরু, লম্বা মুখ, শক্ত চিবুক, কপাল থেকে সোজাসুজি প্রলম্বিত সরু নাক, গোলাপী সাদা থেকে হালকা বাদামী গায়ের রং, হালকা বাদামী থেকে নীল চোখের তারা এবং বাদামী থেকে সামান্য লাল রঙের চুলবিশিষ্ট। এই মূল লক্ষণগুলি পাওয়া যায় স্ক্যান্ডিনেভিয়া অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে, কাজেই আর্যজাতির আদিভূমি ছিল ওই অঞ্চলেই। এইভাবেই একটি আর্যজাতির ধারণা গড়ে ওঠে।[১]

সে যাই হোক, তথাকথিত এই আর্য পরিবারের কিছু ভাষার অস্তিত্ব ইউরোপে আবিষ্কৃত হবার পর ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ তাঁদের সমকালীন স্বাজাত্যের প্রেরণায় এই ভাষাগুলিকে ইউরোপীয় জাতিসমূহের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য করেন যার পিছনে একটি গণ-মনস্তত্ত্ব ক্রিয়াশীল ছিল। যেহেতু, বিশেষ করে উনিশ শতকে, ইউরোপীয়রা জ্ঞান বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠতর ছিল সেই হেতু আর্যত্বের ভাষাবাচক এবং নৃতাত্ত্বিক বা জাতিবাচক সংজ্ঞার

১। যদি তর্কস্থলে এই বক্তব্যকে মেনেও নেওয়া যায়, তাহলেও জিজ্ঞাসা, একটি নৃগোষ্ঠীর পক্ষে হাজার হাজার মাইল এলাকা জুড়ে একটি বিশেষ ভাষাকে প্রতিদ্বন্দ্বী অসংখ্য ভিন্ন জাতি বা নৃগোষ্ঠীর উপর চাপিয়ে দেওয়া কি সম্ভব? ধর্মের নজীর দিয়ে দেখানো যায় যে এক জায়গায় উদ্ভূত ধর্ম সর্বব্যাপী হয়েছে যেমন, খ্রীষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম বা ইসলাম। কিন্তু এক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য যে খ্রীষ্টধর্ম ইহুদীদের মধ্যে উদ্ভূত হলেও তার বিশ্বব্যাপী প্রসার ইহুদিদের দ্বারা হয়নি, হয়েছে প্রধানত ইহুদীবিরোধী জাতিদের দ্বারাই। একথা বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রেও খাটে। কাজেই যদি ধরেও নেওয়া যায় যে সত্যই একদা নানাস্থানে আর্যভাষার প্রসার ঘটানো হয়েছিল, তা একমাত্র দ্বিতীয় পদ্ধতিটির দ্বারা হওয়া সম্ভব। যারা একাজে অগ্রণী হয়েছিল তারা 'জাতি' বা 'নৃগোষ্ঠী' হিসাবে আর্য নয়, ভিন্ন ভিন্ন নানা জাতি বা নৃগোষ্ঠী।

পাশাপাশি একটা শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাও গড়ে ওঠে। অর্থাৎ আর্যরা শুধু উন্নততর ভাষারই অধিকারী নয়, দৈহিক গঠনের দিক থেকেও তারা শ্রেষ্ঠ এবং তারা অন্যদের তুলনায় অধিকতর উন্নত মানসিকতার অধিকারী। ফলে এমন একটা মতবাদ গড়ে ওঠে যে সুপ্রাচীন কালে ইউরোপের মূল বা প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এই সুসভ্য সর্বগুণান্বিত আর্যজাতি তৎকালীন পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তাদের উন্নততর সভ্যতার মাধ্যমে প্রাচ্যের অনুন্নত জাতিগুলিকে সভ্য করার দায়িত্ব নিয়েছিল, রুডিয়ার্ড কিপলিং-এর ভাষায় যাকে বলা হয় হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন। এই তত্ত্ব উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের পক্ষে অনুকূল হাতিয়ার হয়েছিল।

পূর্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা চালিত হয়ে পণ্ডিতদের প্রথম ও প্রধান চেষ্টা হয়ে দাঁড়ায় কোন্ বিশেষ বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের ভাষাগুলির সর্বাধিক বিকাশ ঘটেছিল তা নির্ধারণ করা, তারই সূত্র ধরে মূল জাতিটিকে সনাক্ত করা এবং তাদের উৎপত্তিস্থল নির্ণয় করা। এই প্রতিযোগিতার প্রথম রাউণ্ডে জার্মানী ও সন্নিহিত অঞ্চলের পণ্ডিতরাই জিতে গিয়েছিলেন। তাঁরা এই ব্যাপারে এতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন যে ক্লাপ্রোথ ইন্দো-ইউরোপীয় এই পরিভাষাটির বদলে ইন্দো-জার্মানীয় কথাটির ব্যবহার প্রবর্তন করেন। আগেই বলা হয়েছে যে পেংকা আর্যদের নৃগোষ্ঠী-গত সংজ্ঞার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং তাদের স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া অঞ্চলের টিউটন গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত করার প্রয়াস পান।[১] মোটামুটিভাবে জার্মানীকে কেন্দ্র করে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া সহ মধ্য ইউরোপ, দক্ষিণে ডানিয়ুব নদীর তীর বরাবর এবং পূর্বে নিপার নদী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকাকে আদি আর্য প্রভাবিত অঞ্চল বলে গণ্য করা হয়। আগে ধারণা ছিল যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারে দুটি ধারা বর্তমান, এবং ধারা দুটির নামকরণ হয়েছিল শতবাচক শব্দ সেন্তুম ও সাতেম নামে। বলা হত যে ভিস্টুলা নদীর পশ্চিমদিকের ভাষাসমূহ সেন্তুম ধারার অন্তর্গত, পূর্বদিকের ভাষাসমূহ সাতেম ধারার। সেন্তুম অধ্যুষিত অঞ্চলই অধিকতর প্রাচীন আর্যদের বসতি এলাকা হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। ইংরাজ অধ্যাপক পি. গাইলস বলেন যে আর্যদের উদ্ভব ঠিক তেমন জায়গা থেকে হওয়া সম্ভব যেখানে কৃষিকাজ ও পশুপালন উভয়েরই সমান সম্ভাবনা আছে এবং সেই হিসাবে ডানিয়ুব উপত্যকাই হচ্ছে আর্যদের আদি বাসভূমি। টি. জে. এঙ্গেলব্রেখ্‌ট মনে

১। টিউটন বা জার্মান গোষ্ঠীর ভাষাসমূহ : (ক) স্ক্যাণ্ডিনেভীয় (সুয়েডীয়, ডেনো-নরওয়েজিয়ান ও আইসল্যাণ্ডিক) (খ) ডাচ, ফ্লেমিশ ও আফ্রিকান্স (শেষোক্তের সঙ্গে আফ্রিকার কোন সম্পর্ক নেই), (গ) ফ্রেসিয়ান (ঘ) ইংরাজী (ঙ) জার্মান এবং (চ) অধুনালুপ্ত গথিক।

করেন সুইডেনের সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলেই ছিল আর্যদের আদি বাসস্থান, কেননা ওই অঞ্চলের ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারভুক্ত এবং ওখানে প্রস্তর যুগের অনুসন্ধানে পর ঘোড়া ও রথের ব্যবহার দেখা যায়। জি. কোসিনা ও এইচ. হির্ট বলেন যে যেহেতু চেহারার দিক থেকে লিথুয়ানীয় ভাষাকে খুবই প্রাচীন দেখায়, সেহেতু মধ্য জার্মানী থেকে লিথুয়ানিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলই ছিল আর্যদের আদিভূমি। পরে অবশ্য আর্যত্বের বিচারে মধ্য ইউরোপের কৌলীন্য গেছে, এবং প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে পূর্ব ইউরোপ, বিশেষ করে রুশ দেশের এশীয় দক্ষিণাঞ্চল, যদিও আর্য প্রসঙ্গের সত্যাসত্য নির্ণীত হবার পথে দুস্তর বাধা এখনও বিদ্যমান।[১]

আর্য-শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা বিশেষ করে জার্মানীতে, জনপ্রিয় করেন নীটশে ও রোজেনবার্গ। শেষোক্ত দার্শনিকের প্রভাবেই হিটলার প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে অতীতে যেমন আর্যরা বিশ্ববিজয় করেছিল, ভবিষ্যতেও তেমনই নাৎসি জার্মানী সহস্র বছরের আর্যশাসন জগত জুড়ে চালাবে। আর্য-ধারণাটিকে তৎকালীন বৃটিশ শাসকগণ ভারতবর্ষে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেন। এই ধারণাটি শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত ভারতীয়দের হীনমন্যতা দূরে করতে কিছুটা সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই। উচ্চবর্ণের ভারতীয়রা ও তাদের তৎকালীন মনিবেরা যে আসলে একই গাছের ফল, এই রকম বিশ্বাসের একটা মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য ছিল, বিশেষ করে ইংরাজরা যখন তাদের বলত 'আওয়ার আরিয়ান ব্রিদরেন, দা মাইল্ড হিন্দু'। পক্ষান্তরে আর্য নামক ধারণাটি ভারতের মুক্তি সংগ্রামেও প্রেরণাদায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেছে যে আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল 'গৌরবময় আর্য অতীতের পুনরুদ্ধার'। সেই হিসাবে আর্য শব্দটি আজও এখানে জনপ্রিয়। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে এখানকার অতীত জীবনের যা কিছু ভাল দিক তা সবই নাকি ওই আর্যসভ্যতার দান। যা কিছু মন্দ ও কুসংস্কারমূলক সবই অনার্য। আজকাল বাংলায় আবার আর্যেতর বলে একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়।

বৈদিক সাহিত্য যে ভাষায় রচিত তা ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের মতে আর্য বা ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের, কিন্তু যাঁরা এই সাহিত্য রচনা করেছিলেন তাঁরা এদেশীয় না বহিরাগত, লম্বা না বেঁটে, কালো না ফর্সা, গোলমুণ্ড না লম্বামুণ্ড, তা জানার কোন উপায় নেই। গোটা বৈদিক সাহিত্যে এমন

১। কেউ কেউ আর্যদের আদিভূমি সম্পর্কে বেশ রোমান্টিক ধারণা পোষণ করতেন। বালগঙ্গাধর টিলক ও হারমান ইয়াকোবি উত্তর মেরু অঞ্চলকে আর্যদের আদিভূমি বলেছেন। স্ট্রৎসাইগোভ্স্কি গ্রীনল্যাণ্ডে আর্যদের আদিভূমি নির্দিষ্ট করেছেন। জে. ডি. মর্গানের মতে ইউরোপে যখন হিমবাহ যুগের কাল তখন উত্তর-পূর্ব এশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চল উষ্ণ ও মনুষ্য-বাসের উপযোগী ছিল। আর্যদের উদ্ভব সেখান থেকেই।

একটি লাইনও পাওয়া যায় না যা থেকে কোন সুনির্দিষ্ট ভাষাবলম্বী নৃগোষ্ঠীকে এই সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করা যায়। আর্য শব্দটি বৈদিক সাহিত্যে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে বটে, কিন্তু শব্দটির কোন ভাষাবাচক বা জাতিবাচক তাৎপর্যের ক্ষীণতম আভাস সেখানে নেই। সর্বোপরি যেহেতু বৈদিক সাহিত্য কোন অখণ্ড অবিমিশ্র সংস্কৃতির পরিচয় দেয়না, যেহেতু সেখানে বহু জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন ও পরিবর্তনশীল নানা সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়, সেইহেতু আর্য-অনার্য প্রসঙ্গ—ভাষাঘটিত ব্যাপার ছাড়া অন্য কোন অর্থে—ভারত ইতিহাসে একেবারেই মূল্যহীন। কাজেই আর্যরা কারা ছিল, তারা কোথা থেকে এসেছিল, এই সকল কথা ঐতিহাসিক বোঝাপড়ার পক্ষে একেবারেই অবান্তর। যেটুকু নিশ্চিতভাবে বলা যায় তা হচ্ছে এই যে, ভারত-ইতিহাসের কোন একটি নির্দিষ্ট যুগে তৎকালীন ভারতীয়দের দ্বারাই বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়েছিল, যে সাহিত্য থেকে ওই যুগের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষদের জীবনযাপন সম্পর্কে বহু কথা জানা যায়, যাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা সত্ত্বেও ভাষার ক্ষেত্রে একটি বন্ধন ছিল, এই পর্যন্ত।

ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব: আর্যদের নিয়ে দুশো বছরের গবেষণার হিসাবনিকাশ করার প্রয়োজন নেই। শুধু বলা যায় যে মেরুপ্রদেশ, বাল্টিক অঞ্চল, ডানিয়ুব অববাহিকা, কার্পেথিয়ান সমভূমিসহ মধ্য ইউরোপীয় স্টেপভূমি অঞ্চল, সাইবেরিয়া, ইউক্রানীয় স্টেপভূমি, আলতাই ও কাজাকস্তানের মধ্যবর্তী নিম্ন ভলগা অঞ্চল, ককেশাস ও পূর্ব-ইউরোপের মধ্যবর্তী দক্ষিণ রাশিয়া, তুর্কমেনিয়া, উত্তর পশ্চিম কিরঘিজ স্টেপভূমি, পামির, তিব্বত, এশিয়া মাইনর, ব্যাকট্রিয়া অথবা সোগডিয়ানা, মধ্য এশিয়ার মালভূমি, ভারতের সপ্তসিন্ধু অঞ্চল—প্রতিটি এলাকাকেই কেউ না কেউ আর্যদের আদিভূমি বলে দাবি করেন। আর্যদের আবির্ভাবের কাল নিয়েও নানা সংশয়। ১০,০০০ থেকে ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে নানা সময়কে আর্য আবির্ভাবের কাল বলে বিভিন্ন পণ্ডিত মনে করেন।

ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে আর্য বা ইন্দো-ইউরোপীয়ভাষীদের বিভিন্ন শাখা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে মূল ভাষাটির ক্ষেত্র ছিল ক্রমপ্রসারমান। আর্যভাষা পরিবারের সকল শাখার পার্থক্য একই সময়ে হয়নি। হিত্তাইত ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ওই শাখাটি মূল ভাষা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এমন সময় যখন মূল ভাষাতেই তালব্য বর্ণসমূহের উদ্ভব হয়নি। ভাষাতত্ত্ববিদরা এটাও লক্ষ্য করেন যে সাতেম উপভাষাসমূহের উদ্ভব সেন্তুম উপভাষাগুলির তুলনায় অর্বাচীন, কেননা প্রথম ক্ষেত্রে মূর্ধণ্য ও তালব্য বর্ণসমূহের সুস্পষ্ট সহাবস্থান সুনির্দিষ্ট, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা তেমন সুস্পষ্ট

নয়।[১] এটাও লক্ষ্য করা গেছে যে ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের মূল ও শাখা উভয় ক্ষেত্রেই ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটেছে। যে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় থেকে হিত্তাইত শাখাটি বিচ্ছিন্ন হয়েছিল এবং যে মূল থেকে প্রাক-হেলেনীয় শাখাটি বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, দুটি মূল এক নয়—দ্বিতীয়টি রীতিমত রূপান্তরিত। মূল ভাষাটি যদি নিয়ত পরিবর্তনশীল না হত তাহলে উপজাত ভাষাগুলির অসংখ্য আপাত-বিভ্রান্তিকর বৈশিষ্ট্যসমূহকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হত না।

এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের হট্টমেলায় ভারতবর্ষেরও একটি বিশেষ ভূমিকা আছে, কেননা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্য ভারতবর্ষেই বর্তমান। বস্তুত যাঁরা ভারতবর্ষকে তথাকথিত আর্যদের আদিভূমি বলে গণ্য করতে চান তাঁদের প্রধান বক্তব্যই হল, যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বা জাতি বা সংস্কৃতি নিয়ে এত হৈ চৈ, তার প্রাচীনতম এবং প্রমাণ্যতম নিদর্শন ঋগ্বেদ এবং একমাত্র ঋগ্বেদই। বৈদিক সাহিত্য ছাড়া তথাকথিত আর্যত্বের আর কোন সঙ্গতিপূর্ণ, সুসংবদ্ধ এবং ব্যাপকতর নিদর্শন আর কোথাও নেই। তাঁদের দ্বিতীয় যুক্তি স্থানান্তর গমনকারী মানুষেরা তাদের পিতৃভূমিকে বহুকাল ধরে স্মরণে রাখে। আর্যরা যদি বাইরে থেকে এদেশে এসে থাকে তার ক্ষীণতম ইঙ্গিতও বৈদিক তথা বিপুল সংস্কৃত সাহিত্যে থাকবেনা, এটা কিরকম কথা ?

এই প্রসঙ্গে ভাষাতত্ত্ববিদরা বলেন যে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্য ভারতবর্ষেই বর্তমান। কিন্তু বৈদিক ভাষাই আমাদের জানা প্রাচীনতম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার নিদর্শন নয়। ঋগ্বেদের রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০-১০০০-এর মধ্যে। এবং যে মানুষদের দ্বারা ঋগ্বেদ রচিত হয়েছিল তাঁরা নিশ্চয়ই খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে সিন্ধু-গাঙ্গেয় অঞ্চলের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা আরও বলেন যে ভারতীয় অর্থাৎ বৈদিক ভাষা তুলনামূলকভাবে অর্বাচীন সাতেম ধারার অন্তর্গত। ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের অধিকাংশ ভাষাই ইউরোপের অপেক্ষাকৃত অল্পপরিসর এলাকার মধ্যে বণ্টিত, এবং একমাত্র লিথুয়ানীয় ভাষাতেই ইন্দো-ইউরোপীয় প্রাচীনতম মূল শব্দগুলি পাওয়া যায়, সংস্কৃতে নয়। এছাড়াও তাঁরা বলেন যে যদি ভারতবর্ষই আর্যদের আদিভূমি হবে তাহলে তারা ভারতের বাইরে ছড়িয়ে পড়ার আগে গোটা ভারতবর্ষকে আর্য করেনি কেন ? যদি এটাও জানা যেত যে হরপ্পা সভ্যতার

১। সেন্তুম ধারার ভাষাগোষ্ঠীগুলি হল কেলটীয়, টিউটনীয় বা জার্মান, ইতালীয়, হেলেনীয় বা গ্রীক, হিত্তাইত এবং তোখারীয়। সাতেম ধারাটি আলবানীয়, লেটীয় এবং স্লাভীয়, আর্মেনীয় এবং ইন্দো-ইরানীয় (অর্থাৎ ইরানীয় এবং ভারতীয়) নিয়ে গঠিত।

ভাষা ছিল সংস্কৃত তাহলেও না হয় কথা ছিল। অবশ্য এগুলিও যুক্তি হিসাবে খুব জোরালো নয়। লিথুয়ানীয় ভাষাও সাতেম গোষ্ঠীর এবং অর্বাচীন। তাতে কিছু ইন্দো-ইউরোপীয় মূল শব্দ আছে যেগুলির চেহারার প্রাচীনত্ব ওই ভাষার একটি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকারই পরিণতি। দক্ষিণভারতে আর্যকরণ হয়নি, কিন্তু আর্যকরণ (আরিয়ানাই-জেসন) ব্যাপারটাই ধোঁয়াটে। কার্যত এক জায়গার ভাষা অপর জায়গার ভাষার উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না, যদিও একভাষার লোকেরা অপর ভাষা থেকে তাদের নিজেদের ভাষায় নানা শব্দ গ্রহণ করতে পারে। সংস্কৃত ভাষার মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় নয় এমন শব্দের সংখ্যা প্রচুর। একথা গ্রীকভাষার ক্ষেত্রেও সত্য।

আসলে ভারতবর্ষ থেকে ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য ভাষার উৎপত্তি হয়েছে এবং এখান থেকেই তা ভারতের বাইরে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছিল একথা যেমন প্রমাণ করা যায় না, ঠিক তেমনই অন্য কোন জায়গা থেকে আর্য বা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা উদ্ভূত হয়েছিল এবং তা কোন একটি বিশেষ যুগে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল একথাও প্রমাণ করা যায় না। আর্য বা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির ভৌগোলিক বণ্টন কোন বিশেষ এলাকায়, কোন বিশেষ যুগে, কোন সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত জনসমাজের বসতি বা স্থানান্তর গমনের ইঙ্গিত দেয় না, বড় জোর এটুকু বলা যায় যে অমুক অমুক জাতির ব্যবহৃত ভাষায় এতগুলি ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দ আছে, বা ইন্দো-ইউরোপীয় প্রকাশ ভঙ্গীর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। এক জাতি কর্তৃক অপর জাতিকে বিতাড়িত করে তাদের জায়গায় বসতি স্থাপন করা অতীত যুগের নিত্যকালের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু যেহেতু বিজয়ী জাতিটির ব্যবহৃত ভাষায় এতগুলি ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দ আছে সেই কারণেই তারা আর্য, এবং তাদের বিজয়লাভ অনার্য জাতির উপর আর্য বিজয়ের পরিচায়ক, এরকম যুক্তিকে দাঁড় করানো যায় না, এবং বহু চেষ্টা সত্ত্বেও দাঁড় করানো যায়নি।

পশ্চিম এশিয়ায় যে সকল জাতি বা নৃগোষ্ঠীকে আর্যদের সঙ্গে সম্পর্কিত করার চেষ্টা করা হয় তাদের মধ্যে ক্যাসাইট, হিত্তাইত ও মিতান্নিরা উল্লেখযোগ্য। ক্যাসাইটরা খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি ব্যাবিলোনিয়ার ধ্বংসসাধন করে। তারা অশ্বের ব্যবহার জানত এবং তাদের ভাষায় কিছু কিছু ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দ ছিল (যেমন সুরিয়স = সূর্য), কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাদের ভাষা ছিল ভিন্ন। হিত্তাইতরা ১৯৫০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে এশিয়া মাইনরের (বর্তমানে এশীয় তুরস্ক) কাপ্পাডোসিয়া অঞ্চল থেকে প্রাচীনতর আসিরীয় বসতিসমূহকে উৎখাত

করে এবং খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ওই অঞ্চলে প্রভুত্ব করে। হিত্তাইতদের ব্যবহৃত ভাষা মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কাছাকাছি, এত সন্নিকট যে তাকে কন্যাভাষা না বলে ভগ্নীভাষা বলা হয়, যা থেকে অনুমান করা যায় যে তারা মূল ভাষা পরিবার থেকে একেবারে গোড়ার দিকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। মিতান্নিরা খ্রীষ্টপূর্ব ষোড়শ থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যে মেসোপোটামিয়ার উত্তরাঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করে। এদের ভাষাও ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের।

এই শতকের গোড়ার দিকে হুগো উইংকলার এশিয়া মাইনরের কাপ্পাডোসীয় অঞ্চলে বোঘাজ-কোই (বর্তমান এশীয় তুরস্কের অন্তর্গত বোঘাজ কালে) নামক স্থানে একটি লেখ আবিষ্কার করেন। এটি ১৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রচিত হিত্তাইত ও মিতান্নিদের মধ্যে একটি সন্ধিচুক্তি যেখানে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও নাসত্য এই চারজন বৈদিক দেবতার নাম আছে। ওখানকার আরও একটি লেখ-এ ইন্দো-ইউরোপীয় সংখ্যাবাচক কিছু শব্দ বর্তমান। মিশরের অন্তর্গত এল আমার্না নামক স্থানে আবিষ্কৃত ব্যাবিলোনীয় কিউনিফর্ম লিপিতে রচিত কিছু লেখ থেকে জানা যায় যে আনুমানিক ১৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ সিরিয়া অঞ্চলে এমন কিছু রাজা রাজত্ব করেছিলেন যাঁদের নামের ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ধরনের। বোঘাজ-কোই লেখ-এ উল্লিখিত দেবতাদের প্রসঙ্গে হারমান ইয়াকোবি এবং পার্গিটার বলেন যে এই সকল দেবতাদের উপাসনা ভারতবর্ষ থেকে পশ্চিম এশিয়ায় রপ্তানি হয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতই এই সিদ্ধান্ত করেন যে বোঘাজ-কোই লেখ-এর ভাষা প্রাচীন বৈদিক ও প্রাচীন ইরানীয় ভাষার প্রাক্‌পর্যায়, বৈদিক ভারতীয় ও প্রাচীন ইরানীয়দের পূর্বপুরুষেরা অবিভক্ত অবস্থায় পশ্চিম এশিয়ায় বাস করত খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতকে, পরে তারা পূর্বাভিমুখী হয়ে ইরান ও ভারতবর্ষে প্রবেশ করে।

কিন্তু সমস্যা হল যে যারা ১৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ পশ্চিম এশিয়ায় প্রাক্‌-বিভক্ত পর্যায়ে বাস করত, এবং এমন ভাষায় কথা বলত যে ভাষা প্রাচীন ইরানীয় ও বৈদিকের পূর্বসূরী, সেক্ষেত্রে কিভাবে তাদেরই বিভক্ত বংশধরেরা ওই সময়ের শতবর্ষ পূর্বে ভারতবর্ষের মত দূরবর্তী দেশে বাস করতে পারে এমন কি ভাষার দিক থেকেও বিভক্ত হয়ে যেতে পারে? এটা অসম্ভব। তাই বলা হল যে ভারতে এবং ইরানে যে সকল আর্য বসতি স্থাপন করেছিল তারা একটি ভিন্ন শাখার, যারা তাদের আদি নিবাস থেকে ২০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ নাগাদ পামির অঞ্চলে (এডুয়ার্ড মেয়ার) অথবা রুশীয় তুর্কীস্তান অঞ্চলে (হাৎসফেল্ট) চলে আসে। সেখান থেকে তারা দুইভাগে বিভক্ত

হয়ে ইরানে আর ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে যারা পশ্চিম এশিয়ায় বসতি স্থাপন করেছিল তারা ভিন্ন শাখার। এই শাখার হিত্তাইতরা ১৯৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ কাপ্পাডোসিয়া থেকে প্রাচীনতর আসিরীয় উপনিবেশগুলিকে ধ্বংস করে বসতি স্থাপন করেছিল।

এই সকল ধারণার ভিত্তিতে অনুমান করা হয় যে যদি ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে ইন্দো-ইউরোপীয়দের দুটি শাখা যথাক্রমে পশ্চিম এশিয়ার কাপ্পাডোসিয়া এবং মধ্য এশিয়ার পামীর বা তৎসংলগ্ন অঞ্চলে থাকতে পারে, তাহলে তাদের আদিভূমি এমন একটি অঞ্চলে হওয়া সম্ভব যে অঞ্চলটি ওই দুই স্থান থেকে মোটামুটি সমদূরবর্তী। ভৌগোলিক দিক থেকে এই সম্ভাব্য অঞ্চলটিকে দক্ষিণ রাশিয়ার কিরঘিজ স্টেপভূমির সঙ্গে সনাক্ত করা হয়। এই এলাকাটি উরাল পর্বতমালার দক্ষিণে অবস্থিত। ব্রান্ডেনস্টাইন বলেন যে প্রাচীনতর ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দাবলী থেকে এমন সব গাছপালা পশুপাখির পরিচয় পাওয়া যায় যাদের অস্তিত্ব কোন পর্বতমালার সানুদেশে অবস্থিত বিস্তৃত তৃণভূমির মধ্যেই সম্ভব। পক্ষান্তরে তুলনামূলকভাবে কিছুটা অর্বাচীন শব্দাবলী থেকে জলাভূমি, ভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রান্ডেনস্টাইনের মতে প্রাচীনতর শব্দাবলীর দ্বারা সূচিত কিরঘিজ স্টেপভূমি থেকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষীদের একটি শাখা কার্পেথিয়ান পর্বতমালা অঞ্চলে যাত্রা করে এবং কালক্রমে ইউক্রানিয়া অঞ্চলে অধিবসতি করে। ইউক্রানিয়ার অন্তর্গত ত্রিপোলিয়ে নামক স্থানের প্রাগৈতিহাসিক অবশেষসমূহের সঙ্গে নেহারিং এই আগন্তুকদের সম্পর্কিত করেন। তারও পূর্বে মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল ইন্দো-ইরানীয় শাখাটি, যেটি পামির কিংবা রুশীয় তুর্কীস্তান অঞ্চলে বসতি করে। পূর্ব তুর্কীস্তানে তোখারিয়ান নামক সেন্তুম ধারার ভাষা আবিষ্কার, অ-ইন্দো-ইউরোপীয় ফিনো-উগ্রীয় ও সেমিটিক ভাষার উপর ইন্দো-ইউরোপীয় প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ও দক্ষিণ রাশিয়ার অনুকূলে অনুমান করতে সহায়তা করে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ নেই।

প্রত্নতত্ত্ব এ বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত দেয়না। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে কোন জনবসতির আকস্মিক ধ্বংস প্রাপ্ত হবার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, একটি বসতির উপর আগন্তুক কোন সংস্কৃতিকে সনাক্ত করা যায়, কিন্তু বলা যায় না যারা ধ্বংস করেছিল বা অনুপ্রবেশ করেছিল তারা কারা, বা তাদের ভাষা কি ছিল, যদি না কোন উৎকীর্ণ লেখ আবিষ্কৃত হয়। আর্যপ্রসঙ্গে বোঘাজকোই ছাড়া আর কোন লেখ পাওয়া যায় না যাতে সত্যই কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্রে আবিষ্কৃত বিশৃংখল

ধরনের নিদর্শনসমূহের ভিত্তিতে, বিশেষ করে এক জায়গার নিজস্ব মৃৎপাত্র-শিল্পের ক্ষেত্রে বহিরাগত মৃৎশিল্পের অনুপ্রবেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন যে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকে বহিরাগত জনগোষ্ঠীর চাপে পশ্চিম এশিয়ায় একটা বিরাট ওলোট-পালোট ঘটেছিল। তবে এই বহিরাগতরা যে আর্য ছিল তা বলার কোন উপায় নেই। কোন প্রত্নক্ষেত্রে আবিষ্কৃত নরকংকাল থেকে নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী নির্ণয়ের চেষ্টা করা যেতে পারে, তবে এ পর্যন্ত ওই সুবিস্তৃত অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত কংকালসমূহে কল্পিত আর্য দৈহিক লক্ষণের ইঙ্গিত পাওয়া যায় নি, সর্বত্রই একাধিক নৃগোষ্ঠীর মানুষের হদিশ পাওয়া গেছে।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব ও আর্য সমস্যা ঃ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বাইরের কোন জায়গা থেকে আর্যদের আগমন প্রত্নতত্ত্ববিদরা বিনা প্রমাণেই কিছুটা পূর্ব-সংস্কারের বশেই যেন মেনে নিয়েছেন। তদনুযায়ী মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার কয়েকটি উৎখনিত জনবসতির কতিপয় বৈশিষ্ট্যকে তাঁরা আর্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে ধরে নিয়েছেন এবং ভারতবর্ষের প্রত্নক্ষেত্রসমূহে অনুরূপ কোন বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পেলে তাঁরা সেগুলিকে আর্য অধিকারের নিদর্শন হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন, যদিও তাতে বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায়নি।

১৯২৮ থেকে ১৯৩৪ এর মধ্যে মাধোস্বরূপ ভাটস (বৎস) হরপ্পায় সিমেট্রি-এইচ নামে একটি সমাধিক্ষেত্র আবিষ্কার করেন যার কথা পূর্বে বলা হয়েছে। এই সমাধিক্ষেত্রে যে সকল সামগ্রী পাওয়া গেছে সেগুলি হরপ্পীয় ধরনের নয়, ভিন্ন এবং হরপ্পা-উত্তর সংস্কৃতির পরিচায়ক। ১৯৩৪-এ গর্ডন চাইল্ড বলেন যে এই সিমেট্রি-এইচ সংস্কৃতি আসলে ছিল আর্যদের, যারা হরপ্পীয়দের ধ্বংস করে তাদের জায়গায় নিজেদের বসতি স্থাপন করে। ১৯৩৬-এ বি. এন. দত্ত বৈদিক গৃহ্যসূত্রে বর্ণিত পাত্রসমাধির সঙ্গে সিমেট্রি-এইচ এর সমাধি ব্যবস্থার সাদৃশ্যের কথা বলেন এবং সিমেট্রি-এইচ সংস্কৃতিকে আর্য বলে ঘোষণা করেন। ১৯৪০-এ ভাটস তাঁর হরপ্পার উপর রিপোর্টেও ওই একই কথা ব্যক্ত করেন। ১৯৪৭-এ হুইলার এই বক্তব্যকে জোরের সঙ্গে সমর্থন করে বলেন যে সিমেট্রি-এইচ সংস্কৃতির মানুষেরা শুধু আর্য ছিল না, তারা হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসের জন্যও দায়ী ছিল। ১৯৪৬-এর খননকার্যে হরপ্পায় যে প্রতিরক্ষা প্রাকারের পরিচয় পাওয়া যায় এবং হরপ্পার পশ্চিম প্রবেশপথের উপর তাড়াহুড়ো করে তৈরি করা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তারই ভিত্তিতে তিনি একটি বহিরাক্রমণের সম্ভাবনা ব্যক্ত করেন। এছাড়া পূর্বে রমাপ্রসাদ চন্দ যে ঋগ্বেদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বৈদিক যুদ্ধ দেবতা ইন্দ্র কর্তৃক অনার্যদের পুর বা নগর ধ্বংসের

কাহিনীর অবতারণা করেছিলেন হুইলার সেই কাহিনীকে হরপ্পার ধ্বংসের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য হিসাবে হুইলার মহেঞ্জোদরোর উপরের সংস্তরগুলির উল্লেখ করেন যেখানে একটা সামগ্রিক বিশৃংখল অবস্থা পরিলক্ষিত হয়, যা আকস্মিক ধ্বংস কার্যের ইঙ্গিতবাহী। উপরের সংস্তরে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকা নরকংকালসমূহকে হুইলার গণহত্যার নিদর্শন হিসাবে মনে করেন।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে স্টুয়ার্ট পিগট মোটামুটিভাবে হুইলারের বক্তব্যকে সমর্থন করেন। তাঁর মতে উত্তর বালুচিস্তানের রানা ঘুণ্ডাই এবং ডাবরকোট এবং দক্ষিণ বালুচিস্তানের নালের প্রত্নক্ষেত্রে অগ্নিদগ্ধ বসতির পুরু স্তর লক্ষ্য করা যায় যা সুপরিকল্পিত ধ্বংসকার্যের পরিচায়ক। এ-ছাড়া তিনি শাহীটুম্পের সমাধিক্ষেত্রে প্রাপ্ত কিছু সামগ্রী, সিন্ধুপ্রদেশের ছানহুদরোতে ঝুকর সংস্কৃতির অস্তিত্ব, মহেঞ্জোদরো থেকে প্রাপ্ত বিশেষ ধরনের বাইস, কুররম থেকে প্রাপ্ত ডুমোযুক্ত কুঠার, রূপনপুর থেকে প্রাপ্ত ছুরিকা প্রভৃতি সূত্র থেকে বহিরাগত জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশের কল্পনা করেন। বিষয়টি আরও একটু পরিষ্কার করা দরকার। দক্ষিণ বালুচিস্তানে শাহীটুম্পের একটি সমাধিক্ষেত্রে তাম্রনির্মিত কিছু সীল, হাতল ঢোকাবার গর্তযুক্ত তামার কুঠার এবং খুরোযুক্ত পাত্র পাওয়া গেছে। সীলগুলি ইরানের আনাউ এবং হিসারের তৃতীয় স্তরে প্রাপ্ত সীলের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। কুঠারটি পশ্চিম এশীয় ধরনের এবং অনুরূপ সামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে দক্ষিণ রাশিয়ার মাইকোপ এবং ৎসাসর্কায়া থেকে। এগুলিকে ১৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে স্থান দেওয়া যায়। মুণ্ডিগকের চতুর্থ ও পঞ্চম সংস্তরে প্রাগুক্ত শাহীটুম্প ধরনের সামগ্রী পাওয়া যায়। সিন্ধুপ্রদেশের অম্রী, ঝুকর, ছানহুদরো, লোহুমজোদরো প্রভৃতি স্থানে একটি সমজাতীয় নূতন সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় যা ঝুকর সংস্কৃতি নামে পরিচিত। এই সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য শাহীটুম্প ধরনের হাতল ঢোকাবার গর্তওয়ালা কুঠার, তামার পিন, চতুষ্কোণ অথবা গোলাকার পাথরের সীল প্রভৃতি, যেগুলির সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার সামগ্রীর সাদৃশ্য আছে। ছানহুদরো এবং সিন্ধুর অপর তীরবর্তী ঝঙ্গরে ঝুকর সংস্কৃতির অবশেষের উপর অন্য এক ধরনের সংস্কৃতির বিকাশ দেখা যায়, যার বৈশিষ্ট্য নিম্নমানের মৃৎশিল্প।

মোটের উপর বলা যায় যে এই সকল এবং আরও নানা স্থানে খননকার্য অথবা অনুসন্ধানের ফলে পুরাতন সংস্কৃতিসমূহের উপর কয়েকটি আগন্তুক সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, হাতিয়ার ও মৃৎপাত্রের ক্ষেত্রে যেগুলি ভিন্ন ঐতিহ্য বহন করে। এই সকল অপকৃষ্ট সংস্কৃতিকে আর্য হিসাবে সনাক্ত

করার প্রবণতা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে বর্তমান, এবং এই সনাক্তকরণের যা মাপকাঠি তা হচ্ছে ভারতের বাইরের অন্য জায়গায় প্রাপ্ত সামগ্রীর সঙ্গে প্রকৃত বা কল্পিত সাদৃশ্যের ধারণা। কিন্তু যে কথাটি স্পষ্ট করে বলা দরকার তা হচ্ছে এই যে বৈদিক সাহিত্যে যে সকল সংস্কৃতির পরিচয় বর্ণিত হয়েছে সেগুলির সঙ্গে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানলব্ধ এই সকল সংস্কৃতি মেলে না। রানা ঘুণ্ডাই, ডাবরকোট ও নালে বহিরাগতগণ কর্তৃক ধ্বংসকার্যের যে বিবরণ পিগট দিয়েছেন, সে প্রসঙ্গে বলা যায় যে যদি তর্কচ্ছলে মেনেও নেওয়া যায় যে, সত্যই এমন কোন ধ্বংসকার্য ঘটানো হয়েছিল, সেগুলি যে একই সময়ে ঘটেছে তার কোন প্রমাণ নেই, তদুপরি এই সকল সংস্কৃতির স্তরবিন্যাস এবং কালনির্ণয়ের ব্যাপারে এখনও প্রভূত সংশয় বর্তমান। শাহীটুম্প সমাধিক্ষেত্র, ঝুকর সংস্কৃতি, প্রভৃতি যদি বহিরাগতদের অনুপ্রবেশের ইঙ্গিতবাহী হয়, সেখানকার প্রত্নসামগ্রীর বিন্যাস অত্যন্ত ধীরগতি অনুপ্রবেশের সূচনা করে এবং এই অনুপ্রবেশের সঙ্গে হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসসাধনের কোন কার্যকারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যায় না। হুইলারের তত্ত্ব অনুযায়ী যদি বলা হয় যে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ সিমেট্রি-এইচ সংস্কৃতির স্রষ্টা আর্যরা হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংস করেছিল, এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে অধুনা হরপ্পা সভ্যতার অবসানকাল ১৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ বলে প্রমাণিত হয়েছে, যার ফলে আগেকার ধারণাকে আর বজায় রাখা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, সিমেট্রি-এইচ-এর বসতি হরপ্পা ধ্বংসের পরেই গড়ে ওঠেনি, তা গড়ে উঠেছিল বহু পরে, যে বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ আছে। তৃতীয়ত সিমেট্রি-এইচ সংস্কৃতিকে যদি আর্য বলে মানতে হয় তাহলে এই সংস্কৃতির এলাকা আরও ব্যাপক হওয়া উচিত। কিন্তু পাকিস্তানের ভাওয়ালপুরের দুটি কেন্দ্র ছাড়া সিমেট্রি-এইচ সংস্কৃতির নিদর্শন আর কোথাও পাওয়া যায়নি।

সিমেট্রি-এইচ সংস্কৃতি যে আর্যদের এবং সেই সংস্কৃতির মানুষেরা যে হরপ্পার ধ্বংসসাধন করেছিল এই তত্ত্বের বিরোধিতা করেন বি. বি. লাল ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি দেখান যে তাড়াহুড়ো করে তৈরি তথাকথিত প্রতিরক্ষামূলক নিদর্শনসমূহ—যেখানে সিমেট্রি-এইচ মৃৎশিল্পের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়—এবং হরপ্পীয় অধ্যায়ের মধ্যে একটি অন্তর্বর্তী ধ্বংসস্তূপের সংস্তর বর্তমান। ১৯৬২-তে অমলানন্দ ঘোষ বলেন যে উৎখননের ফলে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি যা থেকে কোন পর্যায়ে হরপ্পীয়দের সঙ্গে আর্যদের সংস্পর্শ প্রতিপাদিত হয়। ১৯৬৪-তে জি. এফ. ডেলস বলেন যে মহেঞ্জোদরোতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নরকঙ্কালসমূহ থেকে হুইলার বর্ণিত গণহত্যা

প্রমাণিত হয় না। বস্তুত হরপ্পা সভ্যতা আর্যদের দ্বারা ধ্বংস হয়েছিল এই ধারণা ছয়ের দশক থেকেই গুরুত্ব হারায়।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চানন মিত্র উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের তাম্রসঞ্চয় কেন্দ্রগুলির সঙ্গে আর্যদের সম্পর্কিত করার চেষ্টা করেন। ১৯৩৬-এ এই ধারণাটিকে হাইনে গেলডার্ন কয়েকটি নির্দিষ্ট উদাহরণের ভিত্তিতে দাঁড় করাবার প্রয়াস পান। তিনি সালোঝান থেকে প্রাপ্ত ছিদ্রযুক্ত কুঠার, ফোর্ট মানরো থেকে প্রাপ্ত পাখার মত হাতলযুক্ত তরবারি, শাহীটুম্প এবং ছানহুদরো থেকে প্রাপ্ত বাঁট লাগানোর গর্তসহ কুঠার, মহেঞ্জোদরো থেকে প্রাপ্ত হাতলের উপযোগী গর্তসহ বাইস, গঙ্গা উপত্যকায় প্রাপ্ত বর্শাফলক এবং ফতেগড় ও কাল্লুর থেকে প্রাপ্ত শৃঙ্গল তরবারি প্রভৃতিকে পশ্চিম এশিয়া, উত্তর ককেশাস, দক্ষিণ রাশিয়া ও আফগানিস্তানে প্রাপ্ত আয়ুধসমূহের সঙ্গে তুলনা করেন ও বলেন যে ওইগুলি আর্যদের হাতিয়ার যারা ১২০০-১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ ভারতে আসে। গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রাপ্ত বর্শাফলক ও শৃঙ্গল তরবারির প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন যে যেহেতু এগুলি কোন সুনির্দিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক স্তরে এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পাওয়া যায়নি সেই কারণেই এগুলিকে উত্তর পশ্চিমের আর্যদের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে হবে। স্টুয়ার্ট পিগট ১৯৪৪-এ এই মত বহুলাংশে সমর্থন করলেও ১৯৫০-এ তিনি বলেন যে গাঙ্গেয় অঞ্চলের এই সব আয়ুধ আসলে হরপ্পীয় শরণার্থীদের, যারা হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংসের পর পাঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চল পরিত্যাগ করে আরও পূর্বদিকে চলে আসে। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে বি. বি. লাল হাইনে গেলডার্নের তত্ত্বের বিরোধিতা করেন। তিনি দেখান যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের আয়ুধসমূহের সঙ্গে গাঙ্গেয় অঞ্চলের আয়ুধের কোন ধরনগত ঐক্য প্রমাণ করা যায় না। উভয়ের উৎস ভিন্ন। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গেলডার্ন মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা ও ছানহুদরো থেকে প্রাপ্ত আরও কিছু আয়ুধের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত পুনর্ঘোষণা করেন। তিনি বলেন সিন্ধুপ্রদেশ, কুররম উপত্যকা, গাঙ্গেয় অঞ্চল, প্রতিটি স্থান থেকেই প্রাপ্ত আয়ুধসমূহের কাল ১২০০ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ এবং এগুলি সুনির্দিষ্টভাবেই ককেশিয়া, পূর্ব আনাতোলিয়া এবং পশ্চিম ইরানীয় সামগ্রীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই কালগত ও বস্তুগত বৈশিষ্ট্যকে আর্য পটভূমিকা ব্যতিরেকে আর কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? গাঙ্গেয় উপত্যকায় শৃঙ্গল তরবারির উৎস তিনি কোবান সংস্কৃতির মধ্যে অন্বেষণ করার প্রয়াস করেন। কিন্তু এস. পি. গুপ্ত বলেন যে গাঙ্গেয় দোয়াব অঞ্চলের তাম্রসামগ্রী দেশজ শিল্পধারারই অভিব্যক্তি। ডি. পি. আগরওয়াল বলেন যে এখানকার তাম্রসঞ্চয় কেন্দ্রগুলির বৈশিষ্ট্য হল এগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগসূত্রের একান্তই অভাব। ছয়ের দশকে

রাজস্থানের নাগাউর জেলার খুর্দি, মেহসনা ও কারাকোরাম অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত তাম্রসামগ্রীসমূহকেও আর্যদের সঙ্গে সম্পর্কিত করার কোন কারণ নেই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হাতিয়ারের বিস্তৃতি অধিকতর পূর্বে দেখা যায় না, যেমন ফোর্ট মানরো থেকে প্রাপ্ত হাতিয়ারসমূহের কোন ধরনেরই সাদৃশ্য গাঙ্গেয় সমভূমির হাতিয়ারের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। তাম্রসঞ্চয় কেন্দ্রসমূহ সম্পর্কে আরও অসুবিধা এই যে এগুলি কোন বিশেষ প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্তরে পাওয়া যায়নি। দোয়াব ও সন্নিহিত অঞ্চলের তাম্রসামগ্রীর সঙ্গে ও. সি. পি বা গৈরিক বর্ণের মৃৎশিল্পের সংযোগের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। এই সংযোগের প্রকৃতই কোন ভিত্তি আছে কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। গৈরিক মৃৎশিল্পের মানুষরা যে আর্য ছিল এ বক্তব্য প্রমাণ করার কোন উপায় নেই।

গত শতকের শেষপাদে এবং বর্তমান শতকের গোড়ার দিক একটি ধারণা জনপ্রিয় ছিল যে আর্যরা দুই তরঙ্গে ভারতবর্ষে এসেছিল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এ. এফ. আর. হোয়ার্নলে উত্তর ভারতের দুটি প্রধান আর্যগোষ্ঠীর ভাষা মাগধী ও শৌরসেনীর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করেন যে আর্যদের প্রথম তরঙ্গ গাঙ্গেয় অঞ্চলে অধিবসতি করেছিল যারা পরবর্তীকালে আগত দ্বিতীয় তরঙ্গের দ্বারা তাড়িত হয়ে দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই তত্ত্বটিকে সমর্থন করেন গ্রীয়ারসন (১৯০৭), রিজলী (১৯১৫) এবং রমাপ্রসাদ চন্দ (১৯১৬)। চন্দজ মহাশয় পরিকল্পনাটির ঈষৎ পরিবর্তন করে বলেন যে প্রথম তরঙ্গটি গঙ্গাযমুনা দোয়াব অঞ্চলে বরাবরই রয়ে গিয়েছিল এবং পরবর্তী তরঙ্গটি পূর্বকথিত অঞ্চলটি অধিকৃত দেখে উপকূলবর্তী অঞ্চলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে, সিন্ধু থেকে, কাথিয়াবার হয়ে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূল বরাবর। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই দুই তরঙ্গের মতবাদকে ভ্রান্ত ও মনগড়া বলে প্রতিপন্ন করেন, এবং পরবর্তীকালে ভাষাতত্ত্ববিদরা এই মতবাদকে একেবারেই বাতিল করে দেন। কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিদরা বাতিল করলেও প্রত্নতত্ত্ববিদদের একাংশ এই দুই-তরঙ্গের তত্ত্বে রীতিমত আগ্রহী ও আস্থাশীল হয়ে ওঠেন। বৈদিক সাহিত্যে ব্যবহৃত তাম্রায়স ও কৃষ্ণায়স নামক সংশয়যুক্ত শব্দদ্বয়ের সঙ্গে তাঁরা তাম্র-ব্যবহারকারী প্রথম দফায় আগত আর্যদের এবং লৌহ-ব্যবহারকারী দ্বিতীয় দফায় আগত আর্যদের সম্পর্কিত করার প্রচেষ্টা করেন।

আহমদ হাসান দানি (১৯৬৭) তিমরগড় থেকে কয়েকটি সমাধিক্ষেত্র আবিষ্কার করেন যা গান্ধার-সমাধি সংস্কৃতি নামে পরিচিত। এখানে তিন ধরনের সমাধি এবং লোহিত ও ধূসর বর্ণের মৃৎপাত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

লৌহযুগ সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে সোয়াট উপত্যকার তিমরগড় ও অপরাপর স্থানে আবিষ্কৃত সমাধিক্ষেত্রগুলির তাম্রাশ্মীয় দুটি উপপর্যায়কে ১৬০০ থেকে ১৩০০ এবং ১২০০ থেকে ১০৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে স্থান দেওয়া হয় এবং লৌহযুগীয় পর্যায়টিকে ৯০০ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে নির্দিষ্ট করা হয়। গান্ধার-সমাধি সংস্কৃতির প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে তাম্র এবং তৃতীয় স্তরে লৌহের সন্ধান পাওয়া যায়। ডব্লিউ বার্নহার্ড প্রথম ও তৃতীয় স্তরের কয়েকটি কংকালকে যথাক্রমে ইউরোডলিকোমোর্ফ (মাথার গড়ন অনুযায়ী ইউরোপীয় ধরন) এবং লেপটোডলিকোমোর্ফ (মাথার গড়ন অনুযায়ী ভূমধ্যসাগরীয় ধরন) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন ও বলেন যে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকে এই দুই শাখার আর্যরা দুই তরঙ্গে এতদঞ্চলে আগমন করে, প্রথমটি খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতকে এবং দ্বিতীয়টি নবম শতকে। প্রথম দফায় যারা আসে তারা লৌহের ব্যবহার জানত না, কিন্তু দ্বিতীয় দফায় যারা আসে তারা শুধু লৌহের ব্যবহারেই অভ্যস্ত ছিলনা, তাদের সমাধিপ্রদানের রীতিও ছিল ভিন্ন। ফেয়ারসার্ভিস বালুচিস্তানের কোয়েটা উপত্যকায় মৃৎশিল্পের দুইটি ধারার অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন এবং সেগুলিকে দুই তরঙ্গে আগত আর্যদের দুটি শাখার সঙ্গে সম্পর্কিত করার চেষ্টা করেন। প্রথম ধারাটি, যা ঘুল মৃৎশিল্প নামে পরিচিত, অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন, কিন্তু তা হস্তনির্মিত, কর্কশ অলংকরণযুক্ত, সরল নকশা এবং কখনও কখনও একাধিক বর্ণসহ। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ধারাটি, যার বিকাশ উত্তর বালুচিস্তানে বেশি দেখা যায়, অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে এই ধারাটি চক্রনির্মিত, জ্যামিতিক ও ঋজুরেখ নকশাযুক্ত, এবং ঝুকর সংস্কৃতির নিদর্শনের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। উভয় ধারারই কোন স্তরবিন্যস্ত পরিচয় পাওয়া যায়নি।

হরপ্পা-উত্তর তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতিসমূহকে ইরান, পশ্চিম এশিয়া ও মধ্য এশিয়ার কোন কোন সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত করার প্রবণতা দেখা যায় কেননা ওই সকল অঞ্চল থেকেই আর্যদের ভারতে আসা সম্ভব। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সাংকালিয়া মধ্যভারতের নভডাটোলি ও এরান, রাজস্থানের অহর ও গিলুন্দ, উত্তর-দাক্ষিণাত্যের নেভাসা, চন্দোলি ও দাইমাবাদ এবং আরও দক্ষিণে রায়চুর দোয়াবে পিকলিহালের উৎখনিত প্রত্নক্ষেত্রগুলিকে সংস্কৃতিগত-ভাবে পশ্চিম এশীয় ধারার সঙ্গে সম্পর্কিত করার চেষ্টা করেন। এগুলি মূলত প্রস্তর ও তাম্রের আয়ুধ ব্যবহারকারী সংস্কৃতি যেখানে চক্রনির্মিত মৃৎশিল্পের ব্যাপক বিকাশ দেখা যায়। একমাত্র অহর ছাড়া অন্যত্র তাম্রের ব্যবহার সীমাবদ্ধ পরিসরে, খুব ব্যাপক নয়। এই সকল স্থান থেকে

প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের আকারগত ও নকশাগত বৈশিষ্ট্যসমূহের ভিত্তিতে তিনি এগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত করার চেষ্টা করেন এবং সেই সঙ্গে এগুলির পশ্চিম এশীয় উৎসের উপর গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে এতদঞ্চলে পুরাণকথিত যে সকল জনপদের পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলি ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগে গড়ে উঠেছিল। ওই সময়ের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণচিহ্নিত লোহিত মৃৎপাত্র, ক্ষুদ্রাশ্ম ও ফলা শিল্প, সীমাবদ্ধ পরিসরে তাম্রনির্মিত সামগ্রী এবং বিশেষ ধরনের সমাধি। মৃৎপাত্রের ক্ষেত্রে ইরাক ও ইরানের সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সাংকালিয়ার মতে এই সাদৃশ্য বহিরাগত আর্যপ্রভাবের ফলে হওয়া সম্ভব। অশ্মক, হৈহয়, যাদব প্রভৃতি পৌরাণিক জনগোষ্ঠীসমূহ, যারা ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগে এতদঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তারা আর্যধারা বহনকারী ছিল, এইরকম অনুমান তিনি করেন। ১৯৬৭-তে প্রাপ্ত অশ্বের অস্থির সাক্ষ্যে তিনি দক্ষিণের নবাশ্মীয়-তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতিগুলিকেও আর্য আখ্যা দিতে চান।

উপরি-উক্ত নানা মতবাদ থেকে আসল যে কথাটা দাঁড়ায় তা হচ্ছে এই যে প্রত্নতত্ত্ববিদরা মোটের উপর ধরে নিয়েছেন যে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে ইরান, পশ্চিম এশিয়া ও মধ্য এশিয়ায় আর্যরা যে ব্যাপক ধ্বংসকার্য চালিয়েছিল তারই পরিণামে ওই অঞ্চলের তাম্র ব্যবহারকারী মানুষদের একটা অংশ পূর্বদিকে অর্থাৎ ভারতবর্ষে চলে আসে যাদের উন্নততর কারিগরি দক্ষতা এদেশের তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতিগুলিকে প্রভাবিত করেছিল, অথবা তারাই এই সংস্কৃতিগুলির সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এই তাম্র ব্যবহারকারী আগন্তুকদের সঙ্গে হরপ্পীয়দের অথবা আর্যদের কি সম্পর্ক ছিল, আর্যরা তাদের সঙ্গে এসেছিল না পিছু পিছু এসেছিল, এই রকম অজস্র প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় নি। সাংকালিয়ার অনুরূপ চিন্তাধারায় প্রভাবে গোবর্ধন রায় শর্মা বলেন যে কৌশাম্বীতে (উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদের অনতিদূরে) উৎখনিত ক্ষেত্রে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র নভডাটোলি, মেহ্গম, রংপুর, সোমনাথ এবং মোটামাচিয়ালার শেষ-হরপ্পা ও হরপ্পা-উত্তর মৃৎপাত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত এবং এই সকল জনবসতি সামগ্রিকভাবে একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকেই সূচিত করে যা আসলে আর্য। কিন্তু এখানে বলা দরকার যে মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রে যে সাদৃশ্যের কথা বলা হয় তা ততটা আসল নয় যতটা কল্পিত। মধ্য ভারতের তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতিগুলির সঙ্গে কৌশাম্বীকে এক করে দেখা যায় না। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ফলা শিল্প ও ক্ষুদ্রাশ্ম যা কৌশাম্বীতে অনুপস্থিত। আবার কৌশাম্বীর প্রথম সংস্তরের উপরার্ধে লৌহ এবং প্রতিরক্ষা প্রাকারের

নিদর্শন পাওয়া যায় যা মধ্যভারত ও উত্তর দাক্ষিণাত্যের তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতি-সমূহের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। সর্বোপরি কোশাম্বীর প্রাচীনতম অধিবসতির সূত্রপাত আনুমানিক ১১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে যখন মধ্যভারত ও উত্তর দাক্ষিণাত্যের তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতিসমূহের অন্তিমকাল।

১৯৬৬ তে ডি. পি. আগরওয়াল দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থানের অহর ও গিলুন্দে উৎখনিত বানাস সংস্কৃতিকে (কালসীমা ১৮০০-১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) আর্যদের প্রথম তরঙ্গের সঙ্গে সনাক্ত করেন। এই সংস্কৃতি প্রধানত সরল ধরনের ও শ্বেত চিহ্নিত কৃষ্ণ-ও-লোহিত মৃৎপাত্র, তাম্রের আয়ুধ ও উপকরণ, ব্যাপক আবাস ব্যবস্থা, কখনও কখনও পোড়া ইঁটের ব্যবহারসহ, এবং পোড়ামাটির নানা ধরনের সামগ্রীর দ্বারা পরিচিত। আগরওয়াল দুই ধরনের মৃৎপাত্র ও তৎসহ পোড়ামাটির কিছু সামগ্রীকে পশ্চিম এশীয় অনুপ্রেরণাজাত বলে মনে করেন ও বলেন যে এই সংস্কৃতি পশ্চিম এশীয় অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা হরপ্পীয় কারিগরদের সহায়তায় গড়ে উঠেছিল। অর্থাৎ এই সংস্কৃতি হরপ্পীয়দের সঙ্গে আর্যদের সম্পর্কজাত। পশ্চিম এশীয় অনুপ্রবেশকারীরা ছিল প্রথম তরঙ্গের আর্য। পক্ষান্তরে চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতির মানুষরা ছিল দ্বিতীয় তরঙ্গের আর্য। শেষোক্ত সংস্কৃতির কথা আমরা পরে আলোচনা করব। আগরওয়ালের বক্তব্যের দুটি দিক বর্তমান, প্রথমটি হচ্ছে বানাস উপত্যকার সংস্কৃতিতে হরপ্পীয় কারিগরির অস্তিত্ব, এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে দুই তরঙ্গে আর্যদের আগমনের ধারণা। বানাস সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পশ্চিম এশীয় ও হরপ্পীয় এই দুই শিল্পধারার যে পরিচয় পাওয়া যায় তার একটি প্রাক্-পর্যায় কচ্ছের অন্তঃপাতী দেশলপারের মৃৎশিল্পে দেখা যায় বলে প্রকাশ। এই মৃৎশিল্প ক্রীম পালিশের উপর দ্বিবর্ণ রঞ্জিত। দেশলপারে উৎখনিত ১/বি সংস্তরে নবাগত মানুষদের সংস্কৃতির পরিচয় অনুমান করা হয় এবং বলা হয় যে এরা আর্যগোষ্ঠীর মানুষ, যারা গুজরাত অঞ্চলের হরপ্পা সভ্যতাকে ধ্বংস করে কিছুটা উত্তরে বানাস উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে এবং পরে গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রমাণস্বরূপ শেষোক্ত অঞ্চলে কালো-ও-লাল মৃৎপাত্রের বিকাশের কথা উল্লেখ করা হয়। কিন্তু অন্যান্য তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির আর্যদের সঙ্গে সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে যে সকল অসুবিধা দেখা গেছে সেই অসুবিধাগুলি এখানেও সমভাবে বর্তমান। এ ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার দরকার সেগুলি হল: প্রথমত, বানাস উপত্যকার যে শিল্পধারাকে পশ্চিম-এশীয় বলা হয়েছে এবং আর্যদের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে, তার সঙ্গে টেপ-হিসার, সাহ-টেপ, আনাউ প্রভৃতি বাইরের শিল্পধারার সাদৃশ্য নেহাতই আপাত, যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি ও কালসীমা-

বর্জিত। এই বক্তব্য ওখানকার তথাকথিত হরপ্পীয় শিল্পধারার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। দ্বিতীয়ত, শ্বেত চিহ্নিত কৃষ্ণ ও লোহিত মৃৎপাত্র পশ্চিম এশীয় শিল্পধারার অনিবার্য লক্ষণ নয়। তৃতীয়ত, দেশলপায়ের ক্রীমপালিশের উপর দ্বিবর্ণ রঞ্জিত যে মৃৎশিল্পকে বানাস সংস্কৃতির প্রাক্-পর্যায় বলা হয় সেটাও মূলত বিশুদ্ধ অনুমান।

চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতির কথা লৌহযুগ নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে যে সংস্কৃতির প্রধান বিকাশকেন্দ্র গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চল। এছাড়া সরস্বতী ও দৃশদ্বতী উপত্যকায়, রাজস্থানে ও মালব অঞ্চলে এই সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে শতদ্রু নদী পর্যন্ত এবং পূর্বে বৈশালী পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্রের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। হরিয়ানার কুরুক্ষেত্র জেলার ভগবানপুরে শেষ-হরপ্পীয় সংস্কৃতির সঙ্গে চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতির সংমিশ্রণ বর্তমান। রূপর ও আলমগিরপুরে হরপ্পীয় সংস্তরের উপর এই সংস্কৃতির অবস্থানও লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪০-৪৪-এ অহিচ্ছত্রায় খননকার্যের সময় এই চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্রের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু উচ্চ গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রত্নতাত্ত্বিক পটভূমিকায় এগুলির তাৎপর্য উপলব্ধি করেন বি. বি. লাল ১৯৫০-৫২ খ্রীষ্টাব্দে, যিনি হস্তিনাপুরে এগুলির স্তরবিন্যস্ত, অবস্থান প্রদর্শন করেন। এই মৃৎশিল্পের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এগুলি চক্রনির্মিত, মসৃণ জমিযুক্ত, ছাই রঙ থেকে গাঢ় ধূসর রঙের, নানা আকারের এবং বিভিন্ন অলংকরণ-চিহ্নসহ। চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আবাসসমূহ আয়তাকার, কাঁচা ইটের তৈরি, ঢালু ছাদযুক্ত, দেওয়ালে মাটির সঙ্গে খড়ের কুচো বা অনুরূপ সামগ্রী মিশিয়ে আস্তরণ দেওয়া। প্রাপ্ত আয়ুধসমূহের মধ্যে তাম্রনির্মিত সামগ্রী, অস্থিনির্মিত হাতিয়ার এবং লৌহের নিদর্শন বর্তমান। আয়ুধসমূহের ক্ষেত্রে নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় যেমন ছুরি, তীরের মুখ, বর্শাফলক, বাইস বা বাসৌলি, খুরপি, নিড়ানি প্রভৃতি। এছাড়া কুঁড়ি, পোড়ামাটি ও আধা-দামী পাথরের পুঁতি, বালা ও অন্যান্য সামগ্রী একটি সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের পরিচায়ক। এটাও লক্ষ্যণীয় যে চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতির সংস্তরসমূহে শস্যের মধ্যে চালের নিদর্শন বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়। গৃহপালিত পশুসমূহের মধ্যে শূকর, গাভী, হরিণ, অশ্ব, মেষ প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। সি-১৪ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত এই সভ্যতার কালসীমা ১০০০ থেকে ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে।

বি. বি. লাল চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতির স্রষ্টাদের সঙ্গে আর্যদের সনাক্ত করেন। তাঁর মতে মহাভারতে বর্ণিত বিভিন্ন প্রসিদ্ধ স্থানে যেহেতু

এই সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া গেছে, যেহেতু ভারতীয় ঐতিহ্যে যেটি সবচেয়ে কুলীন সভ্যতা-এলাকা সেই ব্রহ্মাবর্ত বা ব্রহ্মর্ষিদেশ এই বিচিত্র ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতির অন্তর্গত, এবং যেহেতু দৃশগব বা প্রাচীন সুরস্বতী উপত্যকার লোকেরা—যারা বৈদিক সাহিত্যে বিশেষভাবে উল্লিখিত—এই ধরনের মৃৎপাত্র ব্যবহার করত বলে প্রকাশ, সেই হেতু এই সংস্কৃতিকে আর্য বলে গণ্য করতে হবে। মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে যে একটি ব্যাপক বন্যার ফলে হস্তিনাপুর ধ্বংস হলে সেখানকার তৎকালীন রাজা নীচক্ষু তাঁর রাজধানী কৌশাম্বীতে সরিয়ে নিয়ে যান। এ ছাড়া লাল আরও বলেন যে চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতির ভৌগোলিক বণ্টন অত্যন্ত ব্যাপক এবং এই সংস্কৃতির সামগ্রীসমূহের মধ্যে একটা সমজাতীয়তা বর্তমান। এই মৃৎশিল্পের একটা স্বাতন্ত্র্য আছে যার সঙ্গে অন্যান্য মৃৎশিল্পের মিল সামান্য। এই যুক্তিকে অনুসরণ করে তিনি আরও বলেন যে এই সমজাতীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যের জন্যই চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতিকে বহিরাগত এবং আর্য বলতে হবে, কেননা অনুরূপ মৃৎশিল্পের নিদর্শন পাকিস্তানের করাচির উত্তরে লাখিওপীর, আফগানিস্তান, ইরানের শাহ-টেপ এবং ইরানী আজারবাইজানের অন্তর্গত হাসানলু, এমন কি সুদূর থেসালি থেকেও পাওয়া গেছে।

চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতির মানুষদের সঙ্গে আর্যদের সনাক্ত করার ব্যাপারটা ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই বিনা প্রমাণেই মেনে নিয়েছেন। ১৯৫৮-তে এ. এল. ব্যাশাম এই সনাক্তকরণকে যুক্তিসঙ্গত আখ্যা দেন। ১৯৬৫-তে দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী এই সনাক্তকরণকে শুধু সমর্থনই করেন নি, চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতিকে তিনি কুরু ও পুরুদের সৃষ্টি বলে অভিহিত করেন। ১৯৬৬-তে রোমিলা থাপার বলেন যে এই সংস্কৃতির সঙ্গে বৈদিক সাহিত্যে প্রতিফলিত জীবন ধারার সম্পূর্ণ মিল আছে। দুঃখের বিষয়, এই সকল কথা ন্যূনতম প্রমাণ ব্যতিরেকেই বলা হয়েছে। আসল কথা হল মহাভারতে উল্লিখিত কয়েকটি স্থান থেকে চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া গেছে বলেই ওই সংস্কৃতির স্রষ্টাদের আর্য বলার পক্ষে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া গেছে এ কথা মনে করা ঠিক নয়। সাহিত্যগত সাক্ষ্য অনুযায়ী এই সকল স্থান যতটা প্রাচীন হওয়া উচিত, হস্তিনাপুর বা অহিচ্ছত্রা তার পরিচায়ক নয়। কার্বন-১৪ পরীক্ষায় জ্ঞাত এতদঞ্চলের সংস্কৃতিসমূহের কাল খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম-অষ্টম শতকের বেশি প্রাচীন নয়। সম্ভবত এই কারণেই হুইলার বলেন যে চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতি আসলে দ্বিতীয় তরঙ্গে আগত আর্যদের সৃষ্টি। এতে উক্ত সংস্কৃতির কালগত অর্বাচীনতার একটি অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া গেলেও সমস্যার সমাধান হয় না। রোমিলা

ব্যাপার যাই বলুন না কেন, উত্তরে পাঞ্জাব থেকে দক্ষিণে উজ্জয়িনী পর্যন্ত এবং পশ্চিমে ভাওয়ালপুর থেকে পূর্বে বিহার সীমান্ত পর্যন্ত এলাকায় উৎখনিত সংস্কৃতিসমূহের সঙ্গে বৈদিক ও তৎপরবর্তী সাহিত্যে প্রতিফলিত আর্যাবর্তের সাংস্কৃতিক জীবনকে কোন ক্রমেই মেলানো যায় না। ১৯৬২-তে সুধীররঞ্জন দাস বলেন যে ঋগ্বেদে যেহেতু মৃৎশিল্প বা কুম্ভকারের উল্লেখ নেই সেইহেতু ঋগ্বেদের মানুষেরা মৃৎপাত্রের ব্যবহার জানত না। তাহলে কি আমাদের ধরে নিতে হবে যে ঋগ্বেদের মানুষরা প্রস্তরযুগে বাস করত এবং ঋগ্বেদের সংস্কৃতি প্রস্তরযুগের সংস্কৃতি? মনে হয়ে দাসজ মহাশয় ঋগ্বেদে কুলাল বা কৌলাল শব্দটির অনুপস্থিতি দেখে এই রকম সিদ্ধান্ত করেছিলেন। কিন্তু মৃৎশিল্পবাচক অপর কোন শব্দ ঋগ্বেদে নেই একথা তিনি কিভাবে বুঝলেন? স্মরণ রাখা দরকার ঋগ্বেদের শ্লোকসংখ্যা দু'চারটি নয় ১০,৪৬২ টি। এই প্রসঙ্গের অবতারণার উদ্দেশ্য, বৈদিক সাহিত্যে বর্ণিত সংস্কৃতিসমূহের নিখুঁত বিশ্লেষণ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানলব্ধ সংস্কৃতিসমূহের সঙ্গে সেগুলির সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা নিরর্থক হতে বাধ্য। ম্যাকডোনেল ও কীথ বৈদিক সাহিত্যের যে ব্যাখ্যামূলক শব্দসূচী প্রণয়ন করেছেন প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌রা মূলত তার উপরই নির্ভর করে বৈদিক যুগ সম্পর্কে ধারণা গঠন করেন, কিন্তু এই শব্দসূচী একান্তই নির্বাচিত, বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ শব্দসমূহের সামান্য অংশই এতে বর্তমান। বি. বি. লাল বাইরের দেশের মৃৎশিল্পের সঙ্গে চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতির যে সাদৃশ্যের কথা বলেছেন তা কতদূর প্রকৃত এবং কতদূর কল্পিত তা বলা যায় না, কেননা এ পর্যন্ত ভারতের যত সংস্কৃতিকে আর্য বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছে, সকল ক্ষেত্রেই ইরান ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে সাদৃশ্য দাবি করা হয়েছে। লাল থেসালি এবং ইরানের নিদর্শনের সঙ্গে হস্তিনাপুরের ধূসর মৃৎপাত্রের সাদৃশ্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট উদাহরণ পেশ করেননি। এন. আর. ব্যানার্জী শাহীটুম্প মৃৎশিল্পকে চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্রের উৎস বলেছেন কেননা তাঁর মতে শাহীটুম্প মৃৎশিল্পের যথেষ্ট আকর্ষণীয়তা আছে এবং সেইহেতু তা সমকালীন এবং পরবর্তীকালের মৃৎশিল্পের অনুপ্রেরণার কারণ হতে পারে। এই ধরনের যুক্তি প্রধানত ব্যক্তিগত ধারণা নির্ভর এবং সেই কারণেই কাল্পনিক। যা প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত তা আসলে প্রমাণাভাস মাত্র।

বিশিষ্ট প্রত্নক্ষেত্রসমূহের পরিচিতি

অত্তিরামপক্কম ঃ তামিলনাড়ুর রেডহিল পাহাড়ের নিকট কোর্তালিয়ার নদী উপত্যকায় বুদ্দিদা মাংকু বাংকা নামক নালার উপর অবস্থিত প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র। এখানকার নুড়ি পাথরের পুরু স্তরের উপর জমে ওঠা ল্যাটেরাইট অবক্ষেপের মধ্যে হাতকুড়াল ও ছেদক ধরনের বহু আয়ুধ পাওয়া গেছে। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই এই প্রত্নক্ষেত্রটি যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে।

অত্রাঞ্জিখেরা ঃ উত্তর প্রদেশের এটা জেলায় গাঙ্গেয় সমভূমির উপর অবস্থিত প্রত্নক্ষেত্র। এখানকার প্রথম সংস্তরে গৈরিক বর্ণের মৃৎপাত্র, দ্বিতীয় সংস্তরে কালো ও লাল মৃৎপাত্র, তৃতীয় সংস্তরে লৌহনির্মিত উপকরণের সঙ্গে চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র এবং চতুর্থ সংস্তরে উত্তরের কৃষ্ণমসৃণ মৃৎপাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় সংস্তরটির কাল ১০২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি।

অনগওয়াড়ি ঃ কর্ণাটকের ঘটপ্রভা উপত্যকায় অবস্থিত আদি ও মধ্য-প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

অমৃথমঙ্গলম ঃ তামিলনাড়ুর চিঙ্গলেপুট জেলার অন্তর্গত প্রত্নক্ষেত্র, যেখানে বিস্তৃত ল্যাটেরাইট ভূসংস্থানের মধ্যে ২৫০টির মত পাত্রসমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে। সমাধিতে প্রদত্ত সামগ্রীর মধ্যে কালো ও লাল মৃৎপাত্র এবং লৌহনির্মিত উপকরণ দেখা যায়।

অম্বা ঃ দক্ষিণ গুজরাতের বুলসর জেলায় অবস্থিত মধ্যপ্রস্তর যুগের প্রত্নক্ষেত্র।

অম্বাখেড়ি ঃ উত্তর প্রদেশের শাহারানপুর জেলায় অবস্থিত শেষ হরপ্পীয় যুগের প্রত্নক্ষেত্র যেখানে অলংকরণবিহীন গৈরিক বর্ণের মৃৎপাত্র, ইটের তৈরি উনান ও পোড়ামাটির সামগ্রী পাওয়া গেছে। এখান থেকে তামার উপকরণ পাওয়া না গেলেও অতিসন্নিহিত সাইপাই নামক স্থান থেকে তা পাওয়া গেছে প্রাগুক্তধরনের মৃৎপাত্রসহ।

অম্রী ঃ সিন্ধু প্রদেশের লাখি পাহাড়ের দক্ষিণে সিন্ধু নদের উপত্যকায় পলিভূমিতে অবস্থিত প্রাক্-হরপ্পীয় বসতি যেখানে ১৯২৯-এ খননকার্য চালান ননীগোপাল মজুমদার এবং ১৯৫৯-৬২-তে জে. এম. কামাল। এখানে পাঁচটি সাংস্কৃতিক যুগের ধারাবাহিক অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, প্রথম তিনটি যথাক্রমে প্রাক্-হরপ্পীয়, হরপ্পীয় ও প্রধান হরপ্পীয়। প্রাক্-হরপ্পীয় যুগটি চারটি উপযুগে বিভক্ত যেগুলির প্রথমটিতে প্রধানত হস্তনির্মিত

মৃৎপাত্র, তামা ও ব্রোঞ্জের টুকরো, চার্ট পাথরের ফলা প্রভৃতি পাওয়া যায়, দ্বিতীয়টিতে (দুই স্তরে) উন্নততর ধরনের অলংকরণযুক্ত মৃৎপাত্র, তৃতীয়টিতে কাঁচা ইট ও পাথরের আবাসব্যবস্থা এবং চক্রনির্মিত বর্ণ ও অলঙ্করণ যুক্ত মৃৎপাত্র এবং চতুর্থটিতে আরও একটু উন্নত ধরনের মৃৎপাত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় যুগটি প্রথম যুগেরই ধারাবাহিকতা বহন করে, কিন্তু এই যুগেই হরপ্পীয় উপাদানসমূহের অনুপ্রবেশ পর্যাপ্তভাবে ঘটার দরুন অম্রী সংস্কৃতি হরপ্পীয় চরিত্র পেতে আরম্ভ করে, যার পূর্ণ বিকাশ এখানকার তৃতীয় যুগে দেখা যায়।

অহর: দক্ষিণপূর্ব রাজস্থানে উদয়পুরের সন্নিকটে বানাস উপত্যকায় অবস্থিত তাম্রাশ্মীয় প্রত্নক্ষেত্র যেখানে প্রথম উৎখনন হয় ১৯৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দে। এই সংস্কৃতির দুটি প্রধান যুগ, প্রতিটি যুগই আবার তিনটি করে উপযুগে বিভক্ত। এখানে সাত ধরনের মৃৎশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়, যেগুলির অমসৃণ ও অনুন্নত অবস্থা থেকে ক্রমোন্নয়নের একটা সুস্পষ্ট পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায় এবং এই কারণেই এই মৃৎশিল্প অবলম্বনে এখানকার যুগ ও উপ-যুগগুলি সম্পর্কে ধারণা করা যায়। অহরে তাম্রনির্মিত সামগ্রীর ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায়, এবং তাম্রপ্রাচুর্যের উৎস সম্ভবত আরাবল্লী পর্বতাঞ্চল। এখানে মাটি ও পাথরনির্মিত আবাসের পরিচয় পাওয়া যায়। ক্ষুদ্রাশ্মের অনুপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। দ্বিতীয় যুগে লোহার ব্যবহার দেখা যায়।

অহিচ্ছত্রা: প্রাচীন উত্তর পঞ্চাল দেশের রাজধানী, উত্তর-প্রদেশের বেরিলী জেলার রামনগর গ্রামের আধমাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এখানে ১৯৪০-৪৪-এর উৎখননের ফলে খ্রীষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতক থেকে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক পর্যন্ত একটানা বসতির ধারাবাহিক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। সাম্প্রতিক খননকার্যসমূহের ফলে এখানে লৌহনির্মিত উপকরণের সঙ্গে চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়া ভিন্ন স্তর থেকে তৎপরবর্তী উত্তরের কৃষ্ণমসৃণ মৃৎপাত্রের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখানে যে নয়টি স্তরে উৎখনন হয়েছে সেগুলির মধ্যে নবম বা সর্বনিম্ন স্তরে কোন ঘরবাড়ির চিহ্ন নেই। এই স্তরটিকে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পূর্ববর্তী বলে গণ্য করা হয়।

আঙ্গিয়া: গুজরাতের কচ্ছ জেলায় ভুজের পশ্চিমে এবং নাখতারনায় ৫ কি. মি. দক্ষিণপূর্বে ভুখী নদীর তীরে অবস্থিত আদি প্রস্তর যুগের প্রত্নক্ষেত্র।

আঞ্জীরা: বালুচিস্তানের মুলা নদীর উপনদী আঞ্জীরার দু'বাহুর মধ্যবর্তী প্রাক্-হরপ্পীয় প্রত্নক্ষেত্র। এখানকার প্রথম সংস্তরে কিছু লাল

রঙের মৃৎপাত্রের টুকরো এবং চার্টপাথরের ফলা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি, তবে পরবর্তী সংস্তরসমূহে আবাস ও চক্রনির্মিত মৃৎপাত্রের নিদর্শন আছে। আঞ্জীরা মৃৎপাত্রে সচরাচর হলদে আস্তরের উপর কালো রঙের প্রলেপ বর্তমান, এবং এগুলি অত্যন্ত ভাল করে পোড়ানো।

আদমগড়ঃ মধ্যপ্রদেশের নর্মদা নদীর তীরে হোসঙ্গাবাদ শহরের নিকটবর্তী একটি পাহাড় যার ছত্রসমূহের ভিতরে ও বাইরে ষোলটি খাদে উৎখনন হয়েছে। উপরের ভূপৃষ্ঠের নিচে আলগা বাদামি মাটি ও পাথর-কুচির তলায় ৫০-১৫০ সে. মি. পুরু কালো এঁটেল মাটিতে প্রচুর ক্ষুদ্রাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে। পূর্ববর্তী পর্যায়ের প্রস্তরযুগের কিছু নিদর্শনও এখানে পাওয়া যায়। এখানকার গুহাচিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এক বা একাধিক রঙে আঁকা, যেগুলির সঠিক কালনিরূপণ হয়নি।

আদিত্যনাল্লুরঃ তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলি জেলার অন্তর্গত তাম্রপর্ণী উপত্যকায় অবস্থিত প্রত্নক্ষেত্র। এখানকার ১১৪ একর ব্যাপী সুবৃহৎ প্রাচীন সমাধিক্ষেত্রে প্রচুর ধাতব সামগ্রী এবং লাল-ও-কালো মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে।

আম্রাঃ গুজরাতের সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের হালারে অবস্থিত তাম্রাশ্মীয় কেন্দ্র যেখানে হরপ্পীয় ও তৎসহ কালো ও লাল মৃৎশিল্পের পরিচয় পাওয়া গেছে।

আমরেলিঃ গুজরাতের আমরেলি জেলায় ওই একই নামের শহরের সন্নিকটস্থ প্রত্নক্ষেত্র যেখানকার নিম্ন সংস্তরে তাম্রাশ্মীয় এবং উপরের সংস্তরে লোহযুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে। উভয় সংস্তরের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ছেদ বর্তমান।

আরিকামেদুঃ পণ্ডিচেরির দু'মাইল দক্ষিণে অবস্থিত মহাশ্মীয় সংস্কৃতি-কেন্দ্র। এখানকার খননকার্যে কিছু রোমক সামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে।

আলমাত্তিঃ উত্তর কর্ণাটকের মধ্যপ্রস্তর যুগের স্তরবিন্যস্ত প্রত্নক্ষেত্র।

আলমগীরপুরঃ উত্তরপ্রদেশের মীরাট জেলায় হিণ্ডন নদীর তীরে অবস্থিত প্রত্নক্ষেত্র, দিল্লী থেকে ৪৪ কি. মি. উত্তরপূর্বে। এখানকার প্রথম পর্যায়টি শেষ হরপ্পীয় সংস্কৃতির পরিচায়ক। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৩৭ সে. মি. পুরু অবক্ষেপের মধ্যে লোহনির্মিত আয়ুধ ও চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তৃতীয় পর্যায়ে উত্তরের কৃষ্ণমসৃণ মৃৎশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায় যা সমকালীন রূপর ও হস্তিনাপুরের প্রথম ঐতিহাসিক যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। চতুর্থ পর্যায়ে মুঘল উপাদান পাওয়া যায় যা থেকে এই স্থানটির নামকরণ হয়েছে।

ইনামগাঁওঃ মহারাষ্ট্রের পুনে শহরের ৪৫ মাইল পূর্বে অবস্থিত তাম্রাশ্মীয় কেন্দ্র। এখানকার তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির প্রথম পর্বের সঙ্গে

মালব সংস্কৃতি এবং দ্বিতীয় পর্বের সঙ্গে জোরওয়ে সংস্কৃতির সমন্বয় দেখা যায়। প্রধানত মৃৎপাত্রের ভিত্তিতে এই দুই সংস্কৃতিকে সনাক্ত করা হয়। মালব মৃৎপাত্র নকশা কাটা লাল, জোরওয়ে মৃৎপাত্র হালকা, উজ্জ্বল কমলা অথবা গোলাপী, কালো রঙের নকশা। ইনামগাঁও-এর জোরওয়ে পর্বটি, আদি ও অন্ত্য দুই পর্যায়ে বিভক্ত। তাম্রাশ্মীয় ও লৌহযুগের যোগসূত্র হিসাবে এই দ্বিতীয় পর্যায়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এখানে উৎখনন হয়। পাঁচটি অর্ধচন্দ্রাকার মাটির স্তূপ বা ঢিবি এখানকার প্রাচীন জনবসতির পরিচায়ক।

উকরি: সিংভূম জেলার সিনি রেলস্টেসনের নিকট, সোনানালার তীরে অবস্থিত প্রত্নক্ষেত্র, যেখানকার প্রাপ্ত সামগ্রী থেকে প্রস্তরযুগ থেকে নবাশ্মীয় অধ্যায়ে উত্তরণের আভাস পাওয়া যায়।

এরান: মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলায় অবস্থিত প্রত্নক্ষেত্র সেখানে খনন-কার্যের ফলে তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া গেছে। এই সংস্কৃতি নভডাটোলির অনুরূপ। এখানে একটি প্রতিরক্ষা প্রাকারের অবশেষ পাওয়া যায়। মৃৎশিল্পের নিদর্শনসমূহ তিনটি পর্যায়ের পরিচয় দেয়। এরানের দ্বিতীয় যুগে উত্তরের কৃষ্ণমসৃণ মৃৎপাত্রসহ লৌহনির্মিত সামগ্রীর পরিচয় পাওয়া যায়। এরানে ঐতিহাসিক যুগেরও প্রভূত নিদর্শন বর্তমান।

ওয়াজল: কর্ণাটকের গুলবর্গা জেলার শোরাপুর তালুকে হুনসগি নালার উপর অবস্থিত মধ্য প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

কাকোরিয়া: উত্তরপ্রদেশের বারাণসী জেলায় চন্দ্রপ্রভার তীরে অবস্থিত তাম্রাশ্মীয় ক্ষেত্র, যেখানে বসতি এলাকা ও সমাধিস্থল উভয়ই পরিলক্ষিত হয়। তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত হলেও এখানকার সংস্কৃতি একটি ধারাকেই প্রতিফলিত করে।

কাঠোয়া: মধ্যপ্রদেশের বীনা রেলস্টেশনের ৬ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত আদিপ্রস্তর যুগের প্রত্নক্ষেত্র।

কামারপাল: উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলায় বুড়হাবালঙ্গ নদীর তীরে অবস্থিত আদিপ্রস্তর যুগের প্রত্নক্ষেত্র।

কান্দিভীল: বোম্বাই-এর শহরতলীতে অবস্থিত প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র যেখানে আয়ুধসমূহের ক্ষেত্রে যুগগত ধারাবাহিকতার পরিচয় আছে।

কারেমপুদি: অন্ধ্রপ্রদেশের নাগার্জুনিকোণ্ডার ৩২ মাইল পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্বে নাগুলেরু নদীর তীরে অবস্থিত আদিপ্রস্তর যুগের প্রত্নক্ষেত্র।

কালদেবনহাল্লি: কর্ণাটকের গুলবর্গা জেলার শোরাপুর তালুকে হুনসগি নালার তীরে অবস্থিত মধ্যপ্রস্তর যুগের প্রত্নক্ষেত্র।

কালিবঙ্গা ঃ উত্তর রাজস্থানের গঙ্গানগর জেলায় ঘগ্গরের দক্ষিণ তটে অবস্থিত প্রাক্‌-হরপ্পীয় কেন্দ্র যা কালক্রমে হরপ্পীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। এখানে প্রাক্‌-হরপ্পীয় এবং হরপ্পীয় উভয় বসতিরই পরিচয় পাওয়া যায়। এখানকার প্রাক্‌-হরপ্পীয় প্রতিরক্ষা প্রাকারটি হরপ্পয়ীরা ব্যবহার করেছিল বলে মনে হয়। মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রেও উভয় ধারা লক্ষ্য করা যায়। হরপ্পার মত এখানেও ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাটের পরিচয় পাওয়া যায়, তবে জলনিকাশী ব্যবস্থা অনুপস্থিত। বিভিন্ন সংস্তরের আবাসে আয়তাকার ও গোলাকার উনানের সন্ধান পাওয়া যায়।

কালেগাঁও ঃ মহারাষ্ট্রের আহমদনগর জেলায় গোদাবরীর তীরে অবস্থিত মধ্যপ্রস্তর যুগের প্রত্নক্ষেত্র।

কায়থা ঃ উজ্জয়িনীর ১৬ মাইল পূর্বে চম্বলের উপনদী ঘটি-কালিসিন্ধুর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত তাম্রাশ্মীয় বসতি। এখানকার প্রথম যুগে মধ্য প্রস্তরযুগের আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। দ্বিতীয় যুগে ক্ষুদ্রাশ্ম এবং তাম্রনির্মিত কুঠার, বাটালি ও বলয় পাওয়া গেছে। তৃতীয় যুগে সাদা চিত্রণযুক্ত কালো-ও-লাল মৃৎপাত্র ও চতুর্থ যুগে মালব ধরনের মৃৎপাত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। খননকার্যের ফলে জানা গেছে যে কায়থা সংস্কৃতির এলাকা কায়থা ছাড়াও অন্যত্র বিস্তৃত ছিল।

কিব্বনহাল্লি ঃ কর্ণাটকের টুমকুর জেলায় অবস্থিত প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

কিলভেনোয়াক্কম ঃ তামিলনাড়ুর উত্তর আর্কট জেলার আর্কোনম তালুকে অবস্থিত আদিপ্রস্তর যুগের প্রত্নক্ষেত্র।

কুন্নাত্তুর ঃ মাদ্রাজের ২৪ কি. মি. দক্ষিণে অবস্থিত মহাশ্মীয় ক্ষেত্র যেখানে বসতি ও সমাধি উভয়েরই অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়।

কুল্লি ঃ দক্ষিণ বালুচিস্তানের কোলওয়া জেলায় শাহীটুম্প এবং নালের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত তাম্রাশ্মীয় বসতি যেখানে অন্যূন তিনটি সংস্কৃতির অবক্ষেপ জমা হয়েছে। অবশ্য কুল্লি সংস্কৃতি বলতে একটি ব্যাপক এলাকা বোঝায়, অনেকগুলি সমজাতীয় প্রত্নক্ষেত্রসহ। আবাসব্যবস্থা, সমাধি, বিশেষ ধরনের মৃৎপাত্র, প্রস্তরনির্মিত সামগ্রী ও পোড়ামাটির মাতৃকা ও বৃষমূর্তি এই সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য।

কেশরপল্লে ঃ অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলায় কর্নাবরমের নিকটে অবস্থিত প্রত্নক্ষেত্র যেখানকার বসতিস্তরে উত্তরের কৃষ্ণমসৃণ মৃৎপাত্রের অবশেষ এবং সমাধির প্রয়োজনে প্রস্তরনির্মিত গোলাকার ও চৌবাচ্ছা ধরনের ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

কোট-ডিজি ঃ সিন্ধুপ্রদেশের খইরপুর জেলার জাতীয় সড়কের উপর খইরপুর শহরের ১০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত তাম্রাশ্মীয় বসতি যেখানে

প্রাক্-হরপ্পীয় ও হরপ্পীয় উভয় সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, উভয়ের মধ্যবর্তী একটি সংস্তরসহ। কোট-ডিজির মৃৎপাত্র চক্রনির্মিত হালকা ও পাটলবর্ণের যা হরপ্পীয় লালের-ওপর-কালো ধরনের ভারী পাত্রের চেয়ে গুণগতভাবে পৃথক।

কোবীর ঃ বাগলকোটের ২২ কি. মি. উত্তরে কর্ণাটকের বিজাপুর জেলায় অবস্থিত প্রত্নক্ষেত্র।

খরসোতি ঃ পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় তারাফেনি নদীর তীরে অবস্থিত শেষপ্রস্তর যুগের প্রত্নক্ষেত্র।

খুরহাদি ঃ উড়িষ্যার সুন্দরগড় জেলায় ব্রাহ্মণী নদীর শাখা খুরহাদির তীরে অবস্থিত মধ্যপ্রস্তর যুগের প্রত্নক্ষেত্র।

গাত্ত ঃ দক্ষিণ বালুচিস্তানের মাকরান উপকূলে জিওয়ানরির সামান্য উত্তরে গোয়াদারের নিকটবর্তী জবাল-ই-মাহদি পাহাড়ের নিচে অবস্থিত সমাধিক্ষেত্র যেখানে সমাধিতে প্রদত্ত সামগ্রীসমূহের মধ্যে রুক্ষ এবং চিত্রবিহীন মৃৎপাত্র, তাম্র, ব্রোঞ্জ ও লৌহনির্মিত সামগ্রীর কিছু অবশেষ পাওয়া গেছে।

গাইসাবাদ ঃ মধ্যপ্রদেশের দামোহ জেলায় বেয়ার্মা নদীতটে অবস্থিত আদি প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

গিদ্দালুর ঃ অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল জেলায় সাগিলেরু ও তার উপনদী এলুমালেরুর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত আদি প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র যেখানে ১৪ রকম আয়ুধের পরিচয় পাওয়া গেছে।

গিলুন্দ ঃ দক্ষিণপূর্ব রাজস্থানে বানাস উপত্যকায় উদয়পুরের সন্নিকটে অবস্থিত তাম্রাশ্মীয় বসতি যেখানকার বৈশিষ্ট্য সাদা রঙে চিত্রিত কালো-ও-লাল মৃৎপাত্র। এই সংস্কৃতির সর্বোচ্চ কালসীমা ১৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

গুলবল ঃ কর্ণাটকের গুলবর্গা জেলার শোরাপুর তালুকের অন্তর্গত হুনস্গি নালার তীরে অবস্থিত প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

গুফক্রাল ঃ কাশ্মীর উপত্যকায় অবস্থিত নবাশ্মীয় ও মহাশ্মীয় ক্ষেত্র।

গোণ্ডি ঃ মধ্যপ্রদেশের মুঙ্গওয়াল রেলস্টেশনের চার মাইল পূর্বে বেতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত মধ্য প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

ঘোগরা ঃ মধ্যপ্রদেশের দামোহ জেলায় সোনার নদীর তীরে অবস্থিত আদি প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

চন্দ্রাবল্লী ঃ কর্ণাটকের অন্তর্গত ব্রহ্মগিরির ৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত প্রত্নক্ষেত্র।

চন্দোলি ঃ মহারাষ্ট্রের পুনে জেলায় ঘোড় নদীর তীরে অবস্থিত তাম্রাশ্মীয় বসতি।

চিকরি-নেভাসা ঃ মহারাষ্ট্রের আহমদনগর জেলায় প্রবরা নদীর দক্ষিণ তীরে নেভাসার দু'মাইল নিম্নবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

চিরান্দ ঃ বিহারের সারণ জেলায় ছাপরার ৮ কি. মি. পূর্বে গঙ্গা ও ঘর্ঘরার সংযোগের নিকটে অবস্থিত প্রত্নক্ষেত্র যেখানে সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। নবাশ্মীয় অধ্যায়ের নিদর্শন হিসাবে এখানে পাথরের ফলাশিল্প, অস্থিনির্মিত আয়ুধ ও ভূমিকুঠারের পরিচয় পাওয়া যায়। তাম্রাশ্মীয় পর্যায়ের নিদর্শন সাদা রঙের চিত্রণযুক্ত কালো-ও-লাল মৃৎপাত্র ও সীমিত তাম্রসামগ্রী থেকে পাওয়া যায়। শেষের দিকের সংস্তরসমূহে লোহ ও উত্তরের কৃষ্ণমসৃণ মৃৎশিল্পের সাক্ষ্য বর্তমান।

চেপান ঃ উত্তরপ্রদেশের মীর্জাপুর জেলায় শোন নদীর তীরে অবস্থিত মধ্যপ্রস্তর যুগের প্রত্নক্ষেত্র।

ছানহূদরো ঃ সিন্ধু প্রদেশের নবাবশাহ জেলায় অবস্থিত হরপ্পা ও হরপ্পা-উত্তর সংস্কৃতির কেন্দ্র। ঝুকর ও ঝঙ্গর দ্রষ্টব্য।

জওয়ালি ঃ কর্ণাটকের গুলবর্গা জেলায় ভীমাব উপনদী অমজার তীরে অবস্থিত মধ্যপ্রস্তর যুগের প্রত্নক্ষেত্র।

জিওয়ানীরি ঃ দক্ষিণ বালুচিস্তানের মাকরান সমুদ্রোপকূলে সুবিখ্যাত হরপ্পীয় কেন্দ্র সুতকাগেনদোরের ৬০ কি.মি. দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত সমাধিক্ষেত্র যেখান থেকে তাম্রের সামগ্রী, রুপার অঙ্গুরী, লোহাব টুকরো এবং রুক্ষ লাল রঙের মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে।

জোরওয়ে ঃ মহারাষ্ট্রের আহমদনগর জেলায় প্রবরা নদীর তীরে অবস্থিত তাম্রাশ্মীয় বসতি যেখানে নেভাসা ধরনের সামগ্রী উৎখননের ফলে পাওয়া গেছে। এই সকল সামগ্রীর মধ্যে তাম্রনির্মিত চওড়া কুঠার এবং বলয় উল্লেখযোগ্য। এখানকার হালকা, উজ্জ্বল, কমলা অথবা গোলাপী রঙের ও কালো নকশা যুক্ত মৃৎপাত্রের সন্ধান অন্যান্য এলাকা থেকে পাওয়া গেছে।

জোগড় ঃ উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত আদি ঐতিহাসিক যুগের প্রত্নক্ষেত্র, যেখানে পুরোপুরি লোহযুগীয় সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া গেছে। কালো-ও-লাল মৃৎপাত্র এখান থেকে পাওয়া গেছে, শিশুপালগড়ের মত।

ঝঙ্গর ঃ সিন্ধুপ্রদেশে অবস্থিত হরপ্পা-উত্তর সংস্কৃতিকেন্দ্র যে সংস্কৃতির বিকাশ ছানহূদরো ও লোহুমজোদরোতেও দেখা যায়।

ঝুকর ঃ সিন্ধুপ্রদেশে অবস্থিত হরপ্পা-উত্তর সংস্কৃতিকেন্দ্র যে সংস্কৃতির বিকাশ ছানহূদরো ও লোহুমজোদরোতেও দেখা যায়।

টি. নরসিপুর ঃ কর্ণাটকে মহীশূর জেলায় কাবেরীর বাম তীরে অবস্থিত নবাশ্মীয়-তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতিকেন্দ্র।

টেকওয়াড়া ঃ মহারাষ্ট্রে গীর্না নদীর উপর অবস্থিত তাম্রাশ্মীয় কেন্দ্র। বহুল দ্রষ্টব্য।

টেরডাল ঃ কর্ণাটকের বিজাপুর জেলায় অবস্থিত মহাশ্মীয় সংস্কৃতি কেন্দ্র।

ডাবরকোট ঃ বালুচিস্তানের লোরালাই উপত্যকায় অবস্থিত প্রাক্-হরপ্পীয় ও হরপ্পীয় বসতি। হরপ্পা সভ্যতার সীমান্তবর্তী ঘাটি হিসাবে এই বসতিটি প্রায় ৫০০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। অবসানকাল ১৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ।

ডাম্বাকোহ্ ঃ দক্ষিণ বালুচিস্তানের মাকরান উপকূলে অবস্থিত সমাধিক্ষেত্র।

তক্ষশিলা ঃ পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডি জেলায় অবস্থিত ঐতিহাসিক যুগের প্রত্নক্ষেত্র যেখানে প্রথম লৌহনির্মিত সামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলি প্রাক্-মৌর্য যুগের।

তমিলহাল ঃ উত্তর কর্ণাটকে অবস্থিত মধ্য প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

তারসাহি ঃ মধ্যপ্রদেশের দামোহ্ জেলায় বেয়ামা নদীতটে অবস্থিত আদি প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

তিরুমলপুর ঃ তামিলনাড়ুর উত্তর আর্কট জেলার আর্কোনম তালুকে অবস্থিত আদি প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

তিলওয়ারা ঃ রাজস্থানের বাড়মের জেলায় বালোতরা শহরের ২৩ কি.মি পশ্চিমে লুনি নদীর বাঁকে বালিয়াড়ির মধ্যে অবস্থিত শেষ প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র যেখানে পরবর্তীকালের সংস্কৃতির বিকাশের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। এখানকার বৈশিষ্ট্য ক্ষুদ্রাশ্মশিল্প।

তেক্কলকোটা ঃ অন্ধ্রপ্রদেশের বেল্লারি জেলায় গ্রানাইট পাথরের পাহাড়ের উপর অসমতল ভূমিতে অবস্থিত নবাশ্মীয়-তাম্রাশ্মীয় ক্ষেত্র যেখানে দুই পর্যায়ের বসতির পরিচয় পাওয়া গেছে।

দত্তওয়াড়ি ঃ মহারাষ্ট্রের পুনে জেলায় মুঠা নদীর তীরে অবস্থিত আদি প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

দাইমাবাদ ঃ মহারাষ্ট্রের আহমদনগর জেলায় গোদাবরী উপনদী প্রবরার তীরে নেভাসা থেকে ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত তাম্রাশ্মীয় বসতি। এখানকার প্রথম পর্যায়ে মোটা রুক্ষ ধূসর মৃৎপাত্র, কালাসেদনি পাথরের সমান্তরাল ধারযুক্ত ফলাশিল্প, পোড়ামাটি ও আধা-দামী পাথরের পুঁতি, দ্বিতীয় পর্যায়ে লালের উপর-কালো মৃৎপাত্র, ক্ষুদ্রাশ্ম, তাম্রকুঠারের অংশ ও ছুরি এবং তৃতীয় পর্যায়ে জোরওয়ে মৃৎশিল্প, ক্ষুদ্রাশ্ম, পাথরের গদা-মুণ্ড, টাকু ও পোড়ামাটির মূর্তি পাওয়া গেছে। তিন পর্যায় থেকেই সমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে।

দেশলপার ঃ গুজরাতের কচ্ছ জেলায় অবস্থিত তাম্রাশ্মীয় বসতি যেখানে হরপ্পা ও হরপ্পা-উত্তর সংস্কৃতির বিকাশ দেখা যায়।

দেওজালি হাডিং ঃ আসামের উত্তর কাছাড় পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত নবাশ্মীয় সংস্কৃতি কেন্দ্র যেখান থেকে ভূমিতে ব্যবহার উপযোগ কুঠার ও মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে।

নভডাটোলি ঃ মধ্যপ্রদেশের নিমার জেলায়, ইন্দোর থেকে ৫০ মাইল দক্ষিণে নর্মদার তীরে অবস্থিত তাম্রাশ্মীয় বসতি যেখানে পূর্ববর্তী যুগের বসতিরও পরিচয় পাওয়া যায়। নর্মদার অপর তীরে অবস্থিত মহেশ্বরেও তাম্রাশ্মীয় বসতির সন্ধান পাওয়া গেছে এবং উভয় কেন্দ্রেই একই সংস্কৃতির বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। মহেশ্বর দ্রষ্টব্য।

নরসিংহগড় ঃ মধ্যপ্রদেশের দামোহ জেলায় সোনারের তীরে অবস্থিত আদি প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

নাগার্জুনিকোণ্ডা ঃ অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর জেলায় কৃষ্ণা নদীর উপত্যকায় অবস্থিত প্রত্নক্ষেত্র যেখানে আদি প্রস্তরযুগ থেকে নবাশ্মীয় অধ্যায় পর্যন্ত একটি সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়, কেননা এখান থেকে উপল নির্মিত আয়ুধ, হাতকুড়াল, লেভালোয়া মূল ও পার্তশিল্প, ফলা, ক্ষুদ্রাশ্ম এবং পালিশ করা কুঠার পাওয়া গেছে যা থেকে প্রস্তর শিল্পের বিবর্তনের ধারাটিকে সহজেই সনাক্ত করা যায়। এখানে ঐতিহাসিক যুগের বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

নাগদা ঃ মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী জেলায় চম্বল নদীর তীরে অবস্থিত তাম্রাশ্মীয় বসতি। এখানকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগে লৌহনির্মিত সামগ্রী পাওয়া গেছে। তৃতীয় যুগের ১৩১টি লোহার সামগ্রীর সঙ্গে উত্তরের কৃষ্ণমসৃণ মৃৎপাত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

নাল ঃ দক্ষিণ বালুচিস্তানে, প্রাক্তন কালাত রাজ্যের ঝালওয়ান বিভাগে ওরনাথ উপত্যকায় অবস্থিত প্রাক্-হরপ্পীয় বসতি যার উদ্ভব খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রক থেকে। বসতি এলাকাটি ডি-এলাকা নামে পরিচিত যেখানে তিন ধরনের আবাস, তাম্রনির্মিত আয়ুধ, প্রস্তর, পোড়ামাটি ও তাম্রনির্মিত নানা ধরনের ছোট মূর্তি, আধা দামী পাথরের পুঁতি এবং নানাবর্ণ রঞ্জিত নকশাদার মৃৎপাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। একটি সমাধি এলাকাও বর্তমান যেখানে সমাধি প্রদানের বিভিন্ন পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়।

নালাগড় ঃ রূপরের অনতিদূরে, শতদ্রুর উপনদী শিরসা উপত্যকায় অবস্থিত আদি-প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

নাসিক ঃ মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলায় অবস্থিত বৌদ্ধ গুহারাজি এবং

ঐতিহাসিক যুগের নানা নিদর্শনের জন্য বিখ্যাত এলাকা। এখানে খননকার্যের ফলে আদি ঐতিহাসিক যুগের বহু লৌহনির্মিত সামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে।

নাসিরাবাদ: দক্ষিণ বালুচিস্তানের মাকরান উপকূলে শাহীটুম্পের পশ্চিমে, নিহাং এবং কেজ নদীগুলোর সংযোগস্থলের ৬ কি. মি. উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত সমাধিক্ষেত্র। এখানকার কিছু সমাধিতে অমসৃণ লাল ও হলদে রঙের মৃৎপাত্র ও কিছু লৌহনির্মিত উপকরণের পরিচয় পাওয়া যায়।

নিত্তুর: কর্ণাটকের বেলারি জেলায় তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত আদি প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র যেখানে পশুর দেহাবশেষের সঙ্গে উপল নির্মিত আয়ুধ পাওয়া গেছে।

নেভাসা: মহারাষ্ট্রের আহমদনগর জেলায় প্রবরার তীরে অবস্থিত প্রত্নক্ষেত্র যেখানে আদি প্রস্তরযুগ থেকে তাম্রাশ্মীয় যুগ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। এখানকার তাম্রাশ্মীয় পর্যায়ে খুঁটি এবং মাটির দেওয়ালযুক্ত আবাস, তাম্রনির্মিত কুঠার, বলয় ও অপরাপর সামগ্রী বস্ত্রবয়ন, শস্যোৎপাদন, পশুপালন ও রন্ধনের নিদর্শন, আধা-দামী পাথর, তামা ও সোনার পুঁতি, বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্র এবং সমাধিব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া গেছে।

পহলগম: কাশ্মীরে শ্রীনগর থেকে ৬৫ মাইল পূর্বে লিডার উপত্যকায় অবস্থিত প্রস্তর যুগের প্রত্নক্ষেত্র।

পাইয়ামপল্লি: তামিলনাড়ুর উত্তর আর্কট জেলায় অবস্থিত মহাশ্মীয় কেন্দ্র যেখানকার বসতি এলাকায় প্রচুর লোহার খণ্ড পাওয়া গেছে।

পাটন: মহারাষ্ট্রের নাগপুরের নিকটবর্তী মধ্যপ্রস্তর যুগের প্রত্নক্ষেত্র।

পাটনে: মহারাষ্ট্রের জলগাঁও জেলার চালিশগাঁও তালুকে, চালিশগাঁও রেলস্টেশনের ১৩ কি. মি. দক্ষিণে তিত্তুর নদী থেকে বহির্গত আধ-নালার বামতীরে অবস্থিত মধ্য ও শেষ প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

পাণ্ডুরাজার ঢিবি: পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় অজয় ও কুনুর নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত তাম্রাশ্মীয় বসতি যেখানে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। এখানকার প্রথম দুটি পর্যায় তাম্রাশ্মীয় কিন্তু তৃতীয় পর্যায়টি লৌহযুগের পরিচয়বাহী।

পাদারিয়া: জবলপুরের ১৩ মাইল পূর্বে দিন্দোরি পথের পাশে অবস্থিত প্রস্তর যুগের প্রত্নক্ষেত্র।

পারাদি: দক্ষিণ গুজরাতের পার নদীর তীরে অবস্থিত মধ্য-প্রস্তর যুগের প্রত্নক্ষেত্র।

পালাভোয় ঃ অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর জেলার কল্যাণদুর্গ তালুকে অবস্থিত নবাশ্মীয় কেন্দ্র যেখানকার অবক্ষেপ থেকে তিনটি সুনির্দিষ্ট যুগের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমটি পাতশিল্পের পরিচয়বাহী প্রাক্-নবাশ্মীয়, দ্বিতীয়টি ধূসর মৃৎপাত্র এবং পালিশ করা পাথরের আয়ুধ দ্বারা চিহ্নিত নবাশ্মীয় এবং তৃতীয়টি উত্তর-নবাশ্মীয়।

পিকলিহাল ঃ অন্ধ্রপ্রদেশের রায়চুর দোয়াবে অবস্থিত নবাশ্মীয় তাম্রাশ্মীয় বসতি যেখানে পরবর্তী লৌহযুগে উত্তরণের নিদর্শনও পাওয়া যায়।

পেরিয়ানো ঘুণ্ডাই ঃ উত্তর বালুচিস্তানের ঝোব নদীর দক্ষিণে কোয়েটা থেকে ১০ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত প্রাক্-হরপ্পীয় বসতি যেখানে তাম্র ও ব্রোঞ্জ নির্মিত নানা সামগ্রী পাওয়া গেছে। সমগ্র অবক্ষেপটিকে নিম্ন এবং উচ্চ দুই পর্যায়ে ভাগ করা হয়। হরপ্পার নিম্ন সংস্তরে কিছু পাত্রের টুকরো পাওয়া গেছে যেগুলি পেরিয়ানো ঘুণ্ডাই থেকে প্রাপ্ত সামগ্রীর অনুরূপ। এই বিষয়টি উভয় সংস্কৃতির কোন ধরনের সংযোগের পরিচায়ক।

প্রকাশ ঃ মহারাষ্ট্রের ধুলিয়া জেলায় গোমাই ও তাপ্তী নদীর সঙ্গমে অবস্থিত তাম্রাশ্মীয় বসতি। এখানকার প্রথম যুগের প্রথম সংস্তরে মৃৎশিল্প ক্ষুদ্রাশ্ম, তাম্রের টুকরো আধার নানা পাত্রের পাত্র, গোলাকৃতির কুটিরের গর্ত এবং চাবধব নব মৃৎপাত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় সংস্তরে কালো ও উজ্জ্বল লাল মৃৎপাত্রের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় যুগে লোহার উপকরণ, কালো-ও-লাল মৃৎপাত্র, উত্তরের কৃষ্ণমসৃণ মৃৎপাত্র এবং ২১টি তাম্রসামগ্রীর পরিচয় পাওয়া যায়। লৌহের আয়ুধসমূহের মধ্যে আছে ত্রিকোণ তীরের ফলা, কুঠার, ছুরি, ফলা, পেরেক, জোড় ও কাস্তের অংশ। উভয় যুগ একটি মধ্যবর্তী পুঞ্জীভূত কঙ্করময় অবক্ষেপের দ্বারা পৃথকীকৃত।

বরগাঁও ঃ উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর জেলার নকুর তহশিলে অবস্থিত তাম্রাশ্মীয় বসতি যেখানে হরপ্পা সভ্যতার একটি পরবর্তী অথবা অধঃপতিত অবস্থার বিস্তৃতি ঘটেছিল বলে মনে করা হয়।

বহল ঃ মহারাষ্ট্রের জলগাঁও জেলায় গীর্না নদীর তীরে অবস্থিত তাম্রাশ্মীয় বসতি। এখানকার প্রথম যুগটিকে দুটি পর্বে ভাগ করা হয়। প্রথম পর্বে পুরু ধূসর মৃৎপাত্র এবং দ্বিতীয় পর্বে চক্রনির্মিত হালকা লাল রঙের মৃৎপাত্র, সমান্তরাল ধারবিশিষ্ট ফলা ও অর্ধচন্দ্রাকৃতি হাতিয়ার এবং তাম্রের নিদর্শন পাওয়া যায়। দ্বিতীয় যুগে লৌহ ও কালো-ও-লাল মৃৎ-পাত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। বহলের অপর পাড়ে টেকওয়াড়ায় অনুরূপ সংস্কৃতির অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে।

ব্রহ্মগিরি ঃ কর্ণাটকের চিত্রদুর্গ জেলায় অবস্থিত প্রত্নক্ষেত্র যেখানে ক্ষুদ্রাশ্মীয় এবং নবাশ্মীয় আয়ুধ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। সমান্তরাল ধারবিশিষ্ট ফলাশিল্প ও দুই ধরনের মৃৎপাত্র এখানকার বৈশিষ্ট্য। এখানকার বসতিমূলক অবক্ষেপ থেকে তিনটি সুনির্দিষ্ট সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে তিনশোরও বেশি সমাধিসম্পর্কিত মহাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে খাদ ও চোবাচ্চা উভয় ধরনের সমাধিরই পরিচয় পাওয়া যায়।

বাগলকোট ঃ কর্ণাটকের ঘটপ্রভা নদীর তীরে অনগওয়াড়ী ১৩ কি.মি. দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

বাগোর ঃ রাজস্থানে বানাস নদীর উপনদী কোঠারির বামতীরে ভিলওয়ারা শহরের ২৫ কি.মি. পশ্চিমে অবস্থিত প্রত্নক্ষেত্র। এখানকার প্রথম যুগের নিদর্শনসমূহের মধ্যে ক্ষুদ্রাশ্মের প্রাধান্য। দ্বিতীয় যুগে তাম্র এবং তৃতীয় যুগে লৌহের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

বাঘাই-খোর ঃ উত্তরপ্রদেশের মীর্জাপুর জেলার ভইসুর গ্রামের নিকটবর্তী পর্বতছত্রের নিচে অবস্থিত আদি প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

বারাচন্দা ঃ মধ্যপ্রদেশের উচ্চ শোন উপত্যকায়, বিলাসপুর জেলায় জোহিল্লা নদীতীরে অবস্থিত আদি প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

বারিয়ারি ঃ উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলায় যমুনা নদীর একটি উপনদীর তীরে অবস্থিত আদি প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

বাহাদুরপুর ঃ গুজরাতে নর্মদার উপনদী ওরসাঙ্গের তীরে অবস্থিত আদি প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

বীজতলা ঃ উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলায় খড়কাই নদীর তীরে অবস্থিত মধ্য প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

বীরভানপুর ঃ পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় দুর্গাপুর রেলস্টেশনের নিকটে দামোদরের তীরে অবস্থিত শেষ প্রস্তরযুগের নিদর্শনবাহী ক্ষুদ্রাশ্ম শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

বুর্জাহোম ঃ কাশ্মীরের ডাল হ্রদের নিকটে, শ্রীনগর থেকে ২৪ কি.মি. উত্তরপূর্বে অবস্থিত নবাশ্মীয় ও মহাশ্মীয় ক্ষেত্র। এখানকার চার মিটার পুরু অবক্ষেপের মধ্যে তিনটি সাংস্কৃতিক যুগের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। নবাশ্মীয়, মহাশ্মীয় ও আদি-ঐতিহাসিক। নবাশ্মীয় অধ্যায়টি দুইটি পর্বে বিভক্ত, বিবরনিবাসভিত্তিক নিম্ন এবং কাদামাটির আবাসভিত্তিক উচ্চ। মহাশ্মীয় অধ্যায়ে মেনহিরের অস্তিত্ব দেখা যায়।

বেতমচেরলা ঃ অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল জেলার অন্তর্গত প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র, স্থানীয়ভাবে মুচ্ছৎলা চিন্তামনু গোবি নামে পরিচিত।

বেলপান্ধারী ঃ মহারাষ্ট্রের আহমদনগর জেলায় গোদাবরীর তীরে অবস্থিত প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

বোরিভিলি ঃ বোম্বাই-এর চার্চগেট রেলস্টেশন থেকে ৪০ কি. মি. দূরে কৃষ্ণগিরি না কান্হেরি গুহার সন্নিহিত অঞ্চলে অবস্থিত মধ্য প্রস্তর-যুগের প্রত্নক্ষেত্র।

ভইসানার ঃ উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর জেলায় অবস্থিত শেষ প্রস্তর-যুগের প্রত্নক্ষেত্র।

ভানগড় ঃ রাজস্থানের আলোয়ার জেলায় সানওয়ান নদীর তীরে অবস্থিত আদি প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

ভালাসনা ঃ গুজরাতে আমেদাবাদের উত্তরে সাবরমতীর তীরে অবস্থিত প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

ভাপি ঃ দক্ষিণ গুজরাতের বুলসর জেলায় অবস্থিত মধ্য প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

ভীমবন্ধ ঃ বিহারের মুঙ্গের জেলার উষ্ণ প্রস্রবণের পূর্বদিকে অরণ্যময় অঞ্চলে একটি স্থানীয় নালার পাশে অবস্থিত আদি প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

ভীমবেটকা ঃ মধ্যপ্রদেশের রাইসেন জেলায়, ভূপালের ৪০ কি. মি. দক্ষিণে পর্বতছত্র ও গুহাবিশিষ্ট প্রত্নক্ষেত্র যেখানে শেষ প্রস্তরযুগ থেকে সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। এটি ক্ষুদ্রাশ্মশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। এখানকার গুহাচিত্রসমূহও রীতিমত উল্লেখযোগ্য।

ভেদুল্লাচেরুবু ঃ অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুর জেলায় রেনিগুণ্টার নিকট অবস্থিত শেষ প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

মহাদেও পিপারিয়া ঃ মধ্যপ্রদেশের হোসঙ্গাবাদ এবং নরসিংহপুরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে নর্মদা উপত্যকায় অবস্থিত প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

মহেশ্বর ঃ মধ্প্রদেশের নিমার জেলায় নর্মদার তীরে অবস্থিত প্রত্নক্ষেত্র যেখানে প্রস্তরযুগ থেকে লৌহযুগ পর্যন্ত সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা বর্তমান। এখানকার তাম্রাশ্মীয় পর্যায়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা নর্মদার অপর তীরে নভডাটোলির সংস্কৃতির সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত। এখানকার বৈশিষ্ট্য গোলাকার অথবা চতুষ্কোণ কুটির, মালব ধরনের মৃৎপাত্র, তাম্রনির্মিত সামগ্রী ও আধা-দামী পাথরের অলংকারের উপকরণ। এই বৈশিষ্ট্যগুলি নভডাটোলিতেও দেখা যায়। নভডাটোলির মতই এখানকার চতুর্থ যুগে লোহার সামগ্রীর পরিচয় পাওয়া যায়।

মান্দসুর ঃ মধ্যপ্রদেশে শিবনা নদীর তীরে অবস্থিত প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

মারিয়াদা : মধ্যপ্রদেশের দামোহ্ জেলায় সোনারের তীরে অবস্থিত প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

মালাভন : সুরাট জেলায় তাপ্তীর নিম্নমুখে অবস্থিত তাম্রাশ্মীয় বসতি।

মাস্কি : কর্ণাটকের রায়চুর জেলার লিঙ্গসুগুর তালুকে তুঙ্গভদ্রার উপনদী মাস্কির তীরে অবস্থিত তাম্রাশ্মীয় বসতি যেখানকার প্রথম যুগে ক্ষুদ্রাশ্ম ও ফলাশিল্পের বিকাশ দেখা যায়। একটি তাম্রদণ্ডের আবিষ্কার এই যুগে ধাতুর ব্যবহারের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। দ্বিতীয় যুগে মহাশ্মীয় সমাধি, কালো-ও-লাল মৃৎপাত্র এবং লৌহের পরিচয় পাওয়া যায়।

মুঘল ঘুণ্ডাই : বালুচিস্তানের ঝোব নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত প্রাক্-হরপ্পীয় তাম্রাশ্মীয় বসতি যেখানকার সঞ্চিত অবক্ষেপ থেকে পেরিয়ানো ঘুণ্ডাই-এর অনুরূপ তিনটি পর্যায়কে সনাক্ত করা যায়।

মেহী : দক্ষিণ বালুচিস্তানে নাল থেকে ৬০ কি. মি. উত্তরপূর্বে মাস্কাই উপত্যকায় অবস্থিত প্রাক্-হরপ্পীয় তাম্রাশ্মীয় বসতি। কালসীমা ২৫০০-১৯০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। কুল্লি দ্রষ্টব্য।

মহেঞ্জোদরো : সিন্ধুপ্রদেশের লারকানা জেলায় সিন্ধুর তীরে হরপ্পা সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

রংপুর : উত্তর-পূর্ব সৌরাষ্ট্রে ভাদর নদীর তীরে অবস্থিত তাম্রাশ্মীয় বসতি যেখানে প্রাক্-হরপ্পীয়, হরপ্পীয় ও হরপ্পা-উত্তর সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এখানকার প্রথম যুগে ক্ষুদ্রাশ্মের পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু মৃৎপাত্র অনুপস্থিত। দ্বিতীয় যুগের প্রথম পর্বে কালোর-উপর-লাল, হলুদের উপর চকোলেট ও রুক্ষ ধূসর বর্ণের মৃৎপাত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগে তাম্রনির্মিত সামগ্রীর বহু নিদর্শন বর্তমান। তৃতীয় যুগে উজ্জ্বল লালবর্ণের মৃৎপাত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

রানা ঘুণ্ডাই : বালুচিস্তানের ঝোব উপত্যকায় অবস্থিত প্রাক্‌হরপ্পীয় তাম্রাশ্মীয় বসতি। এখানকার প্রথম যুগে কোন আবাসব্যবস্থার পরিচয় নেই তবে হস্তনির্মিত বর্ণবিহীন মৃৎপাত্র, পাথরের ফলা ও অস্থিনির্মিত আয়ুধের নিদর্শন আছে। দ্বিতীয় যুগে চক্রনির্মিত বর্ণসমন্বিত মৃৎপাত্র ও আবাসব্যবস্থার পরিচয় মেলে। তৃতীয় যুগের তিনটি পর্যায় যেখানে পূর্ববর্তী সংস্কৃতির পরিমার্জিত রূপ ও ধারাবাহিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। চতুর্থ ও পঞ্চম যুগ পূর্ববর্তী ঐতিহ্য থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন। বসতিটি অগ্নিদগ্ধ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং ধ্বংসস্তূপের উপর নূতন বসতি গড়ে উঠেছিল। এই অধ্যায়ের মৃৎপাত্র রুক্ষ, স্থূল ও ভিন্ন ধরনের।

রামলা ঃ উড়িষ্যার কেওনঝর জেলায় বৈতরণী নদীতীরে অবস্থিত মধ্য প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

রুপর ঃ হরপ্পা সভ্যতার উত্তর সীমা, শতদ্রুর তীরে হিমালয়ের পাদদেশ ও সমভূমির সংযোগস্থলে অবস্থিত। এখানে পোড়া ও কাঁচা ইটের আবাসব্যবস্থা, বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্র এবং পাত্রসমাধির পরিচয়বাহী সমাধি-ক্ষেত্র পাওয়া গেছে। এখানকার তৃতীয় যুগে লৌহনির্মিত সামগ্রীর নিদর্শন পাওয়া গেছে।

ললিতপুর ঃ মধ্যপ্রদেশের সাহদাদ নদীতীরে ললিতপুর রেলস্টেশনের মাইলখানেক দূরে অবস্থিত প্রস্তরযুগের আয়ুধ নির্মাণ কেন্দ্র।

লাভাচা ঃ দক্ষিণ গুজরাতের বুলসর জেলায় অবস্থিত মধ্যপ্রস্তর-যুগের প্রত্নক্ষেত্র।

লাংঘনাজ ঃ গুজরাতের মেহসনা জেলায় লাংঘনাজ রেলস্টেশনের নিকটবর্তী প্রত্নক্ষেত্র যেখানে স্তরবিন্যস্ত অবস্থায় ক্ষুদ্রাশ্ম শিল্পের ব্যাপক অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া গেছে। প্রথম যুগে বা সর্বনিম্ন সংস্তরে কিছু পাত্রের টুকরোর সঙ্গে ক্ষুদ্রাশ্মের সন্ধান মিলেছে। দ্বিতীয় যুগের সংস্তর-সমূহে মৃৎপাত্র, পালিশ করা নবাশ্মীয় আয়ুধ ও তাম্রসামগ্রীর পরিচয় পাওয়া গেছে। তৃতীয় যুগে লোহার ব্যবহার দেখা যায়।

লেখাহিয়া ঃ উত্তরপ্রদেশের মীর্জাপুর শহরে ৬৯ কি. মি. পূর্বে মীর্জাপুর-রেওয়া রাস্তার উপর পর্বতছত্র এলাকায় অবস্থিত প্রত্নক্ষেত্র যেখানে প্রচুর ক্ষুদ্রাশ্ম পাওয়া গেছে।

লোথাল ঃ গুজরাতের আমেদাবাদ জেলায় সারাগওয়াদা গ্রামের সন্নিকটে অবস্থিত হরপ্পীয় বসতি। এখানে প্রাক্-হরপ্পীয় ও হরপ্পা-উত্তর সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। বসতিটি ছয়টি ব্লকে বিভক্ত কাঁচা ইটের ধাপের উপর গঠিত এবং রাস্তায় দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। এখানে একটি ইস্টক-নির্মিত কাঠামোর পরিচয় পাওয়া যায় যার দুদিকে প্রবেশ করা ও নিষ্ক্রান্ত হওয়ার উপযোগী খাল বর্তমান। এটিকে কেউ কেউ ডকইয়ার্ড বলে গণ্য করেন। লোথাল থেকে তাম্র ও ব্রোঞ্জ নির্মিত নানা সামগ্রী পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত পোড়ামাটির সামগ্রীও কম নয়।

শাহীটুম্প ঃ বালুচিস্তানের পশ্চিম মাকারান অঞ্চলে কজ নদীর তীরে অবস্থিত তাম্রাশ্মীয় বসতি। এখানকার কিছু সমাধি ও ধূসর মৃৎপাত্র প্রাক্-হরপ্পীয়। হরপ্পীয় উপাদানের পরিচয় পাওয়া যায় লাল রঙের মৃৎপাত্র, চার্টপাথরের ফলা ও ইটের তৈরি আবাস ব্যবস্থা থেকে। এখানে হরপ্পা-উত্তর বসতিরও পরিচয় পাওয়া যায় সমাধিক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ থেকে।

শোনপুর ঃ বিহারের গয়া থেকে ২৪ কি.মি. পূর্বে অবস্থিত। এখানকার তাম্রাশ্মীয় পর্যায়ের দুটি সমাধি পাওয়া গেছে। তৃতীয় যুগে লৌহনির্মিত সামগ্রী ও উজ্জ্বলের কৃষ্ণমসৃণ মৃৎপাত্রের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

সঙ্গনকল্লু ঃ কর্ণাটকের বেলারি জেলায় অবস্থিত নবাশ্মীয়-তাম্রাশ্মীয় প্রত্নক্ষেত্র।

সরাই নহর রাই ঃ উত্তর প্রদেশের গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রতাপগড় থেকে ১৫ কি. মি. দূরে একটি ছোট হ্রদের তীরে অবস্থিত শেষ প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র যেখানে প্রচুর ক্ষুদ্রাশ্ম এবং একটি সমাধিক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

সাওয়ালড়া ঃ মহারাষ্ট্রে তাপী নদীর দক্ষিণ তীরে প্রকাশের বিপরীতে অবস্থিত তাম্রাশ্মীয় বসতি।

সাংঘাও ঃ পাকিস্তানের পেশোয়ারের নিকটবর্তী, মাদয়ান থেকে ২১ মাইল উত্তর পূর্বে অবস্থিত প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

সানুর ঃ তামিলনাড়ুর চিঙ্গলেপুট জেলায় অবস্থিত সমাধিক্ষেত্র যেখানে ৩০০-র বেশি কবর পাওয়া গেছে।

সালভাওগি ঃ কর্ণাটকের বিজাপুর জেলায় কৃষ্ণা-ভীমা অববাহিকায় অবস্থিত প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

সিক্রাপুর ঃ মহারাষ্ট্রের পুনে জেলায় ভেল নদীর তীরে অবস্থিত মধ্য প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

সিহোরা ঃ মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলায় ধসন নদীর তীরে অবস্থিত মধ্য প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

সুতকাগেনদোর ঃ বালুচিস্তানের মাকরান উপকূলে আরব সাগরের তীরে অবস্থিত হরপ্পীয় সীমান্ত কেন্দ্র। এটি সম্ভবত কোন ছোট বন্দর ছিল। এখানকার নিম্ন সংস্তরসমূহ সুস্পষ্টভাবেই হরপ্পীয় বসতির সাক্ষ্য দেয়।

সুরকোটাদা ঃ কচ্ছের অন্তর্গত হরপ্পীয় বসতি যেখানে তিনটি সাংস্কৃতিক পর্যায়কে সনাক্ত করা যায়। এখানে দুর্গ, বসতি এলাকা, জলনিকাশী ব্যবস্থা, পাত্রে লেখধর্মী চিত্রণ প্রভৃতি হরপ্পীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

সুরজাঙ্গাল ঃ বালুচিস্তানের লোরালাই উপত্যকায় অবস্থিত প্রাক্-হরপ্পীয় তাম্রাশ্মীয় বসতি।

সুরেগাঁও ঃ মহারাষ্ট্রের আহমদনগর জেলায় গোদাবরীর তীরে অবস্থিত প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

সোনাগাঁও ঃ মহারাষ্ট্রের পুনে জেলায় অবস্থিত তাম্রাশ্মীয় বসতি।

হরপ্পা ঃ পাঞ্জাবের মণ্টোগোমারি জেলায় ইরাবতীর তীরে অবস্থিত তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতার প্রথম আবিষ্কৃত কেন্দ্র।

হস্তিনাপুর ঃ উত্তরপ্রদেশের মীরাট জেলায় মাওয়ানা তহশিলের অন্তর্গত ঐতিহাসিক স্থান যেখানে খননকার্যের দ্বারা তিনটি প্রত্নতাত্ত্বিক যুগকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয় যুগে চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুগের উপরের সংস্তরে লোহের নিদর্শন পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় যুগটির অবসান সম্ভবত কোন বন্যার ফলে হয়েছিল। তৃতীয় যুগে উত্তরের কৃষ্ণমসৃণ মৃৎপাত্রের ব্যাপক অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় যদিও এই মৃৎপাত্র অল্প পরিমাণে দ্বিতীয় যুগের উপরের সংস্তরে বর্তমান।

হারাং ঃ মধ্যপ্রদেশের দামোহ্ জেলায় সোনারের তীরে অবস্থিত প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্র।

হালিঙ্গালি ঃ কর্ণাটকের বিজাপুর জেলায় অবস্থিত মহাশ্মীয় ক্ষেত্র।

হাল্লুর ঃ কর্ণাটকের ধারওয়ার জেলায় তুঙ্গভদ্রার বাম তীরে অবস্থিত প্রত্নক্ষেত্র। এখানকার প্রথম যুগে নবাশ্মীয় সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, দ্বিতীয় যুগে মহাশ্মীয় সংস্কৃতির। কালো-ও-লাল, এবং পুরো কালো ও পুরো লাল নানা আকারের মৃৎপাত্র ছাড়াও এখানকার প্রাপ্ত সামগ্রীর মধ্যে লোহনির্মিত তীর ও বর্শার ফলক ও ছুরি আবিষ্কৃত হয়েছে।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

সুধীরঞ্জন দাস বিরচিত 'উৎখনন বিজ্ঞান' (১৯৭৮) এবং দীপক মুখোপাধ্যায় বিরচিত 'প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির রূপরেখা' (১৯৮২) গ্রন্থ দুটি এই বই-এর সহায়ক হিসাবে পাঠ করা চলতে পারে। প্রথমটিতে প্রত্নতাত্ত্বিকদের কর্মপদ্ধতি ও দ্বিতীয়টিতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের হাতিয়ারনির্মাণ পদ্ধতির উপর বিশদ আলোকপাত করা হয়েছে। ইংরাজীতে প্রকাশিত বই, রিপোর্ট ও প্রবন্ধের সংখ্যা প্রচুর। এখানে একটি বাছাই করা তালিকা দেওয়া হল ঃ

Agarwal D. P. *Archaeology in India*, 1982 ;

Agarwal D. P. and Chakrabarti D. K (ed.), *Essays in Indian Prehistory*, 1979 ;

Allchin B. and F. R. *Rise of Civilization : South Asia* 1983 ;

Banerjee N. R. *Iron Age in India* 1965 ;

Bhattacharyya N. N. *The Indian Mother Goddess*, 1977 ;

Chakrabarti D. K. 'The Aryan Hypothesis in Indian Archaeology' in *Indian Studies Past and Present*, Vol IX. 1968. pp. 343-358 ;

Childe V. G. *New Light on the Most Ancient East*, 1952 ;

Clarke D. C. *Analytical Archaeology*, 1968 ;

Dani A. H. *Prehistory and Protohistory of Eastern India*, 1964 ;

Fairservis W. A. (jr), *The Roots of Ancient India* 1971 ;

Gordon D. H. *The Prehistoric Background of Indian Culture*, 1971 ;

Gupta S. P. *Disposal of the Dead and Physical Types in Ancient India*, 1972 ;

Krishnaswami V. D. 'Progress in Prehistory' in *Ancient India*, No 9, 1952, pp. 53-79 ; 'Neolithic Pattern of India' in *Ibid*, No. 16, 1960, pp-24-64 ;

Lal B. B. *Indian Archaeology Since Independence*, 1964 ;

Misra V. N. and Mate M. S. (ed) *Indian Prehistory 1964*, Poona 1965 ;

Misra V. N. and Nagar M. *Twentyfive Years of Indian Prehistory* (1947-72) : A Review of Research in *Man and Society*, (eds.) K. S. Mathur and S. Varma, 1973, pp. 1-54 ;

Piggott S. *Prehistoric India*, 1950 ;

Sankalia H. D. *Prehistory and Protohistory in India and Pakistan* 1974 ;

Sen D. and Ghosh A. K. (ed). *Studies in Prehistory*, Bruce Foote Memorial Vol. 1966 ;

Subbarao B. *The Personality of India*, 1958 ;

Wheeler R. E. M. *The Indus Civilization*, 1968.

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের উপর যত বই, রিপোর্ট ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে তার জন্য লাইডেনের কার্ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত *Annual Bibliography of Indian Archaeology* দ্রষ্টব্য। এ-ছাড়া আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে কর্তৃক প্রকাশিত *Ancient India* ও *Annual Report of the Archaeological Survey of India* পত্রিকায় এবং দিল্লী থেকে প্রকাশিত *Indian Archaeology : A Review* পত্রিকায় অনুসন্ধান ও উৎখননের বিবরণ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। বৈদেশিক যে সকল পত্র-পত্রিকায় ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা থাকে সেগুলির মধ্যে কেম্ব্রিজ থেকে প্রকাশিত *Antiquity*, শিকাগো থেকে প্রকাশিত *American Anthropologist*, লণ্ডন থেকে প্রকাশিত *Man*, *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* ও *World Archaeology*, পেশোয়ার থেকে প্রকাশিত *Ancient Pakistan* ও করাচি থেকে প্রকাশিত *Pakistan Archaeology* উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, প্রত্নতাত্ত্বিক নৃতাত্ত্বিক, ও ঐতিহাসিক গবেষণা সংস্থার মুখপত্রসমূহে ভারতের প্রাগৈতিহাসিক ও প্রায়-ঐতিহাসিক যুগের উপর বহু রচনা প্রকাশিত হয়।

অনুক্রমণিকা